মেয়েদের নিজস্ব পত্রিকা

সুকন্যা

১ – ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭



সরোজিনী নাইডুর কবিকৃতি

বধূদাহ : নানা দৃষ্টিকোণ

ঘরোয়া অ্যালবাম : মীরা-প্রসূন

- ☐ স্বাস্থ্য প্রতি পদে : নিদ্রাহীনতা
- ☐ রূপচর্চা : হাতের পরিচর্যা
- ☐ রান্না : মিনি লাঞ্চ

রবি-অমৃতা সমাচার



পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ নিলয় হাজরা

স্ক্যান ঃ দেব কুমার দেব

এডিট ঃ স্নেহময় বিশ্বাস

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

"র‍্যাপিডেক্স" ইংলিশ স্পীকিং কোর্স

2,00,00,000

দুই কোটিরও বেশি পাঠকের পছন্দ

ইংরাজী বোলচাল শেখবার
এক অনন্য সোর্স
র‍্যাপিডেক্স ইংলিশ স্পিকিং কোর্স
সেলস্ম্যান বা ব্যাপারী
ম্যানেজার বা কর্মী ওয়ারকিং গার্ল বা গৃহিনী
সকলের উন্নতির কোনটা সেরা সোর্স
র‍্যাপিডেক্স ইংলিশ স্পিকিং কোর্স।

Above 400 Pages
in each
Price Rs. 28/- each
Postage Rs 6/-



It's really a good book to learn spoken English
—Kapil Dev



Big Size
Price Rs. 15/- each
Postage Rs. 4/-

Also available in English
by IVAR UTIAL

101 সাইন্স গেমস্

যখন শিশুরা বিজ্ঞানের সাধারণ ও সহজ সূত্রগুলি শিখছে অন্যদিকে তারা সঙ্গে সঙ্গে এও শিখছে রকমারী বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি তৈরী করার বিধি যেমন ব্যারোমিটার, বৈদ্যুতিক চুম্বক, হেক্টোগ্রাফ, বাষ্প চালিত টারবাইন, ইলেকট্রোস্কোপ ইত্যাদি।

101 ম্যাজিক ট্রিক্স্

একটা মজার ব্যাপার কোন পার্টিতে, জলসায়, ঘরোয়া জমায়েতে অথবা ভ্রমণকালে কেড়ে নেওয়ার জন্য নতুন মজাদার হাত সাফাই-এর খেলা দেখিয়ে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু বান্ধবকে আনন্দ দাও।

আপনার ছেলেমেয়েকে বুদ্ধিদীপ্ত করে গড়ে তুলুন

ছোটদের বৌদ্ধিক বিকাশ তখনই ভাল হতে পারে যখন পাঠ্য পুস্তক পড়া ছাড়া তার কিশোর মনের মধ্যে জাগা 'কেন?' এবং 'কি করে?' এই ধরনের শত সহস্র প্রশ্নের সমুচিত উত্তর তাকে ঠিক সময় উপলব্ধ করাতে পারা যায়।

চিল্ড্রেন্স নালেজ ব্যাংক

খণ্ড ১, ২, ৩, ৪ এবং ৫

Price
Rs 24/- each
Postage
Rs 4/-



AVA...E AT leading bookshops. A.H. Wheeler's and Higg... ...hams Railway Book stalls throughout India or ask ... P.P. from.

Nov — Nab 1

PUSTAK MAHAL Khari Baoli, Delhi- 110006

New Show Room: 10-B, Netaji Subhash Marg, New Delhi-110...
TELEX: 031—61790 SBP IN

VISIT AT OUR STALL IN CALCUTTA BOOK FAIR
FROM 28-1-87 TO 8-2-87 AND AVAIL 10% DISCOUNT



Sista's - SSP.558.86 BEN

সুকন্যা বর্ষ ৩ সংখ্যা ১৫/১ – ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭/১৮ মাঘ – ২ ফাল্গুন ১৩৯৩

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ পরিচিতি ।। 'স্পেকট্রাম' অনুষ্ঠানের 'প্যানোরামা' নৃত্যানুষ্ঠান (মহাদেবী বিড়লা গার্লস হাইস্কুল)/ ফটো : শংকর নাগ দাস।

প্রতি সংখ্যা সাড়ে চার টাকা

বিমান মাশুল পূর্বাঞ্চলে ৩০ পয়সা, ভারতের অন্যান্য স্থানে ৪০ পয়সা

[illegible] : গীতা চৌধুরী

[illegible] সম্পাদক : রানা দাস

[illegible] উপদেষ্টা : নিতাই ঘোষ

[illegible] এক্সিকিউটিভ,
[illegible] বিজ্ঞাপন ও জনসংযোগ :
[illegible] বসু, কলকাতা
[illegible] কন্ট্রোলার : প্রসাদচন্দ্র দত্ত
[illegible] দপ্তর ও রেজিঃ অফিস :
[illegible] প্রকাশনী লিমিটেড,
[illegible] অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট,
[illegible] ৭00 0৭২
[illegible] ২১৬৯, ২৭-৯২৯২, ২৭-৯৩১১,
[illegible] ২৩-১৬৮১
[illegible] 21-5092 IPPL-IN
[illegible] অফিস :
[illegible] বিল্ডিংস, ফ্ল্যাট ১২১২, ১৯ কস্তুরবা
[illegible] নতুন দিল্লি ১১0 00১,
[illegible] ৭0২৪
[illegible] ম্যানেজার, নর্দার্ন জোন :
[illegible] শেঠি, দিল্লি
[illegible] :
[illegible] গায়ত্রী রায়, দিল্লি
[illegible] প্রতিনিধি : ভি সত্যমূর্তি
[illegible] অফিস :
[illegible] বিজনেস সেন্টার, ওয়ার্ডেন হাউস (দ্বিতল),
[illegible] এম রোড, ফোর্ট, বোম্বাই ৪00 00১
[illegible] ৭২২৯৫, ২৮-৭২৩৩৪, ২৮-৭১৩৫৮
[illegible] VIBICENT
[illegible] 011-5726 AMSL-IN
[illegible] ও প্রকাশক দেবকুমার ব্যানার্জি কর্তৃক [illegible] প্রকাশনী লিমিটেড প্রেস, ৭৭/২/১ লেনিন [illegible] কলকাতা ৭00 0১৩ (ফোন : ২৪-0১৯৯) [illegible] মুদ্রিত ও ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড, [illegible] অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ৭00 0৭২ থেকে প্রকাশিত।

সম্পাদকীয়

সুরসিকা, বাগ্মী ও মনস্বী রাজনীতিবিদ রূপে সরোজিনী নাইডুর বিশেষ খ্যাতি আছে। অথচ তাঁর ব্যক্তিসত্তার আর একটি প্রোজ্জ্বল পরিচয় হল – তিনি একজন কবি। কেবল কবি বললেই তাঁর প্রতি সম্মান জ্ঞাপন সম্পূর্ণ হয় না। সরোজিনী নাইডুর কবিপ্রতিভা ছিল সতিই আশ্চর্যজনক। হায়দ্রাবাদের নিজামের বৃত্তি পেয়ে তিনি যখন সাগর পাড়ি দিয়ে ইংল্যান্ডে যান, তখন তাঁর মাত্র ষোল বছর বয়স। এই সুকুমার বয়সেই তাঁর মনন ও সংবিত্তি বিস্ময়করভাবে পরিণতি লাভ করেছিল। সরোজিনীর সেই মনীষার দীধিতি উপলব্ধি করে বিদেশী বিদ্বৎকুল অভিভূত হয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। আগামী তেরই ফেব্রুয়ারি, কবি সরোজিনীর একশো আটতম জন্মতিথি উপলক্ষে 'সরোজিনী নাইডুর কবিকৃতি' নামক মনোজ্ঞ নিবন্ধটি প্রকাশ করে আমরা তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধধান অভিবাদন নিবেদন করলাম।

এই সংখ্যায় সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এক আলোচনার প্রায় পূর্ণ বিবরণ সংকলিত হল। বিষয়টি বধূহত্যা বা বধূদাহ। বিংশ শতাব্দীর সমাপ্তি পর্বে এসে আমরা যখন 'সতীদাহ' প্রথাকে আমাদের পূর্বসূরিদের নাক্কারজনক আচরণ বলে মনে করি, ঠিক তখনি 'বধূদাহ' সমকালের এক দুরূহ সংকট হয়ে আধুনিকতার সার্বিক অহঙ্কারকে যেন তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিচ্ছে! সমাজের উঁচু-নিচু সর্বস্তরেই ক্রমে ক্রমে এই সমস্যা দুষ্টক্ষতের মত যেভাবে বিস্তৃত হচ্ছে, তাতে বলা যায়, দারিদ্র্য এবং অশিক্ষাই এর একমাত্র কারণ নয়। এর মূলে রয়েছে উদগ্র লালসা এবং হৃদয়হীনতা। ফলে আজ এই সমস্যাটি শুভবোধসম্পন্ন প্রত্যেকেরই শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'ইন্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অব ফোরেনসিক সায়েন্সেস'কে সাধুবাদ, তাঁরা এই সমস্যার প্রতি আলোকপাত করার জন্য সমাজের নানা ক্ষেত্রের বিশিষ্ট চিন্তাবিদ্‌দের সমন্বয়ে অত্যন্ত সময়োপযোগী এক আলোচনাচক্রের আয়োজন করেছিলেন। সমাজের সুস্থতা রক্ষায় আমরা সকলেই দায়বদ্ধ। তাই আবেদন, কী কী কারণে বধূহত্যা সংঘটিত হচ্ছে, এর সামাজিক প্রেক্ষাপট কী ইত্যাদি জানার সঙ্গে সঙ্গে আমরা যেন সকলেই এই সমস্যা সমাধানে সোচ্চার হই।

পত্রিকা প্রকাশের যাবতীয় অনুষঙ্গের ক্রমবর্ধমান দামের অস্থিরতার মধ্যেও সুকন্যার বিনিময় মূল্য আমরা স্থির রেখেছি। সুকন্যাকে যাঁরা ভালবাসেন তাঁদের অনেকেরই অনুরোধে এবার থেকে সুকন্যার সজ্জার দিকে আমাদের আরো কিছু মন দিতে হল। বর্তমান সংখ্যা থেকে সুকন্যার সামান্য মূল্যবৃদ্ধি এই কারণেই। হয়তো এতে আপনাদের কারো কারো একটু অসুবিধে হবে, তবু যেন পৃষ্ঠপোষকতা লাভে বঞ্চিত না হই। আগেও বলেছি, আবার স্মরণ করি, আপনাদের সহযোগিতাই আমাদের মূলধন, আপনাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণই আমাদের লক্ষ্য। □

মতামত



রাইসা গর্বাচেভ

সোভিয়েত রাষ্ট্রনেতা মিখাইল গর্বাচেভ তাঁর পত্নী রাইসাকে নিয়ে ভারত সফর করে গেলেন। রাইসাকে অবলম্বন করে লেখাটি – 'ভারতীয় সংস্কৃতির সন্ধানে রাইসা' গত ১ জানুয়ারি সংখ্যায় লিখেছেন শ্রীমতী গায়ত্রী রায়। শ্রীমতী রায়ের বক্তব্যে রাইসা গর্বাচেভের যে পরিচয় ফুটে উঠেছে তা রীতিমত বিস্ময়কর। ভারতের শিল্প ও সংস্কৃতির প্রতি রাইসার আগ্রহ ও জ্ঞানের পরিচয় আমাদের মুগ্ধ করেছে। রাইসার প্রশ্নবাণে ন্যাশনাল মিউজিয়ামের ডিরেক্টরও বিব্রত বোধ করেন। রাইসার মনে প্রশ্ন জেগেছে ভারতীয় শিল্পকলায় নারীদেহ সম্পর্কে পক্ষপাতিত্ব কেন? দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপিকা রাইসা ভারত পরিভ্রমণে এসে এদেশের মানুষের অসীম মমতা, বন্ধুত্ব ও ভালবাসা খুঁজে পেলেন। তাঁকে যখন জিগ্যেস করা হল এদেশে এসে সবচেয়ে কি ভাল লাগল? উত্তরে বলেছেন – সবকিছু ভাল লেগেছে, বিশেষ করে এদেশের মানুষদের।' আরও বলেছেন ভারত সফরই হল তাঁর পক্ষে একটা বিরাট উপহার। রাইসা ছাড়া এমন কথা আর কে বলতে পারেন? একথা বলে তিনি বড় মনের পরিচয় দিলেন।

ইন্দ্রানী সোম
কলকাতা-৩৬

শংকরের নারীভাবনা

আলোল্লিকা মুখোপাধ্যায়ের কলমে কথাসাহিত্যিক শংকরের নারীভাবনার পরিচয় পেলাম গত ১ ডিসেম্বর '৮৬ সংখ্যায়। 'কিচেন রেভল্যুশন' না এলে মেয়েদের মুক্তি নেই – শংকরের এমন কথা সতিাই ভাববার মত। শংকর মনে করেন, আমাদের দেশের রাজনৈতিক সমস্যার চেয়ে মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা থেকে আসা তাদের স্বাধীনতার ব্যাপারটাই বেশি মূল্য পাবার অধিকারী। নারীর স্বাধীনতা নারীকে অবমাননা থেকে বাঁচাতে পারে – এ বিশ্বাস আমারও। অর্থের ব্যাপারটাই হচ্ছে যত অনর্থের মূল।

নমিতা সরকার
শিবপুর

ঘরোয়া অ্যালবাম

সুকন্যা ১ জানুয়ারি ১৯৮৭ সংখ্যায় ঘরোয়া অ্যালবাম বিভাগে অন্নদাশঙ্কর ও লীলা রায়কে পেয়ে ভাল লাগল। প্রচারবিমুখ এই সাহিত্যিক দম্পতির বিষয়ে পাঠকসমাজের আগ্রহ অসীম। আপনারা সেই দায়িত্ব নিয়ে তাঁদের কাছে ধন্যবাদের পাত্র হলেন। তবে লেখাটিতে লীলা রায়ের উপস্থিতি সামান্যই। নিজের কথা বলতে গিয়ে নিজেকে আড়াল রাখার এই পরিশীলিত সংযম অবশ্যই তাঁকে মানায়। কিন্তু পাঠকের প্রত্যাশা এসব মনেও রাখে না।

সত্যজিৎ রায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, শানু লাহিড়ী, করুণা সাহা, শম্ভু মিত্র, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত প্রমুখকে ঘরোয়া অ্যালবাম বিভাগে দেখতে পেলে খুশি হব।

নন্দিতা চট্টোপাধ্যায়
সল্টলেক, কলকাতা-৯১

১ জানুয়ারি সংখ্যা প্রসঙ্গে

'সুকন্যা'র ১ জানুয়ারি '৮৭ সংখ্যা প্রসঙ্গে এই চিঠি। এখানে প্রথমেই আছে অন্নদাশঙ্কর রায় ও লীলা রায়ের পারিবারিক জীবনের এক পরিচয়। এটা ভালই লেগেছে। আন্দামানের সমাজসেবী শান্তা লছমন সিং কয়েকজন উপজাতি মেয়েকে নিয়ে ভারত দর্শনে এসেছিলেন। তাঁর সাক্ষাৎকার একটি মূল্যবান সংযোজন। 'শৌখিন হাতের কাজ' ভালই লাগছে। 'সেলাই'ও প্রয়োজনীয় হয়েছে এই সংখ্যায়। 'বিজ্ঞান বিচিত্রা'-য় 'রক্তের বিকল্প কি শুধুই কল্পনা?' অবশ্যপাঠ্য বিষয়। শ্রীমতী রাইসা গর্বাচেভের ভারত সফর প্রসঙ্গে এই সংখ্যায় প্রকাশিত লেখাটি ভাল হয়েছে। রেবা পুরীর 'হেলথ ক্লাব ফিজিকাল' একটি নতুন জগতের সন্ধান দিয়েছে। পিয়ানো শিল্পী

লীলা দেবীর পরিচয় পেয়ে খুব ভাল লেগেছে। টি ভি সিরিয়ালের চার নায়িকা আশা সচদেব, অনিতা কানেৎকর, কিটু গিডওয়ানি ও সুলভা দেশপাণ্ডের পরিচয় জেনেছি এখানে।

সর্বোপরি স্মিতা পাতিলের স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে তাঁর বাবা শিবাজীরাও পাতিল, স্বামী রাজ বব্বর, পরিচালক মৃণাল সেন ও উৎপলেন্দু চক্রবর্তী, অভিনেত্রী শবানা আজমী ও শ্রীলা মজুমদার, অভিনেতা উৎপল দত্ত ও দীপঙ্কর দে যা বলেছেন তা সবই 'সুকন্যা'র পাঠিকাদের মনকে স্পর্শ করবে। স্মিতা পাতিলের মৃত্যুতে 'সুকন্যা'র এই লেখাগুলো প্রকাশ যথোপযুক্ত হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। ভারতের চলচ্চিত্রশিল্পের বিরল প্রতিভাময়ী শিল্পীর অকালমৃত্যুতে আমরা বঞ্চিত। 'সুকন্যা' সেই অভাবের সংগী। এই 'স্মরণ' সত্যই পরিতৃপ্তকারী।

'সুকন্যা'র উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির জন্য আমরা সত্যিই গর্ববোধ করি।

কল্পনা রায়
খড়্গপুর

আদিবাসী সমাজে নারী

[illegible] মহাশয়ের লেখা 'আদিবাসী সমাজে আজও নারীরাই প্রধান' (১ জানুয়ারি সংখ্যায়) বেশ ভাল লেগেছে। ভাবতে ভাল লাগছে বন্য সমাজ হলেও আদিবাসী সমাজে নারীজাতির যথাযোগ্য স্বীকৃতি পেয়েছে। নারীদের বলা হয় এই সমাজের 'প্রাণ'। পুরুষের সঙ্গে সমান তালে কাজে যোগ দেওয়া, সাংসারিক কাজকর্ম এবং সর্বোপরি সন্তান পালনে তাদের ভূমিকা সত্যই প্রশংসার যোগ্য। এছাড়া সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠানে ও নানান সংস্কারে নারীর স্থান সর্বোচ্চ।

বর্তমানের যুগে চরম বিশৃঙ্খলার রাজত্ব চলছে। অথচ অবহেলিত আদিবাসী সমাজে প্রাণোচ্ছল সুন্দর জীবনের ইশারা। তাদের নৃত্যগীতে ও নানান অনুষ্ঠানে তারই পরিচয়। সেখানে নারীরই প্রাধান্য। বর্তমান যুগে আদিবাসী নারীদের এই পরিচয় জেনে ভাল লাগল।

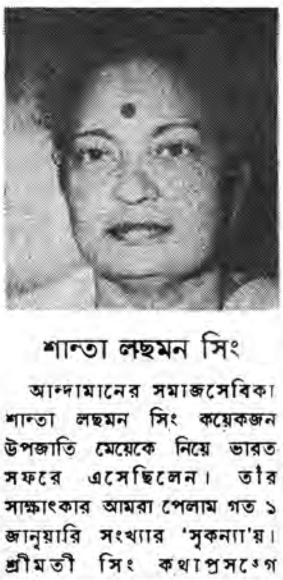
কৃষ্ণা ভট্টাচার্য
বজবজ

স্মিতার জন্য কামনা

আমি সুকন্যার একজন পাঠিকা। এই পত্রিকাকে নিজস্ব পত্রিকা মনে করে গর্ব অনুভব করি। গত ১ – ১৫ জানুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত 'স্মিতা পাতিল স্মরণে' পড়ে ভীষণ অভিভূত হয়েছি। হৃদয়গ্রাহী এরকম রচনা খুব একটা পড়েছি বলে মনে হয় না। চলচ্চিত্র জগতের বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের স্মিতাস্মরণ থেকে বোঝা যায় সে কত বড় অভিনেত্রী ছিল। স্মিতার নিরহংকার সহজ জীবন, অভিনয়ের প্রতি আগ্রহ শ্রদ্ধা নিবেদনের ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে। এ জগতে স্মিতা তার সাধ পূর্ণ করতে পারল না, পরপারে সে যেন চিরশান্তি লাভ করে ঈশ্বরের কাছে এই কামনা করে এই চিঠি লিখলাম। সামান্য এই চিঠিটুকু ছাপলে আমার দুঃখ কিঞ্চিৎ লাঘব হবে বলে মনে করি।



রত্না চক্রবর্তী
সল্টলেক, কলকাতা ৬৪



শান্তা লছমন সিং

আন্দামানের সমাজসেবিকা শান্তা লছমন সিং কয়েকজন উপজাতি মেয়েকে নিয়ে ভারত সফরে এসেছিলেন। তাঁর সাক্ষাৎকার আমরা পেলাম গত ১ জানুয়ারি সংখ্যার 'সুকন্যা'য়। শ্রীমতী সিং কথাপ্রসঙ্গে জানিয়েছেন – আন্দামানে পণপ্রথা নেই, বধূ-নির্যাতন সমস্যাও নেই এবং ওখানকার সমাজকল্যাণ পর্ষদের মাধ্যমে বিবাহ-বিচ্ছেদ ইত্যাদি ব্যাপারগুলোর নিষ্পত্তি ঘটে। এ খবর জেনে আমরা, মূল ভূখণ্ডের বাসিন্দারা স্বস্তি পাই। শ্রীমতী সিং ওখানে কাজ করতে গিয়ে প্রশাসনিক এবং সাধারণ মানুষদের সহযোগিতা পাচ্ছেন – এই খবরে আমাদের দেশের সমাজসেবীরা অনুপ্রেরণা পাবেন।

সুমিত্রা মালাকার সিউড়ি

কমপিউটার ঘটক

কমপিউটার ঘটক ! না, না অবাক হবেন না। ভালবাসা এবং বিয়ের মত ব্যক্তিগত বিষয়ও এখন চলে যাচ্ছে যন্ত্রের হাতে। 'ফাস্ট লাইফ'-এর যুগে বাড়ি বাড়ি গিয়ে মেয়ে কিংবা ছেলে দেখে বেড়ানোর সময় কোথায় ?

নিজের উপযুক্ত সংগী খোঁজার জন্য প্রতি রবিবার অসংখ্য মানুষ জড় হন বেজিং শহরের তিয়োনামেন স্কোয়ারে। কমপিউটারকে আগে ভাগে জানিয়ে দেওয়া হয় নাম, ঠিকানা, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, চাকরি, রোজগার, সাংসারিক অবস্থা এবং রাজনৈতিক মতামত। কমপিউটার তার 'মেমারি' তে এতসব তথ্য সাজিয়ে উপযুক্ত সংগী খুঁজে দেয়। কখনওবা চটজলদি আবার কখনওবা সঠিক সংগী না থাকলে কয়েকদিনের মধ্যেই।

তবে সব থেকে বড় কথা, কমপিউটার ঘটকের খুঁজে দেওয়া সংগীর সংগে সুখে ঘরকন্না করছেন আপাতত তিনশো ত্রিশ জন দম্পতি, বেজিং শহরে।

আমাদের দেশেও 'কমপিউটার বিপ্লব' শুরু হয়েছে। ক্রমেই কমপিউটারের ব্যবহার জীবনের নানান ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ছে। বাড়ির বড়দের কাঁধে শাল ফেলে, কোঁচা সামলে কনে কিংবা ছেলে দেখার দিন কি তবে ফুরলো ? সময় কি তবে আগত যেদিন নিজের জীবন-সংগী খুঁজে নিতে এদেশেও কমপিউটারের স্বারস্থ হতে হবে ?

হায়রে যান্ত্রিক সভ্যতা !

কয়েদি ও ময়না পাখি

সান কোয়েন্তিন ডোলের কয়েদিদের জীবনে এক ঝলক বৈচিত্র্যের আস্বাদ এনে দিয়েছে এক ময়না পাখি। বাকাবাগীশ ময়নার অনর্গল কথা ও নানান ধরনের শিষ মাতিয়ে রেখেছে ডোল প্রাংগণ।

একরাশ লাল ও সবুজ রঙের উজ্জ্বলতা চারিদিক ছড়িয়ে সে উড়ে বেড়ায় এক প্রান্ত থেকে অন্যত্র। কাউকে দেখতে পেলেই প্রশ্ন করে – 'আমি কথা বলতে পারি, তুমি কি উড়তে পার ?' কোথা থেকে যে পাখিটি এসে জেলে বাসা বেঁধেছে তা কেউ জানে না। তবে কয়েদিরা বড় খুশি। তাদের মনের মত এক বন্ধু পেয়ে।



সেদিন জেলার তো দেখে অবাক। খুনের এক দাগী আসামী ছোট্ট ছেলের মত হাততালি দিয়ে ডোলময় পাখির পেছনে দৌড়ে বেড়াচ্ছে। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ির আড়ালে সরল হাসি। চোখদুটো খুশিতে ঝলমলে।

বিচিত্র অংকন পদ্ধতি

চীনের ইউনিক স্কুলের এক শিল্পী সম্প্রতি বিচিত্র এক আঁকার পদ্ধতির আবিষ্কার করেছেন। জিয়ান শহরের উ জিংশি নামে এই শিল্পী সরাসরি আঁকার বোর্ডের উপর রং ঢেলে ছবি আঁকেন। কোনো তুলি বা কলমের ব্যবহার তিনি করেন না।

বিশেষজ্ঞদের মতে জিংশির আঁকা ছবিতে প্রাচীন চীনা চিত্রকলা, পশ্চিমী তেলরংগের কাজ, খোদাই, জল-রঙ এবং ফটোগ্রাফ – সবকিছুরই এক চমৎকার মিশ্রণ ঘটেছে।

দেশে-বিদেশে জিংশির এই অভিনব শিল্পকর্ম প্রচুর সুনাম পেলেও তাঁর নিজের কর্মস্থলে কিন্তু সেগুলির যথাযোগ্য মূল্যায়ন হয়নি।

সম্প্রতি জিংশির আঁকা ১৩টি ছবি প্রকাশ করা হয়।

মন ও পাকস্থলী

একদল গবেষকদের ধারণা আধ্যাত্মিক জীবনের নিয়ন্ত্রণ হয় পাকস্থলীতে। চিন্তাধারা সত্যিই অবাক হবার মতই। আত্মা ও আধ্যাত্মিকতার রহস্য উন্মোচনে মানুষের অনুসন্ধান চলেছে যুগ যুগ ধরে। সঠিক রহস্যভেদ কেউ না করতে পারলেও এ বিষয়ে ব্যাখ্যা ও তত্ত্বের কোনো শেষ নেই। শেষে কিনা পাকস্থলী ?

ক্যারোলিনস্কো ইনস্টিটিউটের গবেষকরা জোর গলায় বলেছেন যে তাঁরা পাকস্থলী থেকে নির্গত হয় এমন ত্রিশটি হরমোনের সন্ধান পেয়েছেন। মস্তিষ্ক এবং কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে এদের সরাসরি প্রভাব আছে। তাঁদের মতে পেট ভরে খাওয়ার পর যে অসাধারণ তৃপ্তি মনকে ভরিয়ে তোলে সেই অনুভূতিই ঘটায় হরমোন আর স্নায়ুতন্ত্রের পারস্পরিক ক্রিয়া।

গবেষকদের বিশ্বাস মনের উপর পাকস্থলীর এই হরমোনের এক নিশ্চিত প্রভাব আছে। সেই প্রভাবই আধ্যাত্মিক চিন্তার এক অন্যতম কারণ।

সুখস্মৃতি

'আড্ডার স্বর্গোদ্যান' রোমের 'কাফে গ্রেকো' বন্ধ হয়ে গেল। এই কাফে সাংস্কৃতিক আড্ডার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিল।

এই রেস্তোরাঁটি সকাল-সন্ধে মুখর করে রাখতেন বিখ্যাত সব শিল্পী, লেখক, বৈজ্ঞানিক, সাংবাদিক, রুপোলি পর্দার অভিনেতা-অভিনেত্রী, গায়ক-গায়িকা, কবি, নাট্যকার, রাজনীতিবিদ ও জীবনের নানান ক্ষেত্রের বিদগ্ধ জন। গত দুই শতাব্দীতে এখানে জমিয়ে খোশ গল্প করে গেছেন গোটে, বায়রন, নিৎশে, টমাস মান, ওয়াগনার, অ্যান্ডারসন সহ সংস্কৃতিজগতের বহু বিশিষ্ট তারকা।

১৭৬০ সালে 'কাফে গ্রেকো'র জন্ম। তৈরি করেন নিকোলা মাদালেনা নামে এক গ্রীক। ত্রিশ বছর আগে রেস্তোরাঁটি জাতীয় স্মারকের মর্যাদা পায়।

সম্প্রতি রেস্তোরাঁর পানীয়ের মধ্যে কিছু জীবাণু পাওয়া গেছে এবং এর পরিবেশও অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠেছে। এজন্য 'কাফে গ্রেকো' বন্ধ করে দেওয়ার আদেশ দেন কর্তৃপক্ষ।

'কাফে গ্রেকো' বন্ধ হয়ে যাচ্ছে – এই খবরটা ছড়িয়ে পড়ার সংগে সংগে জনসাধারণের মধ্যে আলোড়ন জাগে। বিশেষ করে বুদ্ধিজীবী এবং সাংস্কৃতিক মহলে। অনেকেই তাঁদের হাতের কাজ ফেলে এসে জড় হন। কারো কারো আবেগপ্রবণ মন বাঁধ মানেনি। চোখ জলে ভরে গেছে।

স্মৃতি সততই সুখের ! □

সংকলক : মারীচ

সরোজিনী নাইডুর কবিকৃতি

প্রভাস মল্লিক

উনবিংশ শতাব্দীর শেষপর্বে, ভারতে স্ত্রীশিক্ষা বিকাশের উষালগ্নে, কোনো বাঙালি কিশোরীর কবিপ্রতিভা যদি ইংলণ্ডের বিদ্বৎমণ্ডলীকে যুগপৎ সচকিত ও অভিভূত করে, তবে সেটি নিঃসন্দেহে চমকপ্রদ ঘটনা। সরোজিনী নাইডুর ইংরেজি কবিতা সাহিত্যের ইতিহাসে আজও কিংবদন্তী। কবির একশ আটতম জন্মবর্ষে এই নিবন্ধে সেই কবিকৃতির স্মরণ।



হায়দ্রাবাদ নিজামের সম্মানীয় বৃত্তি গ্রহণ করে সরোজিনী নাইডু যখন ইংলণ্ডের পথে পাড়ি দেন তখন তাঁর বয়স মাত্র ষোল বছর। লণ্ডনে আরথার সিমন্স, এডমণ্ড গস্ প্রভৃতি প্রথিতযশা ইংরেজ সাহিত্যিক ও সমালোচকদের সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য হয় তাঁর। তাঁদের অনুপ্রেরণায় তাঁর কবিতা পর পর আত্মপ্রকাশ করতে থাকে ইংলণ্ডে। এই অল্প বয়সে তাঁর ইংরেজি ভাষার ওপর অসাধারণ দক্ষতা, তাঁর সাধারণ জ্ঞানের পরিধি ও বিস্ময়কর মানসিক পূর্ণতা লক্ষ্য করে লণ্ডনের বিদ্বৎসমাজ একবাক্যে স্বীকার করেন যে, তাঁর এই পৃথিবীর সংগে সর্বস্তরের পরিচিতি পাশ্চাত্য দেশের যেকোন ওই বয়সের তরুণ-তরুণীর চেয়ে অনেক নিবিড়। তাঁর ইংলণ্ড থেকে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ, 'দি বার্ড অফ টাইম'-এর ভূমিকায় স্যার এডমণ্ড গস্ লিখে গেছেন, '...... first made her appearance in London she was a child of sixteen years....... she was already marvellous in mental maturity, amazingly well-read and far beyond a western child in all her acquaintances with the world.'

সরোজিনী নাইডু ইংরাজিতে প্রথম কবিতা রচনা করেন মাত্র এগার বছর বয়সে। এই কবিতা রচনা নিয়ে তিনি লিখে গেছেন, 'আমার পিতা অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন একাধারে সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক ও তখনকার দিনে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, আমাকে চেয়েছিলেন একজন গণিতজ্ঞ বা বৈজ্ঞানিক হিসাবে গড়ে তুলতে কিন্তু কবিতার প্রতি আমার সহজাত প্রেরণা যা আমি তাঁর ও আমার মার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাই তা আমাকে কাব্য সাধনার দিকে টেনে নিয়ে যায়। যখন আমার বয়স মাত্র এগার তখন একদিন বীজগণিতের জটিল গণনীয়ক নির্ণয় করতে বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলছি, কী করে সঠিক সমাধান করব হঠাৎ আমার কলমের মুখে অংকর বদলে একটা সমগ্র কবিতা বেরিয়ে এল, 'When the sum in algebra wouldn't come right', সেইদিন থেকেই কবিতা লেখার ব্রত গ্রহণ করি।' তের বছর বয়সে মাত্র ছদিনে স্যার ওয়ালটার স্কটের 'লেডি অফ দি লেক' গীতিকবিতাগুলির ধাঁচে তেরশো লাইনের এক দীর্ঘ কবিতা তিনি রচনা করেন। এই সময় তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে কিন্তু ডাক্তারের নির্দেশ উপেক্ষা করে তিনি দিনরাত্রি লাইব্রেরিতে অতিবাহিত করতেন। এমনি ছিল তাঁর বই পড়ার অদম্য উৎসাহ। একদিন ডাক্তারের ওপর রাগ করেই কোনোরকম পূর্ব-চিন্তা না করে মুহূর্তের প্রেরণায় লিখতে বসে যান এক নাটক। দুহাজার লাইনের এই নাটকে যে উজ্জ্বল প্রাণবন্ত চিত্র অংকন করেন তা পাঠ করে সব্বাই বিস্মিত হয়ে যায়।

সরোজিনী নাইডুর প্রথম কাব্য সংকলন, 'The Golden Threshold' লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয় ১৯০৫ সালে। তারপর 'The Bird of Time', 'The Broken Wings', 'The feather of the Dawn", 'The Sceptred flute' একে একে প্রকাশিত হবার সংগে সংগে তাঁর কাব্যের গভীরতা ও ভাষার মাধুর্য ইংরেজ পাঠকসমাজকে মুগ্ধ করে। স্যার এডমণ্ড গস্ বিখ্যাত ইংরেজ সমালোচকের ভাষায়, 'The great charm of this gifted poetess is that though so perfect a mistress of the English language she remains a true Indian in her thoughts and imagery.' — যদিও এই অশেষ গুণসম্পন্না কবির ইংরেজি ভাষার উপর দখল ছিল অসাধারণ ও ইংরেজি ভাষাকে কাব্যের মাধ্যম রূপে ব্যবহার করেছেন কিন্তু পাশ্চাত্য জগতের সংগে এই ভাষা ছাড়া অন্য বন্ধন ছিল না তাঁর। তিনি চিন্তাধারায় ও সংস্কৃতিতে ছিলেন একজন খাঁটি ভারতীয়।

স্বকীয় প্রতিভা ও আপন স্বাতন্ত্র্যে খুব সহজেই তিনি ইংরেজি সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার লাভ করেন। ইংরেজ পাঠকমহল তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'গোল্ডেন থ্রেসহোল্ড' শুধু সমাদরে গ্রহণ করে' না, গোল্ডেন থ্রেসহোল্ড পাঠ করে তাঁরা এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, একজন সমালোচক মন্তব্য করেন, 'A mystic ring reechoes through much of Sorojini Naidu's poetry. The Golden Threshold has the indescribable charm which acts like magic on the English mind' — এক অতীন্দ্রিয় মূর্ছনা সরোজিনী নাইডুর অধিকাংশ কবিতাতেই অনুরণিত হয়। গোল্ডেন থ্রেসহোল্ডের কবিতাগুলির

অনির্বচনীয় মাধুর্য ইংরেজ পাঠকের চিত্তে ভাষা, ছন্দ ও সুরের ইন্দ্রজাল রচনা করে।

প্রকৃতি প্রেম ও সৌন্দর্য – ত্রিতন্ত্রীতে তাঁর কাব্যবীণা সুরময় হয়ে ওঠে। তাঁর কবিতা Guerdon বা পুরস্কার কবিতায় তিনি প্রভুর কাছে প্রার্থনা করছেন পৃথিবীর যা কিছু সুন্দর, তাদের কর সৌন্দর্যে মহিমান্বিত আমার প্রাণ ভরিয়ে দাও হে প্রভু – প্রেম, সত্য ও সংগীতের আতিশয্যে –

To field and forest
The gift of the spring
To hawk and heron
The pride of their wings
Her grace to panther
Her tints to dove
For me O my Master
The rapture of love.

– বন ও প্রান্তরে দাও বসন্তের নব উপহার
শ্যেন ও সারসে দাও পক্ষপুট গর্ব অহংকার
কপোতের অংগে অংগে বিচিত্রিত রঙয়ের সম্ভার
চিতাবাঘে দাও,তার সৌন্দর্যের অপার গরিমা
আমার পরানে প্রভু দাও তব প্রেমের মহিমা।

Peace to the vanquished
And hope to the strong
For me O my Master
The rapture of Song

– বরিষ শান্তির বারি ভগ্নরথ পরাহত মনে
আশার বর্তিকা জ্বাল উৎসাহিতে যত বলবানে
আমার অন্তর প্রভু ভরে দাও আনন্দের গানে।

ইংরেজ সমালোচক টার্নবুল মন্তব্য করেছেন, কবিতার প্রথম দুই স্তবকে তিনি ভগবানের কাছে প্রেম ও সত্যের জন্য প্রার্থনা করেছেন। কিন্তু শেষ স্তবকে চেয়েছেন মহত্তম পুরস্কার – সংগীতের পরমানন্দ।

ছন্দ ও শব্দচয়নের দক্ষতা ছিল তাঁর অসাধারণ। তাঁর গীতিকবিতা 'Flute Player of Brindaban' অনেকের মতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান। একজন কবি এই কবিতার ভূয়সী প্রশংসা করে লিখেছেন, শব্দময় সংগীতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান। বাহ্যত সরল হলেও কত সূক্ষ্ম।

Why dids't thou play thy matchless flute
'Neath the Kadamba tree
And wound my idly dreaming heart
With poignant melody
So,where thou goest I must go
My flute player with thee

কেন বাজাও তব অনুপম বাঁশি
কদম্ব তরুমূলে আনি
মম অলস স্বপ্নময় প্রাণ আকুল করে
উচ্চ সুমধুর ওই রাগিণী
তাই যাবে যেথা হে বাঁশরিয়া
যাব সেথা ওই ব্যাকুল বাঁশি শুনি।

Still must I like a homeless bird
Wander forsaking all
The earthly loves and worldy fures
that held my life in thrall
And follow, follow, answering
Thy magical flute call.

– তবে কি আমি নীড়হারা পাখি সম
বাহিরিব সব ছাড়িয়া
এই পার্থিব প্রেম ও জগতের প্রলোভন
যাহা জীবন মর্ম রাখিয়াছে বাঁধিয়া
এবং ধাইব তব পিছে পিছে
ঐ মোহিনী বাঁশির ডাকে সাড়া দিয়া।

সরোজিনী নাইডুর কবিতা 'Wandaring Singer' আমাদের চারণ কবিদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

Where the voice of the wind calls our wandering feet
Through echoing forest and echoing street
With lutes in hand ever-singing we roam
All men are our kindred, the world is our home.

– অরণ্যের প্রতিধ্বনি ও পথের গুঞ্জনের মাধ্যমে বাতাসের স্বর যখন জানায় আমাদের চঞ্চল চরণে আহ্বান ·
মোরা বাঁশি হাতে বাহির হই সদাই কণ্ঠে লয়ে গান
এ জগতে সবাই আপনজন আর ওই পৃথিবী যে আমাদের আপনার ঘর –

Our lays are of cities whose lustre is shed
The laughter and beauty of women long dead
The sword of the battles the crown of old Kings
And happy and simple and sorrowful things—

– আমাদের গাথা সেই জনপদ ঘিরে
যার দ্যুতিতে চারিদিক হয়েছিল উদ্ভাসিত
সেই সব নারীর হাসি ও রূপ বিমোহন
কালের আবর্তে যারা হয়েছে নিমজ্জিত
কত রণক্ষেত্রে অসির ঝনঝনা
প্রাচীন নৃপতির মুকুটের ঝলকানি
কত আনন্দ কত সরলতা
কত বেদনার করুণ কাহিনী –

কবি আরথার সিমন্স সরোজিনী নাইডুর প্রথম কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় লিখে গেছেন – সুন্দরের আকুল আকাংক্ষাই তাঁকে কবি করে তুলেছে, সুন্দরের সংস্পর্শে তাঁর আনন্দের শিরা শিহরিয়া উঠত, যেমন সূর্যমুখী সূর্যের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে প্রসারিত হতে থাকে তেমনি, যখন সুন্দরের দিকে তার চোখ পড়ে তখন তাঁর চোখে সুন্দর ছাড়া অন্য কিছুই ধরা পড়ে না।

তাঁর কবিতা, 'সঙ অফ দি প্যালানকুইন বেয়ারার্স' শব্দালংকার ও উপমার গুণে, ছন্দগৌরবে সমৃদ্ধ। লঘু পায়ে বাহকরা গান গাইতে গাইতে কত সন্তর্পণে পালকি বহন করে চলেছে, কী অপূর্ব ছন্দের নৃত্য হিল্লোলে চটুল শব্দ প্রয়োগে ও তুলির লঘুটানে চলমান জীবনস্রোতের সংগে প্রাণের সহজ গতিবেগকে এক ছন্দে তিনি গেঁথেছেন।

Lightly, O lightly we bear her along
She sways like a flower in the wind of our song
She skims like a bird on the foam of a stream
She floats like a laugh from
the lips of a dream.
Gaity, O gaity we glide and we sing
We bear her along like a pearl on a string.

ধীরে অতি ধীরে
চলি পালকি বহন করে
সে ফুলের মত দোলে
মোদের গানের হিল্লোলে
সে জলস্রোতের ফেনায়
ভাসে হালকা পাখির ডানায়
স্বপন রানীর ঠোঁটে
তার মিষ্টি হাসি ফোটে
এগিয়ে চলি লঘু পায়ে
আনন্দে গান গেয়ে।

মোদের গানের তালে তালে
সে সুতোয় বাঁধা মুক্তাসম দোলে।

সরোজিনী নাইডু ছিলেন নতুনত্ব ও বৈচিত্র্যের সন্ধানী। ভাববস্তু ও আঙ্গিকের অভিনবত্ব তাঁর কবিতার মধ্যে প্রেক্ষণীয় হয়ে ওঠে। 'ইনডিয়ান উইভার্স', 'এলাবাসটার', 'অগ্যাসটাস সঙ্', 'করোমনড্‌ল্ ফিসার্স' প্রভৃতি কবিতায় তাঁর বিষয়বস্তুর কৌলীন্য ইংরেজ পাঠকদের মুগ্ধ করে। এক সমালোচক তাঁর কবিতার ভাষার দীপ্তি ও ছন্দের অভিনবত্বে অভিভূত হয়ে লেখেন, "ছন্দের কমনীয়তা ও ঔজ্জ্বল্য, প্রকাশভঙ্গির সৌন্দর্য এবং অভিব্যক্তির আড়ম্বর ও সূক্ষ্মতা, সবই তাঁর আয়ত্তে ছিল।"

'ইন দি নাইট' ও 'অ্যাট্ ডন' তাঁর দুটি মাধুর্যপূর্ণ ঘুম পাড়ানি গান। মাতা শিশুদের নির্ভাবনায় ঘুমানোর জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন। তারা যেন মনে কোনো সংশয় না রাখে, তাদের পিতা মাতা তাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সারা রাত্রি পরিশ্রম ও পরিকল্পনায় রত।

Sleep O my little ones, sleep
Safe till the day light be breaking......
We have long vigils to keep
Harvest to sow while you sleep
Fair for the hours of your waking.
Ripe for your sickles to reap.

ঘুমাও ছোট শিশুরা ঘুমাও নির্ভাবনায়
যতক্ষণ না ফোটে আলো ভোরের আঙিনায়
আমরা আছি দিতে সতর্ক প্রহরা
রাত্রির মাঝে বীজ বোনা হবে সারা
কাল ভোরে সূর্য ওঠা হয় যেন সফল
কাস্তের মুখে পাও যেন পাকা ফসল।

'অ্যাট্ ডন' বা প্রত্যূষে কবিতায় তিনি শিশুদের শয্যাত্যাগের নির্দেশ দিচ্ছেন, সুখের বারতা নিয়ে দিনের আলো ফুটে উঠছে, পিতামাতার শ্রম সার্থক হয়েছে–

Children, my children, the day light is breaking
The Cymbals of morn sound the hour of your waking
The long night is o'er and the labour is ended
Fair blows the field that tilled and tended.

ওগো মোর শিশুরা চোখ মেলো তোমরা
উষা আজ আলো সাজে সাজছে
'জাগো' 'জাগো' সুরে শুনছ কি দূরে
সকালের করতাল বাজছে
দীর্ঘ রাতের শেষে আঁধার আলোতে মেশে
সার্থক শ্রম আজ সমাপন
ফসল খেতে খেতে পুলকে উঠে মেতে
যতনে করেছি যা করষন...

'ক্রেডল সঙ' তাঁর আর একটি ছন্দোময় ঘুম পাড়ানি গান।

from groves of spice
Over field of rice
Athwart the lotus stream
I bring for you
Aglint with dew
A little lovely dream

লবঙ্গ কুঞ্জবন হতে
ধান শিষের ছন্দে মেতে
ছাড়িয়ে কমলবন
আমি এনেছি উজ্জ্বল
শিশিরে ঝলমল
ছোট্ট এক মধুর স্বপন।



ভাবের গভীরতায় ভাষার দীপ্তিতে ও ছন্দের অভিনবত্বে 'টু এ বুদ্ধ সিটেড অন এ লোটাস' কবিতা নির্দ্বিধায় সরোজিনী নাইডুর অন্যতম অবিস্মরণীয় রচনা বলা যায়।

Lord Buddha on thy Lotus throne
With praying eyes and hands elate
What mystic rapture dost thou own
Immutable and ultimate?

প্রভু বুদ্ধ উপবিষ্ট পদ্মাসন' পরে
ধ্যানমগ্ন আঁখি আর উল্লাসে পল্লবিত কর
লভিয়াছ অপরিবর্তনীয় ও শাশ্বত
কোন অতীন্দ্রিয় পরমানন্দের আস্বাদ।

The wind of change forever blows
Across the tumult of our way
To-morrow's unborn griefs depose
The sorrows of our yesterday.
Dream yeilds to dreams, strife follows strife
And Death unweaves the webs of Life.

পরিবর্তনের স্রোত চিরন্তন বহমান
কর্মব্যস্ত কোলাহলমুখর পথ বাহি
আগত দিনের অজানা শোকের ছায়া
বিগত দিনের দুঃখ দেয় ভুলাইয়া
স্বপ্ন বোনে অন্য স্বপ্ন, দ্বন্দ্ব দ্বন্দ্ব রচে
এবং মৃত্যু করে জীবনের বন্ধন মোচন।

সরোজিনী নাইডুর দুর্লভ কবি প্রতিভার বহু বিচিত্র প্রকাশ ইংরেজ পাঠকদের কম অভিভূত করেনি। তাঁর লিখিত পত্রাবলী সম্বন্ধে কবি আরথার সিমন্স লিখে গেছেন, তাঁর লিখিত পত্রাবলী চমৎকার ইংরাজি গদ্যে লেখা হলেও অপূর্ব শব্দালংকারের গুণে ও ভাবের অফুরন্ত রূপসৃষ্টির গুণে, কবিতার মাধুর্য তার মধ্যে কিছু মাত্রায় হ্রাস পায়নি।

মানবীয় প্রেম ও প্রকৃতিপূজা, স্বদেশের প্রতি অনুরাগ, সৌন্দর্য ব্যাকুলতা, এক দুর্নিরীক্ষ্য সত্তাকে উপলব্ধির সীমায় ধরবার আকুল আগ্রহ – এ সমস্তই সরোজিনী নাইডুর কাব্যের আশ্রিত বস্তু। এডমন্ড গস তাঁর অবদানের কথা চমৎকারভাবে লিখে গেছেন, সরোজিনী নাইডুর কবিতা যদি সূক্ষ্ম ও মনোযোগ সহকারে পাঠ করা যায়, তা হলে দেখা যাবে যে, পন্ডিত ও ঐতিহাসিকদের প্রাচ্যের অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানগুলিকে আলোকিত করবার যা অবদান, তার চেয়ে তাঁর অবদান কম নয়। □

শিল্পী দম্পতি প্রসূন ও মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়। সংগীতের সুরের যুগলবন্দীর মত এঁদের জীবনও যুগল প্রেমের বাঁধনে বাঁধা পড়েছে দীর্ঘদিন আগে। যুবক প্রসূন ও যুবতী মীরা পরস্পর পাটনায় পরিচিত হয়েছিলেন এক ঘরোয়া গানের মজলিশে। বিজ্ঞানের মেধাবী ছাত্র প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় সংগীতের সাধনায় স্ত্রী মীরার পাশাপাশি শুধু থাকেননি, আছেন পরিপূরক হয়ে। এই শিল্পী দম্পতির সংগীত, জীবন, সংসার এবং একান্ত ব্যক্তিগত কথনে পরস্পরের হৃদয়ানুরাগের এক অন্তরংগ প্রতিবেদন এবারের 'ঘরোয়া অ্যালবাম'।





প্রসূন ও মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়

ওর সংগে আমার প্রথম দেখা হয়েছিল সংগীত চক্রের অনুষ্ঠানে।

'না না, সে তো অনেক পরে। আমাদের প্রথম দেখা পাটনা শহরে।'

'দূর, পাটনা গেছি অনেক পরে। আগে এখানেই তোমাকে প্রথম দেখি।'

'না গো, আগে পাটনায়। তুমি ভুল করছ।'

'দ্যাখ তর্ক করো না। প্রেমের ব্যাপারে মেয়েদের স্মৃতিশক্তি অনেক তীক্ষ্ম। আমি বলছি আমাদের প্রথম পরিচয় সংগীত চক্রের অনুষ্ঠানে।'

বসে উপভোগ করছিলাম শিল্পী দম্পতির এই মধুর দাম্পত্য কলহ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, মীরা বন্দ্যোপাধ্যায় –

উচ্চাংগ সংগীত জগতের দুটি অত্যন্ত মূল্যবান সুপরিচিত নাম। এবং ব্যক্তিগত ঘরোয়া পরিচয়, স্নেহপ্রবণ দরদী মানুষ দুজনে। কাছে গেলে মন ভরে যায়।

মীরাদি বললেন, 'জানো তখন সবে ওর নাম কানে এসেছে। সংগীত চক্রে প্রথম ওর গান শুনে মনে হল, বাঃ, বেশ সাহস আছে তো। হয়তো সম্পূর্ণ করতে পারছিল না, কিন্তু গলার এক একটা কাজে যা রিস্‌ক নিচ্ছিল – শুনে ভারি ভাল লাগল আমার। এটা বলছি আমি '৪৯ সালের কথা। তার পরের বছর ঝংকার মিউজিক সার্কেলের অনুষ্ঠানে ও আমার গানের সংগে হারমোনিয়াম বাজাল। এইভাবে ওকে বেশ ভাল লাগতে শুরু করছিল আমার।'

'আমি প্রসূনদার ওই বয়সের ছবি দেখেছি। দারুণ দেখতে ছিলেন তখন উনি, না

– 'মোটেই না। রোগা পাতলা পাজামা পাঞ্জাবি পরা একটা ছেলে আর এক্কেবারে বেরসিক। কোথায় দুটো ভাল কথা বলবে তা নয়, এক্কেবারে গম্ভীর থাকত।'

প্রসূনদা বসে হাসছিলেন। ভারি শান্ত মানুষটি। কথা বলেন কম – এবং যদি বা কোন প্রসংগে বলতে শুরু করেন, সাধারণত মীরাদিকে – হ্যাঁগো তুমি কি বল বলে চুপ করে যান। হাল ধরেন মীরাদি।

'তারপরে আমরা গেলাম পাটনা। মা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। হাওয়া বদল করতে আমি আর বাবা মাকে নিয়ে পাটনায় মামা বাড়ি গেলাম। মামার বাড়ি ছিল গরদারিবাগে, আর ওদের বাড়ি কদমকুঁয়া।'

প্রসূনদা বললেন – 'আমি কিন্তু আসলে পাটনার ছেলে। গানের টানে কলকাতায় এসেছিলাম। ঠিক ওই সময়টায় অসুস্থ হওয়ায় কিছুদিন বাড়িতে গিয়েছিলাম। খবর পেলাম মীরা – তখন চট্টোপাধ্যায়, এখানে এসেছে।' ওঁকে থামিয়ে মীরাদি বলে উঠলেন, 'সে কি কান্ড শোন। আমি তো মামাতো বোন ইলা আর বাবাকে নিয়ে ওদের বাড়ির পথে রওনা দিয়েছি দেখা করব বলে। আমার বাবা শৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় গানবাজনা ভালবাসতেন। শিল্পী ছিলেন নিজে। তাই ওর বাড়ি যাচ্ছি বলে কিছু মনে করেননি। আমরা রাস্তায়, ও এদিকে আমাদের বাড়ি গিয়ে শুনেছে আমরা বের হয়ে এসেছি। ফিরে গেছে বাড়ি। আমরা যেতে দরজা খুলে দিল ওই। সেদিন অনেক গানবাজনা, আর দারুণ খাওয়া হয়েছিল ওদের ওখানে। এত ভাল লেগেছিল আমার পরিবেশটা। ইলা বলেছে, দিদি, আমাদের এখানে জাগ্রত ঠাকুরের কাছে মানত করে যা, প্রসূনদার সংগে তোর বিয়ে হবেই।'

মানত না করলেও বিয়ে হয়েছিল –তবে সে অনেক পরের কথা – ৫৭-র ২১ ফেব্রুয়ারি। মাঝখানে এক দীর্ঘ রোম্যানটিক পর্ব। আজকে মীরাদি জমিদার লালনজীর বাড়িতে আমার গানের ব্যবস্থা করল ও। দারুণ জমাটি আসরে গান করলাম। ফিরে আসার সময় স্টেশনে দাঁড়িয়ে প্রায় হ্যাংলার মতই ওকে বলি – আপনি একটা চাকরি করেন না কেন? মানে চাকরি পেলে বিয়ে করতে পারি আর কি। আর জান ও আমাকে রিফিউজ করল একেবারে। বলে কি যে পথে চলছ চল, আমার রাস্তায় পা বাড়াতে হবে না তোমার। সে কি অপমান আমার ভাব তো

প্রসূনদা লজ্জা লজ্জা মুখে বসেছিলেন।


তানপুরায় সুর মেলাচ্ছেন মীরা ও প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়

হাসলেও সেদিন কিন্তু খুব রাগ হয়ে যেত সেই পাজামা পাঞ্জাবি পরা ছিপছিপে, কিন্তু দারুণ গান গাওয়া ছেলেটির ওপরে – এতই বেরসিক।

– 'ও চিঠি লিখত বাবাকে – পোস্টকার্ডে, সকলের কুশল সংবাদ চেয়ে। তার মধ্যে আমার নামটাও থাকত। তারপর আস্তে আস্তে আমি ওর মেসের ঠিকানায় চিঠি লেখা শুরু করলাম। আর ও যখন এখানে আসত, ঘরের কোনায় উত্তরটা লিখে দিয়ে যেত, খুঁজে নিতাম আমি। ৫১ সালে পাটনার এক মস্ত

ওঁকে জিজ্ঞেস করি, 'সত্যি প্রসূনদা, এরকম করেছিলেন নাকি আপনি?'

– 'না মানে দেখ, মীরা তখন বেশ ভাল গান করে। আমি চাইনি যে আমার মত একটা বেকার ছেলের সংগে ওর জীবনটা জড়াক। তখন গানের জগতে কি-ই বা প্রতিষ্ঠা আমার।'

– 'এদিকে আমার তো তখন চোখ ছলছলে লজ্জায়, অপমানে। ঠিক করেছি আর দেখাই করব না। ওই বছরেই দিল্লি গেছি বাবার সংগে রেডিও প্রোগ্রাম করতে। গাড়ির ধাক্কায় প্রচন্ড



বিবাহ বাসরে ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁর সঙ্গে প্রসূন ও মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়

অ্যাকসিডেন্ট হল আমার। ও চিঠিতে সেই খবর পেয়েছিল। ওর এক দিদি এসে দেখে কি ওর হাতে চিঠিটা ধরা আর দুচোখ প্রায় জলে ভর ভর। এইভাবে সব জানাজানি হয়ে গেল আর কি।'

– 'তাহলে বিয়ে হতে আরো ছ বছর লাগল কেন ?'

– 'আমার বাবার দারুণ অমত ছিল। ও আমাদের বাড়িতে আসে, গান হয়, একদিন বাবা হঠাৎ বললেন – কি ব্যাপার, তোমাদের কি সব গড়বড় শুনছি। আমি বললাম – না মানে ভাল লাগে এই আর কি। আসলে সেই সময় রবিশংকর আর অন্নপূর্ণার গোলমালটা চলেছে। বাবা ভেবেছিলেন দুই শিল্পীর বিয়ে কখনো সুখের হতে পারে না। তাছাড়া আমাদের কোষ্ঠীতেও অমিল ছিল। ওর পত্নীবিয়োগের যোগ আর আমার পতি বিয়োগের। সুতরাং এ বিয়ে তো হতেই পারে না।'

– 'তাহলে শেষ পর্যন্ত হল কি করে ?'

– 'বলি শোন না।' মুখে পান পুরে এসে বসলেন মীরাদি। 'বাবা গ্যাসট্রিক আলসারে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলেন। আমাদের সকলের মন খারাপ। রোজ বাবাকে দেখতে যাই। একদিন ফেরার পথে অনেকদিন পরে ওর সঙ্গে রাস্তায় দেখা – কি খবর, কেমন আছেন – দাঁত বার করে বলছে। রাগে সারা গা জ্বলে গেল আমার।' বাবা হাসপাতালে, আর বলছে কেমন আছেন'!

– 'আমার দোষ কি বল, আমি তো জানতামই না কি। তখন ওইসব বিয়ে ভেঙে টেঙে যাওয়ায় ওর সঙ্গে কোনো যোগাযোগই ছিল না আমার' – বললেন প্রসূনদা।

'পরে শুনেছিলাম' – মীরাদি আরম্ভ করলেন – 'মা বাবাকে হাসপাতালে বলেছিলেন, 'কাল রাস্তায় প্রসূনের সঙ্গে দেখা হল। আহা গো, মীরার মুখটা শুকিয়ে গেল একেবারে। তুমি এত অমত করছ কেন বিয়েতে।' বাবা তখন নাকি বলেছিলেন, 'একবছর পরে ওদের কোষ্ঠীর ওই খারাপ যোগটা কেটে যাবে। আমি যদি মরে যাই, তুমি ওদের বিয়ে দিও।'

শৈলেন্দ্রনাথই সুস্থ হয়ে ফিরে এসে বিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু উপবাসী থেকে সম্প্রদান করতে পারেননি। দুই হাত এক করে দিয়েছিলেন মীরাদির জ্যাঠামশাই।

– 'তার আগে উনিশ তারিখে আমরা দুজন নবদ্বীপে প্রোগ্রাম করতে গেছি। কুড়ি তারিখ সকালে স্টেশনে নেমে বলি – কাল আসছেন তো, ও বলে যাব, একটু দেরি হতে পারে। সেদিন ভারী আনন্দ হচ্ছিল আমার। এত দিনের প্রেমের পরীক্ষাতে শেষ পর্যন্ত জিৎ হল। সন্ধেবেলায় বসে একটা গানে সুর দিয়ে ফেললাম।' – প্রায় কিশোরীর উচ্ছলতায় গুনগুনিয়ে উঠলেন মীরাদি – রাগাশ্রয়ী কণ্ঠে – 'ভুলে যেও প্রিয় ভুলে যেও অভিমান/হারানো দিনের বেদনা বিধুর গান'।

– 'আমাদের বিয়েতে কে না এসেছিল' – প্রসূনদা নিজেদের প্রেম পর্বের অধ্যায়টিকে সযত্নে এড়িয়ে গিয়ে এতক্ষণে মুখ খুললেন – 'বিয়ে হ'ল গোধূলিলগ্নে। রাত্রে বাসর জাগা। কমেডিয়ান অজিত চট্টোপাধ্যায় সারা রাত লোক হাসিয়েছিলেন। গান গেয়েছিলেন আল্পনা বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, উৎপলা সেন। গান গেয়েছিলাম আমি আর মীরাও। মনে আছে সানাই বাজিয়েছিলেন সিনিয়ার আলি হোসেন আর পরের দিন আমাদের বউভাতে আলি আহম্মদ হোসেন। আমাদের গুরু বড়ে গোলাম আলি সাহেব নিজে এসে আশীর্বাদ করে যান।'

লম্বা কাহিনীর শেষে সাময়িক বিরতি

পারিবারিক অবসরে



আজ আপনার কেয়ো-কার্পিন চুলে ফ্রেঞ্চ রোল বাঁধুন। খুব ফ্যাশনেবল দেখাবে!

শিখে নিন, কেয়ো-কার্পিন চুলে ফ্যাশনেবল দেখাতে হলে কি ভাবে বাঁধবেন



মাথার মাঝখানে ছোট সিঁথি কেটে চুল পিছনের দিকে আঁচড়ে নিন।

সমস্ত চুল টেনে মাথার বাঁ ধারে নিয়ে যান। পিন দিয়ে বেশ করে আটকান যাতে চুল বাঁ ধারেই থাকে।

চুলের ডগাগুলি ভালভাবে মুড়ে সবচুলগুলি নিয়ে একটা রোল পাকান। রোলটি যেন পরিচ্ছন্ন হয়।

মাথার মাঝখানে সুন্দর করে পিন লাগিয়ে আটকান। চুল যেন বেরিয়ে না থাকে। সুন্দর দুটি ক্লিপ লাগান।





চুলের সর্বাঙ্গীন যত্নের জন্যে প্রতিদিন ব্যবহার করুন মৃদু সুরভিত কেয়ো-কার্পিন হেয়ার অয়েল।

চুলের পুষ্টি যোগাবে। চুল থাকবে সুন্দর ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল—অথচ তেলমাখা চটচটে ভাব একেবারেই থাকবে না।

এবার আপনি খোঁপা বাঁধুন, বিনুনী করুন, চুল খুলে রাখুন, কিংবা, যা খুশী তাই করুন। আপনাকে ভারী সুন্দর লাগবে।

১০০ মি·লি· ও ৩০০ মি·লি· শিশিতে পাওয়া যায়।

কেয়ো-কার্পিন

সুগন্ধী হেয়ার অয়েল।
চুল চটচটে করে না।

সুস্থ চুল। সুন্দর চুল। কেয়ো-কার্পিন চুল।

Dey's®

যাদের যত্নই আপনার আস্থা



বিয়ের রজতজয়ন্তী উৎসবে মীরা ও প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়

– সঙ্গে ওঁদের বাড়ির স্পেশাল ভাতের থালায় ভরা খাবার সন্দেশ। চা আনতে উঠে গিয়েছিলেন মীরাদি। প্রসূনদাকে জিগ্যেস করি, 'বিয়ের পর আপনারা রইলেন কোথায় ?'

– 'আমি মেসে আর তোমার দিদি বাপের বাড়িতেই। অত্যন্ত বিচক্ষণ মানুষ ছিলেন আমার শ্বশুরমশায়। তখনো আমি তেমন কোনো প্রতিষ্ঠা পাইনি। সে অবস্থায় আলাদা সংসার পাতা ঠিক হত না। উনি, চেয়েছিলেন আমিও ওখানে থাকি। থাকিনি, তবে যেতাম রোজই, মধ্যে মধ্যে থাকতাম। ওইখানেই আমাদের প্রথম দুই মেয়ের জন্ম। বারো বছর পরে প্রথম বাড়ি ভাড়া করি ল্যানস্‌ডাউন রোডে, ছোট মেয়ে জন্মায় সেইখানে। আমাদের কসবার এই বাড়ি শ্বশুরমশাই নিজে দাঁড়িয়ে করিয়ে গেছেন।'

গরম চায়ের কাপ যত্ন করে আমার হাতে ধরিয়ে মীরাদি বসলেন। 'আমার মেয়ে জামাই নাতি নাতনির কথা বলে দিই। বড় মেয়ে দেবযানী জামাই অঞ্জন মুখার্জি, ব্যবসা আছে ওর। ওদের দুটি সন্তান। অনন্যা – কে জি টুতে পড়ে আর কত্থক নাচ শেখে শ্রীলেখা মুখার্জির কাছে। আর আমার বংশের একমাত্র প্রদীপ আমার দৌহিত্র দেড় বছরের ছোট্ট টুবাই – নেপালীর মতো দেখতে বলে নাম দিয়েছি তারাং – দৌহিত্র গর্বে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে দিদিমার মুখ। অবশ্য দিদিমাই বা কেন, মীরাদিকে এমনিতেই মা মা দেখতে। সদা সর্বদা দেখেছি ওঁকে। খুব চওড়া পাড় দারুণ সাদা বা অফ হোয়াইট তাঁতের শাড়ি পরতে। মাথায় চওড়া সিঁদুর, দুজোড়া শাঁখায় ভরন্ত, লক্ষ্মীমন্ত হাত।

– আর মেজ মেয়ে ইন্দ্রাণী। ওর স্বামী অশোক চাটার্ড অ্যাকাউনটেণ্ট। খুব ভাল তবলা বাজায়। ওর একটি মেয়ে নীলাঞ্জনা ছোট্ট –নাচ শেখে মালবিকা মিত্রের কাছে

ওঁদের কনিষ্ঠা কন্যা নন্দিনী অবিবাহিতা, সাউথ সিটি কলেজের ছাত্রী। প্রসূনদা বললেন – তা মেজ ভাল গান করে, আর ছোট সেতার শেখে।'

বেলা এগারোটা। একটি দুটি করে মীরাদির ছাত্রীরা আসতে আরম্ভ করেছে। প্রসূনদার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ নয় বলে ওঁর ছাত্রদের আজ ছুটি। মীরাদি আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন, 'জানো তো ওর কিছু হলে আমি ফাটা বেলুনের মত একেবারে চুপসে যাই।' এখন বরং গল্পে গল্পে কিছুটা উজ্জ্বল লাগছিল ওঁকে।

– এত বেলায় গান শুরু হবে –খাওয়া দাওয়া করেন কখন ?'

– আমরা খাই বেলা তিনটের পর। আরে বাবা গানের বাড়ি। অত নিয়ম মানলে চলে নাকি! আমার মেয়েরা যখন ছোট ছিল, ওরাও খেত বেলা দুটোর সময়। আমার গোপালকেও তো ভোগ দিই বেলা তিনটেতে। এই সবে জল খাবার দিয়ে এলাম।

এই গোপাল বিগ্রহ মীরাদির বড় আদরের। বাড়ির রান্না লোকে করেন। কিন্তু গোপালের সেবা, গোপালের স্নান খাওয়া প্রতিদিন ওঁর নিজের হাতে করা চাই। 'খেয়ে যাও আমার গোপালের ভোগ –'মীরাদির সাদর আমন্ত্রণ।

প্রসূনদাকে জিগ্যেস করি, 'মীরাদির তো গোপাল। আপনার কি কোন বিশেষ দেবদ্বিজে ভক্তি আছে'

– 'গোপাল বা শ্রীকৃষ্ণের আমাদের উচ্চাঙ্গ সংগীতে একটি বিশিষ্ট জায়গা আছে। তবে বিশেষ করে যদি জানতে চাও, আমার বিশ্বাস সেই এক অখণ্ড

পূজোর ঘরে প্রসূন ও মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়



ঈশ্বরে যিনি এই বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন। দ্যাখ, আমি বিজ্ঞানের ছাত্র, তবুও এই বিশ্ব, এই বিরাট মহাকাশের কথা ভাবতে বসলে অবাক লাগে। যদিও আমি কেমিস্ট্রি, ফিজিকস আর ম্যাথামেটিক্স-এর ছাত্র ছিলাম, বিজ্ঞানের এই দিকটা আমাকে ভীষণভাবে টানে।'

– 'ওর হবিই হল ওই। যেখানে যা কিছু বিজ্ঞান সম্পর্কে লেখা পায়, পড়ে। আবার আমি সময় পাই না বলে, আমি যখন রান্না বা অন্য কোনো কাজ করি, ও আমাকে তা পড়ে শোনায়। টিভিতে বিজ্ঞানের ওপর কোনো অনুষ্ঠান হলে আমাকে ডাকাডাকি লাগিয়ে দেয়। আমার কি মনে হয় জান যে আহা, বিজ্ঞানে ওর এত উৎসাহ, ও যদি এ লাইনে না এসে ওই পড়াশোনা নিয়ে থাকত, কত ভাল হত তাহলে। আমি হয়তো ওকে পেতাম না জীবনে, কিন্তু ও হয়ত তৃপ্ত হত বেশি।

অসম্ভব আবেগপ্রবণ মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়। কথা ঘোরাই – 'আচ্ছা আপনারা তো দুজনেই সারা জীবন সাধনা নিয়ে রইলেন। মেয়েদের একেবারে ছোটবেলাটায় কে দেখাশোনা করত ওদের?'

– 'সে ব্যাপারে আমার স্বামী আমাকে অসম্ভব সাহায্য করেছে। প্রতিটি কাজে। এমন কি রাত্রে বাচ্চারা জাগলে ও উঠে তাদের কাঁথা বদলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিত পর্যন্ত, আমাকে ডেকে বিরক্ত করত না। দায়, ঝামেলা যা কিছু, ও ভাগ করে নিয়েছে সব সময়।'



অবসরে আলাপ করছেন মীরা ও প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়

শুধু সন্তান পালনে নয়, সংগীতের ক্ষেত্রেও ওঁরা একে অন্যের সুখ দুঃখের সমান অংশীদার। অনুষ্ঠানে যদি কোনো কারণে একজনের গান খারাপ হয়ে যায়, তিনি আশা করে থাকেন যে অন্যজন ভাল গেয়ে সে অভাবটুকু পুরিয়ে দেবেন।

তাই বলে কি ঝগড়া একেবারেই বাঁধে না। – বাঁধে বই কি। তবে আর মধুর দাম্পত্য কলহ বলেছে কেন। প্রসূনদা খেতে ভালবাসেন। কিন্তু ভাতের পাতে দেখলেন তেলাপিয়া মাছ। তলব পড়ল কাজের লোকটির – এই মাছ তোকে কে আনতে বলেছে? উত্তর এল – কেন মা-ই তো আমাকে টাকা দিয়ে তেলাপিয়া মাছ আনতে বলেছেন। এসব ক্ষেত্রে প্রসূনদার অবশ্যই যথেষ্ট যুক্তিসংগত কারণ থাকে স্ত্রীর ওপরে রেগে যাবার।

–আসলে মীরাদি হাসলেন – 'ও খুবই খেতে ভালবাসে। মিষ্টি বোধহয় ওর সব থেকে প্রিয় জিনিস। আর মাংস।'

প্রসূনদা বাধা দিয়ে বললেন – 'না না, মাংস আজকাল আর ভাল লাগে না। এখন ভাল লাগে উচ্ছে, কলমি শাক, নিরামিষ তরকারি এইসব।' আসলে এক্ষেত্রেও ওঁরা একে অন্যের পরিপূরক। মীরাদি খাওয়াতে ভালবাসেন, প্রসূনদা খেতে।

এই খাবার প্রসংগে কথা উঠল, একদা ওঁরা নিয়মিত সপ্তাহে একদিন সিনেমা দেখে বাইরে চাইনিজ খেয়ে বাড়ি ফিরতেন। আস্তে আস্তে মেয়েরা বড় হয়ে যাবার সংগে সংগে কবে যেন এই অভ্যাসটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ওঁদের। এখন অবশ্য বড় দুই মেয়ে তো পতিগৃহে, আর ছোট মেয়েও যথেষ্ট বড় হয়ে গেছে। – 'কিন্তু কি জানি' – মীরাদি বললেন, 'এখন আর সেই ইচ্ছেটাই নেই আমাদের। বাড়িতেই যেন ভাল থাকি। শনি রবিবার ছবি দেখি টিভিতে। ছাত্রছাত্রীরা বাড়িতেই আসে। বাইরে দুটো প্রতিষ্ঠানের সংগে যুক্ত আমরা – 'সৌরভ' আর 'শ্রীঅরবিন্দ ভবন'। নানা জায়গায় গিয়ে শেখাতে ভালও লাগে না।'

চলে আসবার সময় বিদায় জানাতে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এলেন মীরা বন্দ্যোপাধ্যায় – জানো, আমাদের হয়তো অনেক টাকা নেই। আমরা পলিটিক্স করতে পারি না, যার জন্যে ওর মত একজন শিল্পীর খেয়াল গানের রেকর্ড করবার ডাক আসেনি আজ পর্যন্ত। এসব ব্যাপারে যে ধরাকরা করতে হয়, তা আমাদের রুচিতে বাধে। তবু, নাই হল ওসব, আমরা চারপাশের সব কিছুর সংগে দুজনে দুজনকে নিয়ে সুখী, তৃপ্ত। জানো, ভাল আছি আমরা, খুব ভাল আছি।

শিখা বসু

ছাত্রীদের গান শেখাচ্ছেন মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়



ফটো : ইন্দ্রজিৎ মিত্র ও পার্থ রায়চৌধুরী

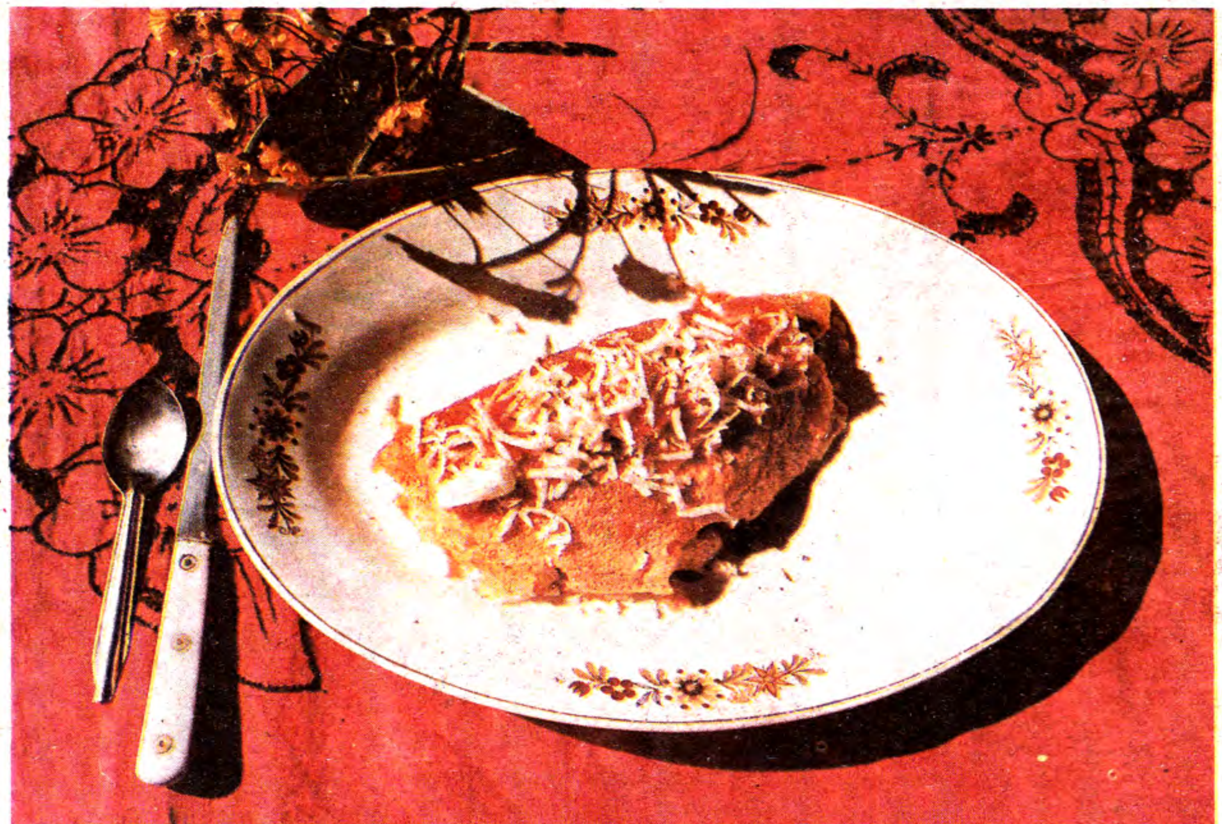
মিনি লাঞ্চ

এখন অনেক ঘরেই স্বামী এবং স্ত্রী দুজনেই চাকরি করেন। ভোরবেলা তাড়াতাড়ির সময় তাই হয়ত পরিমাণমতো খাওয়াই হয় না। তাই আজ চটজলদি কতকগুলো 'মিনি লাঞ্চ' তৈরির প্রণালী দিলাম যেগুলো বানাতে বেশি সময়ের দরকার হয়



হোয়াইট ওটস উইথ ফ্রুট

নুডলস ওমলেট



না, অথচ পেটও অনেকক্ষণ ভরা থাকবে। অথচ ক্যালোরি, প্রোটিন, ভিটামিন সবই বজায় থাকবে। একবার রান্না করে দেখুন তো আপনাদের পছন্দ হয় কি না!

হোয়াইট ওটস উইথ ফ্রুট

'মোহন'-এর হোয়াইট ওটস বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। এটা খুবই পুষ্টিকর এবং খেতেও চমৎকার। ব্রেকফাস্ট হিসাবে এর তুলনা নেই।

উপকরণ : হোয়াইট ওটস – আধ কাপ, দুধ – ৫০০ মিঃ লিটার, ফল – আপেল, কলা, আনারস এবং কমলা লেবু, চিনি – স্বাদ অনুযায়ী।

প্রণালী : প্রথমে ওটস অল্প জল দিয়ে সেদ্ধ করুন। এবার ওতে দুধ দিন। পনেরো মিনিট সেদ্ধ করুন। তারপর চিনি দিন। ওটস সেদ্ধ হয়ে গেলে নামান। এরপর ওর মধ্যে ফলগুলো টুকরো করে দিন। খুব গরম অবস্থায় ফলগুলো দেবেন না।

এটা আপনি আপনার তাড়াতাড়ি বেরুনোর সময় খেয়ে বেরুলে অনেকক্ষণ পর্যন্ত আপনার পেট ভরা থাকবে। আর পুষ্টির কথা! সেটা নাই বা বললাম।

নুডলস ওমলেট

উপকরণ : নুডলস – ১ প্যাকেট, ডিম – ২টি, চিজ – ১ কিউব, টম্যাটো সস – ১ চামচ, বিনস, ক্যাপসিকাম, গাজর কুচি – ১ কাপ, পেঁয়াজ – ১টি কুচোনো, কাঁচা লঙ্কা – দুটি কুচোনো, নুন – স্বাদ অনুযায়ী।

প্রণালী : প্রথমে নুডলস সেদ্ধ করে রাখুন। ডিম দুটি ভেঙে ফেটিয়ে রাখুন। এবার কড়াইতে তেল দিন। কুচোনো পেঁয়াজ ভাজুন। তারপর কুচোনো ভেজিটেবলগুলো মেশান। কাঁচা লঙ্কা কুচি দিন। নুডলস দিন। নুন দিন। নাড়াচাড়া করে নামান। এবার আবার ফ্রাইপ্যানে তেল দিন ফেটানো ডিম দিয়ে বড় একটি ওমলেট তৈরি করে, তার মধ্যে – ভেজিটেবলস ও নুডলস দিন। পুরটা ভেতরে ভরে ওমলেটটা ভাজ করুন। ফ্রাইপ্যান থেকে নামিয়ে একটা প্লেটে রাখুন। একটা বিরাট বড় স্টাফড অমলেট তৈরি হল। ওপরে চিজ গ্রেট করে দিন। চামচে করে টম্যাটো সস্ ওপরে ছড়িয়ে দিন। ব্যস্ আপনার পেটভরা 'মিনি লাঞ্চ' এখনই তৈরি। গরম গরম খান, অতি সুস্বাদু।

উপ্মা

উপকরণ : সুজি – ১ কাপ, ঘি বা বাদাম তেল – ১ বড় চামচ, ফুলকপির ফুল কয়েকটা, গাজর, বিন, পেঁয়াজ এবং আলু কুচি ১ কাপ, কারিপাতা – এক আঁটি, সরষে ও মটর ডাল – ফোড়নের জন্য (অল্প পরিমাণ), শুকনো লঙ্কা – ২টি, নুন ও মিষ্টি – স্বাদ অনুযায়ী।

প্রণালী : শুকনো কড়াইতে প্রথমে হালকা আঁচে সুজি ভেজে বাদামি করে নিন। এবার কড়াইতে তেল দিয়ে, মটর ডাল, সরষে, শুকনো লঙ্কা, কারিপাতা দিন। ভাজা হয়ে গেলে তুলে রাখুন। এবার ওই তেলের মধ্যেই পেঁয়াজ, গাজর, ক্যাপসিকাম, আলু এবং কপি ভাজুন। তারপর সুজি দিন। ভাল করে নাড়াচাড়া করে, জল দিন। নুন ও মিষ্টি দিন, কারিপাতা, সরষে, মটরডালের দানা এবং ভাজা শুকনো লঙ্কাটা দিন। জল শুকিয়ে গেলে নাড়াচাড়া করে নামিয়ে নিন। গরম গরম খান।

ব্রেড ভাজি

উপকরণ : ১টি মিডিয়াম সাইজ ব্রেড, আধ কাপ টক দই, ১ চায়ের চামচ বেসন, ৪টে কুচোনো কাঁচা লঙ্কা, ২ চা চামচ কুচোনো ধনেপাতা। পৌনে এক চা চামচ হিং, আধ চা চামচ লঙ্কা গুঁড়ো, নুন স্বাদ অনুযায়ী, ভাজার জন্য তেল

প্রণালী : পাউরুটির ওপরের বাদামি অংশটা কেটে ফেলুন। তারপর পাউরুটি ছোট ছোট টুকরো করে কাটুন। এবার দই-এর মধ্যে অল্প জল মিশিয়ে পাউরুটির টুকরোগুলো ওর মধ্যে ভেজান। এবার ওর মধ্যে কুচোনো ধনেপাতা, কাঁচা লঙ্কা, হিং, লঙ্কার গুঁড়ো, বেসন এবং নুন মেশান। এরপর ওই মিকশ্চারটি (যেন একটু পাতলা হয়) হাতায় করে তুলে গরম তেলে ভাজুন, গরম গরম পরিবেশন করুন, টম্যাটো সস-এর সঙ্গে।

চিজ বল্

এটি একটি অপূর্ব স্বাদের জলখাবার। যার মধ্যে চিজ নেই অথচ চিজের মত সুস্বাদু।

উপকরণ : ৪ চায়ের কাপ – টক দই ২ বড় চামচ – ফ্রেশ ক্রিম, ২ বড় চামচ – কুচোনো পেঁয়াজ, ২ চায়ের চামচ – কুচোনো ক্যাপসিকাম, আধ চায়ের চামচ – কুচোনো কাঁচা লঙ্কা, নুন – স্বাদ অনুযায়ী। এইসঙ্গে ২ চা চামচ পার্সলি পাতা, গাজরের স্লাইস শসার স্লাইস এবং কয়েকটি নোনতা বিস্কুট সাজানোর জন্য লাগবে।

প্রণালী : টক দই একটা মিহি কাপড়ে বেঁধে টাঙিয়ে রাখুন। সমস্ত জল ঝরে গেলে দইটাকে নামিয়ে ওর সঙ্গে ক্রিম ফেটিয়ে নিন। এবার কুচোনো পেঁয়াজ, ক্যাপসিকাম এবং কুচোনো লঙ্কা মেশান। এখন ওই মিশ্রণটি ফ্রিজে ঠান্ডা হতে দিন। এর পর ফ্রিজ থেকে বার করে একটা স্যাপ প্লেটে ঢালুন, গাজরের টুকরো, শসার টুকরো চারপাশে সাজিয়ে দিন। এবার প্লেটের বাইরের লাইনটা নোনতা বিস্কুট দিয়ে সাজান, ওপর থেকে পার্সলি কুচোনো ছড়িয়ে দিয়ে কেটে কেটে পরিবেশন করুন।

ভেজিটেবল অগ্রেটিন

উপকরণ : সেদ্ধ আলু – ১টি, ফুল কপির ছোট ফুল গোটাকয়েক, ক্যাপসিকাম – ১টি, পেঁয়াজ – ১টি, গাজর – ১টি, বিনস – ৬টি, টম্যাটো – ২টি, চিজ – ১ কিউব, হোয়াইট সস তৈরির উপকরণ : ময়দা – ৫ চামচ, মাখন – ২০ গ্রাম, দুধ – আধ কাপ।

প্রণালী : হোয়াইট সস-এর জন্য কড়াইতে মাখন দিন। ময়দা মেলান। ভাজা ভাজা করুন। যখন দেখবেন ময়দা ভাজা হয়ে গেছে তখন দুধ মেলান। যদি দেখেন দুধ মেলানোর সময় ময়দা গুটি গুটি হয়ে গেছে, তখন বিটার বা ছাঁকনি দিয়ে ভাল করে, ফেটিয়ে লিকুইড করুন। এবার সমস্ত ভেজিটেবলগুলো অল্প ভাপিয়ে নিন। টুকরো টুকরো করে কাটুন। এবার ওর মধ্যে ভাল করে নুন ও সাদা মরিচের গুঁড়ো মেশান। এবার আগের থেকে তৈরি করা হোয়াইট সস-টি ওর মধ্যে মেলান। একটা প্লেটে ঢেলে ভাল করে ছড়িয়ে দিন। তারপর ওপর থেকে চিজ গ্রেট করুন ওটার ওপর। ওভেন গরম হতে দিন। এবার গরম ওভেনের মধ্যে ওটি ভরে দিন। চিজ ব্রাউন হয়ে গেলে নামিয়ে ফেলুন।

পনির সারপ্রাইস

উপকরণ : পনির – ২৫০ গ্রাম, পেঁয়াজ – ১টি কুচোনো, কাঁচা লঙ্কা – ২টি কুচানো টম্যাটো – ১ টি কুচানো, তেল – ১ বড় চামচ, নুন ও মিষ্টি – স্বাদ অনুযায়ী, জিরা অল্প ফোড়নের জন্য। রোল তৈরির উপকরণ : ময়দা – ১০০ গ্রাম, নুন স্বাদ অনুযায়ী, ডালডা – ১ চামচ, নারকেল কোরা – ৫০ গ্রাম।

প্রণালী : ময়দা খুব ভাল করে নুন, ডালডা আর নারকেল কোরা দিয়ে মাখুন। মাখার পর একটা ভিজে কাপড় চাপা দিয়ে রাখুন।

এবার কড়াইতে তেল দিয়ে জিরা ফোড়ন দিন। কুচোনো পেঁয়াজ দিন ভাজুন। টম্যাটো কাঁচা লঙ্কা মেশান। পনির গ্রেট করে রাখুন। তার পরে পনির দিন। নুন ও মিষ্টি দিয়ে নাড়াচাড়া করে নামিয়ে রাখুন।

এবার ময়দাটি মেখে ছোট ছোট লেচি করুন। লুচির মত ছোট ছোট করে বেলুন, ভেতরে পনিরের মিশ্রণটি অল্প অল্প করে দিন, রোল-এর মত করুন। মুখের দুদিকটা মুড়ে দিন এবং গরম ডালডাতে ভাজুন, গরম খান আর দেখুন কত ভাল লাগছে। খাবার সময় পছন্দমত সস নিতে ভুলবেন না কিন্তু!

স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়

ফটো : সৌগত রায় বর্মণ

ময়ূর

গুণময় মান্না



আমি দর্শনের ছাত্রী, ভাল ছাত্রীই ছিলাম – জীবন সম্বন্ধে মাঝে মাঝে তাই দার্শনিকতায় পেয়ে বসে। পেয়ে বসে – ওই কথাটাই ঠিক, তখন আমার স্নায়ু-শিরা বিকল হয়, মাথার মধ্যে জ্বলতে থাকে। অথচ লোকে বলে, দার্শনিকরা নাকি প্রশান্ত, নির্লিপ্ত হন। অবশ্য দার্শনিক আর দর্শনের ছাত্রী এক নয়, তবু কিছুটা থাকবে তো? কিন্তু আমার শান্তি কোথায়? অভিমান বলে একটা কথা আছে – প্রেম, ভালবাসায় যার ভিত্তি। একটু বাঁকা – ভালবাসা কাড়বার ছল। ভালবাসতে চাই ভালবাসা কাড়তেও চাই, তাই বাঁকা। কিন্তু আমার অভিমান যে ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে, বিয়ের আটটা বছর পরে সেই অভিজ্ঞতাই কি সত্য হবে? না, আমি হার মানব না।

জীবন সম্বন্ধে চিন্তা নয়, জীবনটাই পেতে চেয়েছিলাম, টু লিভ এ লাইফ। আমি বাবা-মার আদরের মেয়ে, রবির ভালবেসে বিয়ে করা

বউ, পিন্টু আর মান্তির মা, আমাদের নিজেদের একটা ছোট্ট বাড়ি আছে, এর বেশি আমি আর কী চাইতে পারতাম। আমার ধারণা ছিল আমি নিজে ফুটে উঠব, ওরা ফুটে উঠবে।ভেবে ভাল লেগেছে, আমি রয়েছি এই হয়ে ওঠার কেন্দ্রে, অন্তত আমার কিছু ভূমিকা থাকছে। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে, আমার কি অভিমান করা সাজে? আমি দাঁড়াব কোথায়?

ঠিক কোথায় হচ্ছে এবং কী হচ্ছে, এটা নাম-রূপ দিয়ে ধরতে পারছি না – তবে একটা ভাঙচুর হচ্ছে এটা ঠিক। সব বদলে বদলে যাচ্ছে – একটাকে ধরতে গেলে সেটাই অন্য জিনিস হয়ে উঠছে। কোন দিকে তাকাব? পিন্টু আমার প্রথম সন্তান, ছয় পেরিয়েছে, পড়ে ইংলিশ মিডিয়ামে, চটপটে ছেলে বুদ্ধি খুব, কিন্তু কেমন সব যেন দেখছি – বলা উচিত দেখতে পারছি না, কষ্ট হচ্ছে। ওর বুদ্ধি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ছে কেবলই – নষ্ট হচ্ছে কী? রবি বলে, সব দিকে ছেলেদের ইন্টারেস্ট থাকাই তো ভাল। হয়তো ভাল।

পরেরটি মান্তি, সাড়ে তিন বছরের মেয়ে। কান ঢেকে দু'পাশে লটকানো চুল, ডাগর ডাগর টানা চোখ, সবাই বলে ও নাকি আমার মা-র মতো দেখতে হয়েছে – এই কথাটায় কেন জানি না ভাল লাগে, মায়ের মুখও খুশি খুশি দেখেছি। কেন? – সে থাক, মান্তির পাকা-পাকা কথা, ভালও লাগে, কিন্তু সব তাতেই কি ভাল লাগবে? সব ক্ষেত্রেই? একটা নমুনা দিচ্ছি। মা, আমি চা খাব, ওমা, আমি চা খাব – ঝোঁক ধরেছে। ওকে বোঝাই যে, বাচ্চাদের চা খেতে হয় না। মান্তি আবার বলে, কেন খাব না? বলি যে, চা খেলে শরীর খারাপ হয়। কেন, বাপি যে খায়, তুমি খাও – সবাই হাসে, হাসিরও কথা। কিন্তু আমি মা, মায়ের সমস্যা অন্যরকম। আমি ওকে বুঝিয়ে ওর মনটা ফেরাতে চাই, ঠিক তো? আমি লেগে থাকি, বলি, আচ্ছা, একটু, এক চুমুক নাও – নিল, কিন্তু তাতে ও তৃপ্ত নয়। ক্রমাগত ওই একটা কথাই কাঁদতে কাঁদতে বলতে থাকে – কিছুতেই ছাড়ে না। উঃ, কান দুটো খেলি – না বলে পারি না। বাচ্চাদের ওপর রূঢ় হতে নেই এটা জেনেও নিজেকে সামলাতে পারি না, ওকে ঠেলে সরিয়ে আমার থেকে দু'হাত দূরে বসিয়ে দিই, চুপ কর। মান্তি চুপ করল ঠিকই, কিন্তু কী বলল জানেন, বাচ্চারা, বাচ্চারা অমন জ্বালাতন করে – উঃ, ওর বাবারই কথা। ঠিক ছুঁড়ে মেরেছে। আমার মাথার মধ্যে ঝাঁঝাঁ করে যে

কোথাও একটা হেরফের হচ্ছে। ওদের বাবা জাঁকজমক পছন্দ করে, আহারে-বিহারে কথায় সবেতেই, না বলেও পারছি না, গায়ে-পড়া জোর-খাটানো। আর আমি, আমি একটা ফুল ভালবাসি, স্কুলকলেজে আমি গান গেয়েছি, আবৃত্তিতে পুরস্কার পেয়েছি, সবাই বলত শান্ত – আমি জোর খাটাতে চাই না, কিন্তু যা ভাল –

মান্তির সেই কথাটা আমাকে খোঁচা দিয়ে শেখাল, তুমি যে চা খাও। চা ছেড়ে দিলাম আমি, কিন্তু কিছুই হল না, মান্তি পিন্টু চা ছাড়লই না। আমি পারছি না ওদের মনকে ছুঁতে।

সেদিন সন্ধ্যায় পিন্টুকে পড়াতে বসেছি।ওর হাতের লেখাটা বয়সের পক্ষে ভালই। অঙ্ক কষছে – ওআন অ্যাপল কস্টস্ রুপি ওআন – পরের লাইনে লিখল, নাইন অ্যাপল কস্টস্ রুপি নাইন। মান্তি আমার পিঠের দিক থেকে গলা জড়িয়ে কেবলই ঝুঁকে পড়ছিল, অনর্গল বকতে বকতে, এতটাই যে আমার মাথা নুয়ে পড়ছিল তো বটেই, যেকোনো সময় সে-ই হুমড়ি খেয়ে পড়বে। ওকে বাঁ হাতে আটকে বললাম, এ কী করলে পিন্টু, সব নাম্বার ভুল করলে যে। পিন্টু প্রথমেই বলে উঠল, কই? তারপর ভুরু কুঁচকে খাতার পাতায় একটু চোখ রাখল, তারপর হেসে কায়দা করে বলল, সরি। রবার দিয়ে ঘষে কস্ট করল, এস যোগ করে রুপিজ ও করল। – হল তো? চোখ মটকে তাকাল আমার দিকে। ওর কায়দা করা, চোখ মটকে তাকানো আমার ভাল লাগে না, কিন্তু নিজেকে সামলে বললাম, হয়নি। আবার কী হল? – ও যেন বিরক্ত, বাবার ভুল ধরছি বলে। তবু আমার থেকে চোখ ফিরিয়ে খাতার দিকে চোখ কুঁচকে তাকাল পিন্টু, সরি। পরক্ষণেই সেই কায়দা করে হেসে উঠল। শোধরাল নাইনটা, কিন্তু পরের অঙ্কে যেতে না যেতে ও কলমসুদ্ধ দু হাত মাথার পিছন দিকে মুড়ে গা দুলিয়ে বলল, মা, এখন অঙ্ক করতে ভাল লাগছে না, ডোণ্ট লাইক ইট অ্যাট অল, এখন রিডার পড়ি, কেমন? আমি তাকিয়ে আছি দেখে – আমার চোখে কী দেখেছিল জানি না – স্বর বদলে যোগ করল, পরে আবার অঙ্ক করব, বাবা ফিরে এলে, কেমন?

মান্তি সংগে সংগে বলে উঠল, বাপি এখনো আসে না কেন? বলেই আমার ঘাড় ছেড়ে ছুটে গেল বাইরের বারান্দায়, দেখবার জন্য।

আমার গা জ্বালা করছে। কেন? কথাটা তো ভালই, আমরাই পিন্টুকে শিখিয়েছিলাম, যখন কোনো একটা টাস্ক একেবারেই ভাল লাগছে না, তখন কোর না, যখন ইচ্ছে হবে তখন কোর – সেইটেই আমাকে শোনাল। বড়দের সব কথা, সব কাজ ওরা দু'ভাই-বোনে ফিরিয়ে দিচ্ছে, ফিরিয়ে দিচ্ছে কেবল আমাকেই, ওদের বাবার সংগে ব্যাপারটা মোটেই তা নয়, বেশ খাপে-খাপে মিলে যায়। তাছাড়া পিন্টু যে মোটেই সিন্সিয়ার নয়, আমি দেখতে পাচ্ছি ও ফাঁকি দিতে চায়, কিছুতেই মনোযোগ দিচ্ছে না, ও এখন রিডার ধরলেই যে তাতে একাগ্র হতে পারবে, তা নয়, সব ওপরে-ওপরে ছুঁয়ে যাবে। আমি দেখেছি, ওদের বাবারও তাই, কোনো জিনিস গভীরে ভাবে না, একটুও উদ্বেগ নেই, নিজের মরজি আর খুশি নিয়েই আছে। বাবা এলে পড়বে বলছে? রবি এলেই বাবা-ছেলে-মেয়ে মিলে যত রকমের হাসি-খেলা-গল্প আরম্ভ করে দেবে। অফিসের কথা, বাসের কথা, কোনো ডেপুটির মেয়ের কথা ছোটদের কাছে বলার কী আছে? – এতে বাচ্চাদের মনে প্রভাব পড়ে না? পড়াশুনা করে না তা নয়, সেও হুল্লোড় করতে করতে। রবি অবশ্য মুখে মুখে নানা কথা শেখায়। কোনটা ঠিক? –আমি যেটা চাই, নাকি, রবি যা চায় আর ওরা যা পছন্দ করে, সেটা? দেখছি তো আমার কাছেই ওদের অস্বস্তি। হবেও বা – নিজের মন বুঝতে পারছি না, বোধহয় আমি মরোজ হয়ে উঠছি। ওদের সানন্দ সংগ দিতে পারছি না। ওদের উৎসাহের বা চাওয়ার সংগে মেলাতে পারছি না নিজেকে। কোথায় ফাঁক থাকছে?

দ্য জ্যাকল অ্যান্ড দ্য গ্রেপস – পিন্টু তার রিডার পড়া শুরু করেছে। কতবার ওকে আমি বলেছি, সোজা হয়ে বসবে, একটুও দুলবে না – ও হ্যাঁ বলেছে, বোঝেও বটে, কিন্তু দোলটা ছাড়তে পারছে না। যে যেটা করে, সেটা করবেই, আমি কিছুই ছাড়াতে, কিছুই ধরাতে পারব না। পাছে কিছু রূঢ় কথা বলে বসি, উঠে পড়লাম ওখান থেকে। – মা, তুমি কোথায় যাচ্ছ? – উত্তর দিলাম না। মান্তি ছুটে গেছে বারান্দায়, বাবার খোঁজে, না দেখেও বুঝতে পারছি গ্রিলের ফাঁকে ওর নরম গাল চেপে ধরেছে, আর আমি ছিটকে এলাম শোবার ঘরে – পিন্টু তার পড়ার টেবিলে দুলতেই থাকুক। আমরা সবার কাছ থেকে সবাই ছিটকে পড়ছি।

শোবার ঘরে আলো নিবিয়ে বিছানায় এলিয়ে পড়তেই মাথাটা নড়ে উঠল, একটু অন্য রকম হয়ে গেল। চকিতে আর একটা স্মৃতি এল মনে – না, আগে তো আমরা বিচ্ছিন্ন ছিলাম না। – এই, এই, অমনি করে তাকাবে না তো – রবি বলত, আর ওই আবার তাকাত আমার চোখের দিকে, আমার মুখে ওর গরম নিঃশ্বাস, আর চোখের পাতায় – আমি বুঝতাম, আমি দিতে পারতাম নিজেকে, সেদিন –

– বাপি, বাপি –

আরে মান্তি যে, তুই যে রিসেপশনিস্ট হয়ে গেলি – মা কোথায়?

রবি এসেছে, যার কথা ভাবছিলাম। আমার বুকের ভেতরটা লাফিয়ে উঠে স্থির হয়ে গেল, আমি বিছানায় উঠে বসেছি। শুনলাম পিন্টু চেয়ার ঠেলে ছুটে গেল, বাপি, ইউ আর শো লেট টুডে – বাবার গলা শোনার জন্য ওরা দুটোতে যেন উৎকর্ণ হয়ে থাকে। আর আমি যে এত করছি, এতক্ষণ ওদের নিয়েই পড়ে আছি – আমি কিছুই না, কিচ্ছু না।

আমি যাব? – আমার পা দুটো অবশ হয়ে গেছে, খাট থেকে নামতে পারছি না।

– শোন, মান্তি, একটা দারুণ খবর আছে। হ্যালো, পিন্টু –

রবির কণ্ঠস্বর ভরাট, এই কবছর ধরেই শুনে আসছি, বিয়ের আগে থেকেই, ওর কোনো পরিবর্তন হয়নি, আর আমি ? কিন্তু সে কথাও নয় – রবি ওই যে ছেলেমেয়েদের ওভাবে সম্বোধন করছে, হ্যালো বলছে, ওগুলোই আমার কানে খট করে লাগে। বড়-ছেলে – এসবের কোনো পার্থক্য থাকবে না ? ছোটদের বন্ধু হতে হয় সেটা মানি, কিন্তু বন্ধুত্বের রূপটা কি সব ক্ষেত্রে একই রকম ?

– বাপি, এটা কী ?

– বাপি, আমার হাতে দাও –

ওদের কথা শুনেই বুঝতে পারছি, বাবার কাছ থেকে ওরা কিছু উপহার পেয়েছে, কিন্তু – কিন্তু পিন্টু ভুলেই গেছে যে একটু আগে পড়াশুনোয় বসেছিল। রোজ একই জিনিস হচ্ছে, ওদের এগিয়ে গিয়ে বাবাকে অভ্যর্থনা করতেই হবে, রোজই আবার রবির কিছু উপহার দিতেই হবে। ছেলেমেয়েদের হাতে দিতে হয় কিছু, কিন্তু সেটা মাঝে-মধ্যে হওয়াই উচিত নয় কি ? এটাই আর একটা অভ্যাস, আর একটা প্রত্যাশা। আর রবি যে বলল, দারুণ খবর, সেটা কী ?

আমিও দেখছি, উৎসুক হয়ে উঠেছি।

এক মিনিটের মধ্যেই ওরা তিনজনে শোবার ঘরে চলে এল। রবি বলল, কী ব্যাপার, আলো অফ কেন ? শরীর খারাপ নয় তো ?

সংগে সংগে সুইচ অন করে দিল, প্রচুর আলোয় ঝলসে গেল আমার দু চোখ।

– জানো, পিন্টু আর মান্তির ইনভিটেশন, তিরিশে সন্ধ্যায় – আর আমরা দু জন এস্‌কর্ট –

– ইনভিটেশন ! – আমার গলা শুকনো, ঢোক গিললাম। কিন্তু মান্তি পিন্টু চেঁচিয়ে-মেচিয়ে হাততালি দিয়ে অস্থির।

–হ্যাঁগো, বসের মেয়ে বেবি, বার্থডে সেরিমনি, কী দেওয়া যায় বল তো ? – পরমুহূর্তে কিন্তু ও নিজেই সেটা বলল, বেবি তো শাড়ি পরতে শুরু করেছে, তাই না ? মান্তিরা ওকে একটা মুর্শিদাবাদ দিক –

পিন্টু আবারও হাততালি দিয়ে উঠেছে, দারুণ হবে, বাপি। মা, তুমি কিছু বলতে পারবে না –

আমার মাথায় গন্ডগোল হয়ে গেল, ছেলেমেয়েদের সামনে স্বামী-স্ত্রীর কলহ করতে নেই ভুলে গেলাম সে কথা। চেঁচিয়ে উঠলাম, আমরা কি এতই বড়লোক, আর আর –

না, শেষ করতে পারলাম না। বলতে চাইলাম, অত সুকুমার বাচ্চাদের চাল-চালিয়াতি শিক্ষা দেওয়া কেন, কিন্তু মাথাটা ঘুরে উঠল, হাঁপিয়ে উঠে খাটের মুড়িতে মাথা রাখলাম। রাখতে হল।



।। দুই ।।

দিন দুই কেটে গেছে। আমাদের পারিবারিক পরিস্থিতি এমন কিছু বদলায়নি, অন্তত বাইরের দিক থেকে কিছু চোখে পড়ে না, কেবল আমিই বদলে যাচ্ছি। আমার মনই, ভাবতে ভয় করে, বোধ হয় কুচুটে হয়ে যাচ্ছি।

এখন রাত কত ? খুব দূর থেকে থানার পেটা ঘড়ির আওয়াজ কানে আসে। কতক্ষণ আগে বারোটার পরপর আওয়াজ শুনেছিলাম – উঃ, ক্লান্তিকর, থামতেই চায় না। এই মাত্র একটা বাজল, এখন কোনটার ? –সাড়ে বারো, না কি একটা না কি দেড়টা ? কী জানি, আমার হিসেবে গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। যাক গে।

আমরা সবাই এখন শুয়ে আছি, কিন্তু – এঘরে আলাদা বিছানায় ওরা ভাই-বোন, আর পাশের ঘরে রবি শুয়েছে। ওরা সকলেই গাঢ় ঘুমে অচেতন – রবির ঘুম ভাল হলেই নাক ডাকে, ও কি সেটা জানে ? একটু হাসির মত লাগল। পিন্টু মান্তিরও নিয়মিত স্বচ্ছন্দ নিঃশ্বাস, কেবল মান্তির নিঃশ্বাসটা আজ একটু আটকে আটকে যাচ্ছে, একবার কী একটা শব্দও করল, ওর কি সর্দি লেগেছে ? রবিকে বলব ? – না, বলা চলবে না। বললেই তক্ষুনি সাতকাহন করবে, ঠান্ডা লাগল-কী করে ? একটু সাবধানে যদি রাখতে পারো –। হায়, মা-র চেয়ে বাপের দরদ বেশি ! না ভেবে পারছি না। তখনই ডাক্তারের কাছে মান্তিকে নিয়ে ছুটবে। দেখাবে, ওদের জন্য, আমার জন্য, রবির যেন কত চিন্তা, কতই বোঝা – অ্যাঁ, এ কী ভাবছি আমি ! রবির আন্তরিকতায় অবিশ্বাস করছি !

সে যাই হোক, এখন দেখছি ওরা তো সকলেই স্বচ্ছন্দ, আত্মতৃপ্ত – তবে আমি এত ভেবে মরি কেন ? আমার সব চিন্তা তো ওদের জন্য, আর ওরা – আঃ, আমি থামতে পারছি না কেন ? ঘুমহীন চোখে অন্ধকারের মধ্যে কটমট করে তাকিয়ে আছি, আর মাকড়সার জাল বুনে চলেছি নিজের মনে মনে।

আমি কি তাহলে সত্যিই কুচুটে, স্বার্থপর ? আমিও কি নিজের ভাবনাই ওদের ওপর চাপিয়ে দিতে চাইছি ?

না-না, ঈশ্বর জানেন, ওদের জন্যই আমি নিজেকে ছাড়তে চেয়েছি, রাখিনি নিজের জন্য কিছুই। রবি হয়তো সেকথা ভুলে গেছে। এই তো ক বছরের কথা, পিন্টুকে কোলে নিয়ে মাতৃসদন থেকে ফিরেছি, আর সেদিনই আমার নিয়োগপত্র এল। সি এস সি থেকেও আগে আমাকে জানিয়েছিল, অমুক কলেজে নিয়োগের জন্য আমার নাম গেছে, আর সেই কলেজ থেকেও আমাকে ডেকে পাঠাল। রবিই তো পীড়াপীড়ি করছিল আমাকে যোগ দেবার জন্য, পিন্টুর দেখাশোনার সব বিকল্পের কথা ও আমাকে জলের মতো বুঝিয়েছিল। এটা দেখেছি, কোনো ব্যাপারেই আমার স্বামীর আটকায় না, ও একটু উদ্বিগ্ন হয় না, ওর দুশ্চিন্তার লেশমাত্র নেই। তখনও ছিল না। কিন্তু আমি – আমি পিন্টুকে কোনো আয়ার হাতে কয়েক ঘণ্টার জন্য হলেও রেখে কর্মস্থলে যাব ? ভাবতেই আমি শিউরে উঠেছিলাম। মনঃস্থির করতে আমার এক মিনিটও লাগেনি।

পিন্টুর জন্য, রবির ছেলের জন্য, আমি যে স্বার্থত্যাগ করেছিলাম – ইস, নিজের কথা নিজে বলছি, হিসেব-নিকেশ করতে আরম্ভ করেছি তাহলে ! – রবির কাছে তার কি কোনো মূল্যই নেই ? হয়তো আছে, কেননা সেদিনের পর দু একবার সেকথা বলেওছে। এখন যদিও বলে না, তবু ধরে নিচ্ছি মনে রেখেছে ঠিকই। কিন্তু আমার অন্য কথা মনে হয়, আমি কলেজের অধ্যাপিকার চাকরিটা নিইনি, এটাতে রবির মনে আঘাত লেগেছিল। ও সেটা সিন্সিয়ারলি চেয়েছিল – জানি না কেন। হয়তো ওর স্ট্যাটাস বাড়ত, হয়তো পারিবারিক আর্থিক বনিয়াদ আরো দৃঢ় হত। অথচ এ জিনিসটাই আমি গৌণ করতে চেয়েছিলাম।

কাল সন্ধ্যায় মান্তি পিন্টু আর রবিতে মিলে একটা তুমুল বৈঠকি তর্ক বেধেছিল, ওই বেবির জন্মদিনের উপহার নিয়ে। রবির কথা ছেড়ে দিলাম, আমার আশ্চর্য লাগে আমার নিজের ছেলেমেয়ে দুটোকে নিয়ে পিন্টু বলছিল সিল্কের শাড়ি দেওয়া ওর মনঃপূত নয়, শাড়িটাড়ি সেকেলে হয়ে গেছে। ও দিতে চায় একটা আইসক্রিম সেট। মান্তি বোঝে না, অন্তত টাকার হিসেব ওর মাথায় ছিল না, ও একটা লকেটওয়ালা নেকলেসের কথা বলছিল। কিন্তু সেসব নয়, যেটা আমাকে লাগে, তা হচ্ছে – ওরা কতই বা বড়, কিন্তু এরই মধ্যে ওরা স্ট্যাটাস, শো, মানাবে না, এসব কথা শিখল কী করে। ওদের কি সাঁতার শিখতে হয় না, জন্মেই ভেসে থাকতে পারে ! ওদের কথা শুনি, প্রাণপণে চেষ্টা করি নিজেকে স্বাভাবিক রাখতে। রান্নাঘর থেকে এটা-ওটা এনে ওদের পরিবেশন করি, দরকার না থাকলেও তখনই গিয়ে রান্নাঘরে ঢুকি – উঃ, আমার কী হয়েছে আমি জানি না, আমি মা হয়ে আমারই ছেলেমেয়ের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াতে চাচ্ছি !

না-না, আমি মন দৃঢ় করলাম। এসব খারাপ চিন্তা মনের মধ্যে আনব না। ছেলেমেয়েরা যদি বয়সের আগেই পেকে যায় – বলা উচিত পরিণত হয় – তাতেই বা দোষ কী ? আজ না হয় কাল শিখবে। প্রতিভা থাকলে আগেই

শিখবে। না হয়, আমার ছেলেরা আমার কথা না শুনে বাবার বশীভূত হল। তাতেই বা ক্ষতি কী। আমি ঘুমিয়ে পড়বার চেষ্টা করলাম, পড়লামও।

পরের সমস্ত দিনটাই শান্তিতে কাটালাম, মনের মধ্যে ক্ষোভ নেই। ছেলেমেয়েরা স্কুলে, রবি অফিসে গেছে। সমস্ত ঘর আর সময়টা আমার। আমি যদি আমার মতো থাকি, তাহলে তো কোনো ঝামেলা নেই। খাওয়ার পর জানলার পাশে বসেছি চুল এলিয়ে দিয়ে। কোলের ওপর একটা সেলাই মেলে রেখেছি, এখনো হাত দিইনি। আজ বিকেলে আমি একবার শ্যামবাজারে যাব – মাসিমার কাছে। ওরা ফিরে আসুক। কতদিন মাসিমা ডেকেছেন, যাওয়া হয়নি।

ঘরেতে ভ্রমর এলো গুনগুনিয়ে – গুনগুন করছিলাম, কিন্তু গানটা গলায় এসে গেল সত্যিই, ভরা জোয়ারের মতো। একবার, তারপরেও ফিরে ধরলাম। তারপরও ছাড়তে পারলাম না, আর একটা ধরলাম। খুব পুরনো একটা ছবি মনের মধ্যে ঝলসে উঠল। রবি আমাকে ড্রেসিং টেবিলের সামনে চৌকির ওপর বসাত, নিজে বসত মেঝের ওপর, আমার জানুর ওপর বাম বাহু আলতো করে ফেলে শুনত, ছাড়ত না, পরপর গাইতে হত। আমি দারুণ আপত্তি করতাম, ওইভাবে মেঝেতে বসা, আমি যে উঁচু আসনে বসেছি, ও অধৈর্য হয়ে বলে উঠত, আঃ, বিরক্ত কোরো না, একটা সেটিং দরকার নেই ?

তা ঠিক, আমি খানিকটা লজ্জায় খানিকটা আনন্দে গেয়ে যাচ্ছি, তাকাতে পারছি না ওর মুখের দিকে, নতুন বউ তো, কিন্তু আধবোজা চোখে আয়নায় দেখছি কি, ও-ও আমাকে দেখছে না, চোখ নিচু করে নিবিষ্ট হয়ে শুনছে। ওর পাতলা মুখে সরু গোঁফের রেখা, শক্ত চোয়াল, কিন্তু ওর বাহুর ছোঁয়ায় কিছু বুঝতে বাকি থাকছে না। আজ আমি জানলার পাশে টুলেই বসে গান গাইছি, একলা।

সন্ধ্যার তখনো একটু দেরি আছে। তৈরি হয়ে নিতে না নিতেই পিন্টু বলল, মা, তুমি কোথায় যাচ্ছ ?

– যেখানে যাই –

না বলে পারলাম না। কারণ, পিন্টুর গলার স্বর আমার কানে খট করে বাজল, ও আমাকে জিজ্ঞেস করছে যেন খবরদারি করার ভঙ্গিতে। বাবার প্রতিনিধি। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে বললাম, শ্যামবাজারে, মাসিমার বাড়ি। তুমি বোনকে নিয়ে থাকো, কিছু দরকার হলে বিনু-কাকিমাকে ডেকে বোলো, আর বাপি তো এসেই যাবে –

– আমি যাব না ?

পিন্টু যেন আহত, চোখ মটকে – আবার সেই চোখ মটকানো – আমার দিকে তাকাল। যেন আমার কোথাও যেতে হলে ওদেরকে নিয়ে যেতে হবেই। তবু নিজেকে সংযত করে বললাম, না, সোনা, আমি একলাই যাই। তাছাড়া, তুমি বড় হয়েছ, একটু গৃহকর্তা হতে শেখ, বোনটিকে সামলে ঘরে থেক –

মান্তি তখনো শোনেনি, পাশের ঘরে আছে। আমি পিন্টুকে বড়র দোহাই দিলাম, আর ও তো বড়দের মতো কথা শিখেছে, মাতব্বরি করে – বেশ তো, সেটাই ভালভাবে নিচ্ছি আমি, ওরা বড়ই হোক। কিন্তু হল কী, পিন্টুর মুখ ভার হয়ে এল, ও আমার হাতখানা ধরে ফেলল, না, আমি তোমার সঙ্গে যাব, তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না –

মানুষের রক্ত-চলাচলের ওপর তার নিজের হাত নেই, আমার মাথার মধ্যে ছলাৎ করে উঠল। পিন্টুর, আমার আদরের পিন্টুর, হাতখানা সরিয়ে দিলাম, তুমি না বড় হয়েছ, মাকে জড়ায় না – বললাম চাপা স্বরে। কিন্তু গলা তেড়ে বলতে ইচ্ছে করছিল, কই, বাবাকে তো ছেড়ে থাকতে পারো, আর যখন স্কুলে যাও তখন মাকে ছেড়ে থাক না ? আসলে, আমি কাউকে ছেড়ে একটু নিজের মতো থাকব, সেটাই ওরা সহ্য করতে পারে না।

– পিন্টু, বিরক্ত কোর না, আমি একটু বেরুব এটা তোমার সহ্য হচ্ছে না ?

এই কথায় পিন্টুর মুখে দারুণ পরিবর্তন এল, ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল, দু'চোখ জলে ভরে গেল। আমার হাত আর জড়াল না, অনুনয় করে বলল, মা, তুমি আমায় ছেড়ে যেও না। তুমি চলে গেলে আমার খুব কষ্ট হয়, মা গো –

অসহ্য, অসহ্য, আমি আর পারছি না, একটা ভায়লেন্ট কিছু করে বসব। ছিটকে বারান্দায় পালিয়ে এলাম। আমার চোখ ফেটে – না, জল নয়, আগুন ছুটতে লাগল। বারান্দার কোণে বেড়ালিটা – পাড়ার বেড়াল, সব বাড়িতেই ঘুরঘুর করে – তার বাচ্চা কটাকে এনে শুয়ে পড়ে দুধ দিচ্ছিল। ইঃ, কী কুৎসিত ভঙ্গি – দিলাম লাথি মেরে ওগুলোকে ছিটকে। যা-যা।



।। তিন ।।

আজ সেই দিনটি – রবির বস মিঃ সরকারের মেয়ে বেবির জন্মদিনের অনুষ্ঠানে আমরা যাব। সন্ধ্যা সাতটায়। তবে আগেই বেরোতে হবে আমাদের , কেননা, উপহারের জিনিস এখনো কেনা হয়নি। আগেই বেরব, কিন্তু সেটা কখন, চারটেয় নাকি তার আগে – আমি জানি না। হয়তো ওরা বলেছে, আমি শুনিনি – আমার কানে কথা ঢুকছে না।

মানুষের মন জিনিসটাই আশ্চর্য। আর আমার মন – এ যেন সৃষ্টিছাড়া। আচ্ছা, আমি এত ভাবছি কেন ? আজকের পার্টিতে অনেক মহিলাই তো আসবে, সবাই কি আমার মতো ভাবছে, না কি মন-মরা হয়ে রয়েছে ? ওদের ফার্মের ডেপুটি পার্সনেল অফিসারের বউ আমার বাল্যবন্ধু, নিতা, তারও দুটি ছেলেমেয়ে আছে, আজকের পার্টিতে নিশ্চয়ই আসবে। আসবে না আবার, পার্টির নামেই তো ভিরমি যায়। ওদের চলাফেরায় যেন কোনো ভার নেই, আর আমি পা ফেলতে গেলেই আমাকে টেনে নামাচ্ছে।

সকালে আমরা এক সঙ্গে চায়ে বসেছিলাম। বসেই ছিলাম ওদের সঙ্গে, নিজে চা না খেলেও ওদের এগিয়ে দিচ্ছি। পালাবার চেষ্টা করিনি। কিন্তু আমি অন্য খাবার টাবার মুখে তুলতে পারছি । একটা কথা মনে হল, আমি তো ছেলেমেয়েদের জন্য চা ছাড়লাম, রবি তো ছাড়ল না। কার কী করতে পারলাম।

প্রথমটা খেয়াল করিনি, কিন্তু পিন্টুর পাকামি যাবে কোথায়। সে আমার দিকে চোরা-চোখে তাকাচ্ছিল – আর, এটাও আমার খারাপ লাগে, সর্বদাই ওদের চোখের সামনে আমার সব কিছুই খোলা থাকে। তখন বীরত্ব দেখিয়ে চাকরিটা নিইনি, নিলেই হত, তাহলে অন্তত কয়েক ঘণ্টার জন্য হলেও আমি এদের থেকে একটু দূরে থাকতে পারতাম। এইসব সময় গায়ে-গায়ে জড়ানো আমার ভাল লাগছে না। রবি অফিসে যায়, পিন্টু স্কুলে যায় দিনের মধ্যে ভাগ করে অন্যের সঙ্গে হতে পারে, আমারই একলা হবার জো নেই।

যা ভয় করছিলাম। পিন্টু বলে ফেলল, মা খাচ্ছে না –। তাও বলার কী ধরন, ভাবটা নিরীহ, ভেতরটা খোঁচানো।

রবি চকিতে পুরো চোখে তাকাল আমার দিকে, কেন, রমা, তোমার কি শরীর খারাপ ?

উত্তর না দিয়ে হঠাৎই বললাম, শোন, আজকে আমি তোমাদের পার্টিতে যদি না যাই। ছোটদের অনুষ্ঠানে ছোটরাই যাক, সেটাই ভাল।

সে কি, কী হয়েছে তোমার ? – রবির কণ্ঠে আন্তরিক উদ্বেগ প্রকাশ পেল, ওরা বাচ্চারা একলা যাবে কী করে ?

– কেন, তুমি তো নিয়ে যাচ্ছ। সেটাই কি যথেষ্ট নয়

– মানে, তুমি যাচ্ছ না আর আমি যাচ্ছি

তাই তো, সেও এক অসম্ভব ব্যাপার, জোড়ে না গেলে সোসাইটির লোকেরা বলবে কী। কাপুরুষ। তার মানে, সব সময়ই আমাকে গায়ে গা দিয়ে থাকতে হবে।

তর্ক করতে ইচ্ছে করল না, উঠে পড়ে বললাম, বেশ, তাই যাব। কিন্তু ওসব কেনা-কাটা, ওতে আমি নেই

বেশ তো, কিন্তু তুমি উঠলে কেন, তোমার কী হয়েছে, ডাক্তার

বলেছি তো শরীর খারাপ, কী খারাপ,

কেন খারাপ সবই কি ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে বলতে হবে। সিরিয়াস কিছু নয়, ডাক্তার ডেকে হাট বসাতে হবে না –

– রমা, শোনো – রবিও উঠে দাঁড়াল।

আমি সোজা বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করলাম, ঝারিটা খুললাম পুরো হাতল ঘুরিয়ে, বালতিটা পেতে দিলাম নিচে, পলিথিনের গায়ে ছড়ছড় করে জল পড়তে লাগল – ইচ্ছে করেই করছি এসব, কেননা সত্যিই আমার গা বমি-বমি করছিল, মাথা ঘুরছিল, একটু জলো বমিও করলাম। আমি চাইছিলাম না যে ওরা সেটা জানুক, আমার বমির আওয়াজটা ঢাকা পড়ুক।

হাঁপাচ্ছি একটু একটু, কিন্তু আমার গলা তেড়ে বলতে ইচ্ছে করছে, কেন তোমাদের প্রতি কাজে আমাকে এমনি করে টেনে নিয়ে যাবে ? সেদিন মাসির বাড়ি গিয়ে একটু একলা হতে চেয়েছিলাম, পিন্টু আমাকে ছাড়েনি। গায়ে গায়ে সাঁটা, প্রতিদিন প্রতি মিনিট –আর উল্টে আমার কোনো কথা শোনো তোমরা ? আমার ইচ্ছে, আমার মন –

না তো, এ কী ভাবছি আমি ? আমার ছেলেমেয়ে, আমার স্বামী, আমার প্রেমে অনুগত রবি – এদের সম্বন্ধে এসব কথা ভাবাটা কি আমার মনের বিকৃতি নয় ? মাথার ভেতরটা আটকে গেল, চোখে ধোঁয়া-ধোঁয়া, আমি বোধহয় এখুনি পড়ে যাব। বসে পড়লাম মেঝেতে, বালতিটা সরিয়ে দিয়ে ঝারির নিচে মাথাটা পেতে দিলাম, আমার গলা-পিঠ বেয়ে শাড়িজামা ভিজিয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়তে লাগল। ভিজে আঁচলটা দিয়ে চোখের ওপর চেপে ধরলাম, চোখ দুটো আগুনের মতো দপদপ করছিল।

কিছুক্ষণ কাটল হঠাৎ উত্তেজিত হয়েছিলাম, এখন আমার সর্বাঙ্গ যেন ঘুমে নেতিয়ে আসছে! রবিরা কি বাথরুমের দরজার সামনে ভিড় করেছে ? – কোনো শব্দ-টব্দ পাইনি। বিড়ালিটা ডাকল কোথাও, দরজার পাশ দিয়ে গেল কী ? বিড়ালিটা কালকে যেটাকে লাথি কষিয়েছিলাম। শুয়ে বাচ্চাদের দুধ দিচ্ছে। কী বিচ্ছিরি ভঙ্গি পিছনের একটা পা শূন্যে ছিটকানো,মাস্টা আধো-ওল্টানো, পাঁচটা বাচ্চা চো-চো করে দুধ টানছে। টেনেই চলেছে, শুষেই যাচ্ছে–

বিকেলে আমরা বেরিয়েছি। এখন আমার মনে কোনো খেদ নেই। ওদের পোশাক-আসাকের ব্যাপারে আমি কোনো মন্তব্য করিনি। পিন্টু কী পরল, কেমন করে পরল – ও আমার সাহায্য চাইল না, আমিও এগিয়ে যাইনি। মান্তিকে জিজ্ঞেসই করলাম, তুই বলা তো কী পরবি – । যা বলল তা-ই ।ভাবলাম, ওদের ইচ্ছের কাছে সব ছেড়ে দেব। এবং আমাকে ছাড়াই যদি ওদের চলে, তাহলে সেটা চলতে দেওয়াই তো উচিত।

কিন্তু আমি ওদের কিছু না বললে কী হবে, রবি কিন্তু আমাকে ছাড়ল না। তন্তুজ থেকে গেল পুজোয় কেনা একটা শাড়ি বের করেছিলাম, হাঁ-হা করে উঠল। আকাশি রঙের সাউথ ইন্ডিয়ানটা পরতে বলল।

হেসে বললাম, এমনকি চোখ টেরিয়ে তাকালামও ওর দিকে, কী ব্যাপার বল তো, বেবি তো আমার মেয়ের মতোই, তার জন্মদিনে যাচ্ছি –

– তুমি জান না, মিসেস বস দারুণ ঠোঁট-কাটা, কী বলেই বসবে – হয়তো বলবে না, কিন্তু এমন চোখে তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নেবে–

না, ছেড়ে দিলাম। রবি যা বলছে তাড়াতাড়ি তাই করে নিলাম। ঠিকই তো, উপহার দিতে যাচ্ছি একখানা মুর্শিদাবাদি কি একটা আইসক্রিম সেট, আমি এখনো জানি না কোনটা কেনা হবে – আর সেটা দেবার সময় আমাদেরও সমান মাপের সাজ হওয়া চাই, তো। এমনকি একটু সপ্রতিভ হতেও চাইলাম। সাজ সেরে এসে দাঁড়ালাম ওর সামনে, দেখ তো, কেমন মানিয়েছে –

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রবির যেন চোখ আটকে গেল, একটু ভুরু কুঁচকোল কি ? পরক্ষণেই বলে উঠল, সুপার – কিন্তু রবিকে আমি চিনি, ওর কণ্ঠস্বর আমি বুঝব না ? ও চেপে গেল।হয়তো প্রসাধন-প্রলেপনের যে মান ও আশা করেছিল, তা হয়নি।

বললাম, না-না, সত্যি বলো, বদলাব কিছু

– লেট গো, যা সহজে আসে সেটাই তো ভাল। চলো, বেরিয়ে পড়া যাক –

সহজে আসে ? হায়, কথার কি কোনো মূল্য নেই। আমরা কেবলই কথা বলব, মুখেই, আর মনে তার সায় থাকবে না ? নাকি, লজিকাল পজিটিভিটরা যে বলে আমাদের অনেক কথার সঠিক মানে জানি না আমরা – বোধহয় তাই। এই যাঃ, আবার সেই দর্শন –

সমস্ত পথটা মনকে অনুগত করে ছেড়ে দিয়েছিলাম, রবি যেমনভাবেই যে-কোনো জিনিসকেই দেখুক না কেন, আমি প্রতিবাদ করব না। আমাকে যেভাবে নিয়ে যাবে, যা করতে বলবে, তাই করব। সত্যি কথা বলতে কি, এটাতে মনের মধ্যে একটা শান্তির মতো লাগল।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে মিনি-স্টপ পর্যন্ত আসছি, মান্তি গটগট করে এগিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, সেটাই দেখছিলাম। মনে মনে ওর জায়গায় – আমার ছোট্ট বেলার কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। আমি কেমন করে বাবা-মা'র ইচ্ছের কাছে নিজেকে ছেড়ে দিতে পারতাম। আজ ওদের কাছে তেমনি আত্মসমর্পণ করতে চাই।

মধ্য কলকাতার এক ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে ঢুকলাম আমরা। জায়গাটা আমাদের অচেনা নয়। ঢুকেই বাঁ দিকে এগোতে যাচ্ছি, কেননা ওদিকেই শাড়ি-বিভাগ, রবি সোজা এগিয়ে যেতে গিয়ে বলল, ওদিকে না – এস, তোমাকে একটা সারপ্রাইজ দেব –

ও, তবে বুঝি ওরা শাড়ি কিনবে না। তাহলে কী আইসক্রিম সেট ?

মান্তি হেসে উঠল, কি বলতে যেতেই মিন্টু ওকে থামাল, চুপ, আগে বলিস না–

মনের মধ্যে খট করে লাগল। আমি চকিতে রবির দিকে তাকালাম, কিন্তু আমি তো ওর পিছনটাই দেখতে পাচ্ছি, যেন কিছুই হয়নি, এমনিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে।কিন্তু আম আর কিছুই ভাবব না, আগেই তো ঠিক করেছি, ওদের ইচ্ছেমতো ওরা চলুক, আমি শুধু গাভাসিয়ে দেব।

বাঁ দিকের গলি থেকে বেরিয়ে ওদের পিছনে এলাম। ওরা থামল গিয়ে হ্যান্ডিক্রাফটের সামনে। এখানে খরিদ্দার কম, জায়গাটা অপেক্ষাকৃত নিভৃত, কাউন্টারে কেবল এক প্রৌঢ় লোক বসে আছে। আমাদের দেখে চোখে চশমা লাগিয়ে উঠে দাঁড়াল।

– ত্রিপুরার বাঁশের কাজ কী আছে, দেখান তো–

কী দেখবেন বলুন লোকটি পিছনের তাকে পরপর সাজানো শিল্প নমুনাগুলোর দিকে তাকাল।

– ওই ময়ূর একটা নামান তো, এটা বোধ হয় নতুন এসেছে

মান্তি বলে উঠল, বাপি, তুমি যে বলেছিলে মাঝিওয়ালা পালের নৌকো কিনবে, মা যে রকম বানিয়েছিল –

আমি স্থান-কাল ভুলে গেলাম, রবির বাঁ হাত চেপে ধরে বললাম, কী হয়েছে বলো তো, এখানে কী কিনবে

রবি হাসিহাসি মুখে বলল, তুমি তো ফ্যাশন পছন্দ কর না, আর্ট পছন্দ কর, ছেলেরা তাই – তোমার পছন্দ হবে নিশ্চয়ই – বলে ও নামিয়ে-রাখা ময়ূরটা হাতে তুলে নিল। ত্রিপুরার বাঁশের কারুকার্য অপূর্ব। কিন্তু ময়ূরটা যেন একটা দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়ে পেখম মেলে ধরেছে, আমার চোখের তারা কাঁপছে, ঠিক দেখতে পাচ্ছি না।

ময়ূরের থেকে চোখ নিয়ে পিন্টু-মান্তিকে দেখলাম, ওরা হাসিমুখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে, যেন ভাবটা এইরকম, কেমন, খুশি হলে তো ?

–রবি, আমাকে কি কোনো জায়গায় দাঁড়াতে দেবে না আমি আর্ট পছন্দ করি – আমার গলা আটকে গেছে। আমার বুক ধড়ফড় করছে, হাঁপিয়ে উঠছে।

– কী বলছ ?

–বলছি, আমার শরীর খারাপ লাগছে। তোমরা কেনা-কাটা করে এস, আমি বাইরে যাচ্ছি – ওখান থেকে চলে এলাম।



রানী ভিক্টোরিয়া

গ্রেট ব্রিটেনের ইতিহাসে রানী ভিক্টোরিয়ার নাম নানা কারণেই উল্লেখযোগ্য। তিনি শুধু দীর্ঘকাল রাজত্বই করেননি, তাঁর রাজত্বকালে গ্রেট ব্রিটেন হয়ে উঠেছিল শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির পীঠস্থান। শিল্প-সাহিত্যকলার অনুরাগিণী ভিক্টোরিয়া মনে করতেন মানুষের জীবনে প্রেমের স্থানই সবচেয়ে উঁচুতে। তাঁর সান্নিধ্যে গ্ল্যাডস্টোন, ডিজরেলি, লর্ড বিকন্সফিলড, লর্ড পালমারস্টোন, লর্ড মেলবোর্নের মতো পুরুষ এসেছেন। কিন্তু ভিক্টোরিয়া সারাজীবন শুধু একজনকেই প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছেন – তিনি তাঁর স্বামী প্রিন্স আলবার্ট। একুশ বছরের দাম্পত্যজীবনের সুখ ভিক্টোরিয়াকে দিয়েছিল এক স্বর্গীয় আনন্দ। ভিক্টোরিয়ার প্রেম ও পাতিব্রত্যের এক অকথিত বিধুর উপাখ্যান।

কলকাতার মাঝখানে যে সাদা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, মাথায় কালোপরী, তা গড়ে উঠেছিল রানী ভিক্টোরিয়া স্মরণে। উত্তর দিকের গেট দিয়ে ঢুকলে প্রথমেই চোখে পড়ে রানীর শান্ত সৌম্য মূর্তি। তবু অনেকেরই দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। কেউ কেউ এক ঝলক দেখেই ওপর দিকে তাকান। চোখ চলে যায় সাদা মেমোরিয়ালের দিকে। সেই মুহূর্তে হয়তো মনেই পড়ে না, ভারতের ইতিহাসের সঙ্গে রানী ভিক্টোরিয়ার নাম অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িয়ে আছে।

গ্রেটব্রিটেনের ইতিহাসে রানী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকাল সবচেয়ে বেশি সময়ের। ১৮৩৭ থেকে ১৯০১। দীর্ঘ চৌষট্টি বছর। এই সময় দেশের বুদ্ধিজীবীর সংখ্যাও বেড়েছে। এমনকি, উনিশ শতকের অনেক বিখ্যাত মনীষী 'গ্রেট ভিক্টোরিয়ানস' নামে পরিচিত।

১৮১৯ সালের ২৪ মে ভিক্টোরিয়ার জন্ম। লন্ডনের কেনসিংটন প্যালেসে। কেন্টের ডিউকের একমাত্র সন্তান তিনি। রাজা তৃতীয় জর্জের নাতনি। জন্মের একমাস পরে তাঁর নাম রাখা হয় আলেকজান্দ্রিনা ভিক্টোরিয়া। যখন তাঁর আট মাস বয়স, বাবা মারা যান। মা-রই স্নেহছায়ায় বড় হয়ে ওঠেন। মা শিক্ষিতা, সুগৃহিণী।

ভিক্টোরিয়ার জীবনযাত্রা একেবারেই সাধারণ। বিলাসিতার কোনো ছাপ নেই। কেনসিংটন প্যালেসেই তাঁর সময় কেটে যায়। বাগানে অজস্র ফুলের মধ্যে পায়চারি করতে করতে কিংবা নাম-না-জানা পাখির ডাক শুনতে শুনতে তিনি বিভোর হয়ে যান। সুন্দর ফুটফুটে দেখতে তাঁকে। চোখের তারা নীল। শান্ত কমনীয় স্বভাব।

তাঁর পড়াশুনো মায়ের কঠিন তত্ত্বাবধানে। অভিজ্ঞ শিক্ষকেরা এসে বিভিন্ন বিষয় পড়ান। ফরাসি, জার্মান, লাতিন, ইতালিয়ান সব ভাষাই তাঁর অধিগত। গান আর আঁকাতেও তিনি সমান পারদর্শী। কিন্তু তাঁর মানসিক গঠন বিচিত্র রকম। একবার ছুটি কাটাতে গেছেন রানী অ্যাডিলেডের কাছে। রানী তাকে



জিজ্ঞেস করেন, 'ভিক্টোরিয়া, তুমি কোন কাজ করতে পেলে সবচেয়ে সুখী হও বলো তো?

একটুও না ভেবে ভিক্টোরিয়া বলেন, 'জানলা পরিষ্কার করতে পেলে'।

দিন যায়। ভিক্টোরিয়া কৈশোর ছাড়িয়ে যৌবনে পা রাখেন। মনে রঙিন স্বপ্ন। চারপাশের যা কিছু সবই মন ভরিয়ে দেয়। এমন সময় হঠাৎ তাঁর জীবনের ধারাই পালটে গেল। রাজা চতুর্থ উইলিয়াম হঠাৎ মারা গেলেন। তাঁর কোনো সন্তান নেই। ফলে সিংহাসনের দাবিদার আর কেউ নয় – ভিক্টোরিয়া।

ক্যান্টারবেরির আর্চবিশপ এবং লর্ড চেম্বারলেন দ্রুত ছুটলেন উইন্ডসর ক্যাসেল থেকে কেনসিংটন প্যালেসে। তখন রেলপথ ছিল না। কিন্তু উপায় কি? ভিক্টোরিয়াকে রানী হিসেবে জনসমক্ষে পরিচয় করিয়ে দেওয়া তো দরকার! ঘোড়ার গাড়িতেই ছুটলেন।

ভিক্টোরিয়া প্রথমে ভাবতেই পারেননি তিনি রানী হয়েছেন। পৃথিবীর সব থেকে বড় সাম্রাজ্যের অধিশ্বরী! সকাল এগারটায় কেনসিংটন প্যালেসে প্রিভি কাউন্সিলের সামনে উপস্থিত হলেন তিনি। রাজকীয় পোশাক ঝলমল করছে। সবাই স্তম্ভিত তাঁর নিখুঁত চালচলন আর ব্যবহারে।

মাত্র উনিশ বছর বয়সে রানী হিসেবে অভিষেক হল ভিক্টোরিয়ার। বাবা মারা যাবার পর থেকে তাঁর অভিভাবক মামা লিওপোল্ড। তিনি রায় দিলেন, তরুণী রানীর এবার বিয়ে করা দরকার। তাঁর বহুদিনের স্বপ্ন সাক্সকোবার্গের প্রিন্স আলবার্টের সংগে ভিক্টোরিয়ার বিয়ে হোক। ভিক্টোরিয়াও মনে মনে তাকেই পছন্দ করেন। একবার চিঠিতে লিওপোল্ডকে লিখেছিলেন:

আলবার্টকে আমার খুব ভাল লাগে। ওর কথা বলা, তাকানো সব কিছুর মধ্যে যেন এক জাদু আছে। আদর্শ পুরুষ বলতে আমি যা ভাবি, ও ঠিক তাই। ওর মন খুব দৃঢ়, অথচ ভাবাবেগের অভাব নেই। ও এত সুন্দর সুন্দর কথা বলতে পারে! একদিন বলেছিল, আমার চোখের মণিদুটো নাকি নীল সাগরে ভেসে পড়া নৌকোর মতো...'

ভিক্টোরিয়া রানী হবার পর প্রিন্স আলবার্ট রানীর সংগে দেখা করতে এলেন কিন্তু কি আশ্চর্য, ভিক্টোরিয়া এখন যেন অন্য মানুষ। এমন ভাব দেখালেন, যেন তাঁর আগের সেই অনুরাগ একটুও আর নেই। আলবার্ট বললেন, 'ভিক্টোরিয়া, তুমি রানী হয়েছ এ খবরে আমি যে কত খুশি হয়েছি, তা বলে বোঝাতে পারব না।'

'ধন্যবাদ'। বলে চুপ করে গেলেন রানী।

আলবার্ট বুদ্ধিমান। একটু পরেই উঠে গেলেন।

এদিকে রানীর পাণিপ্রার্থীর অভাব নেই। একের পর একজন আসেন। রানী তাঁদের সংগে হেসে কথা বলেন। আপ্যায়নও করেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই বুঝিয়ে দেন তাঁর মনোভাব।

একদিন একজন এলেন সবুজ পালকের টুপি মাথায়। গায়ে ঝলমলে পোশাক। সেদিন রানী বেশি সময় নিয়েই তাঁর সংগে কথা বললেন। যখন তিনি বিদায় নিলেন ভিক্টোরিয়া উঠে এসে জানলার সামনে দাঁড়ালেন। ঘোড়ায় উঠছেন সেই প্রিন্স। রানীর সঙ্গিনীরা ভাবলেন, এঁকেই তাহলে রানীর পছন্দ। ভিক্টোরিয়া জানলার সামনে থেকে ঘুরে দাঁড়ালেন। ঠোঁটে গোলাপি হাসি ছড়িয়ে বললেন, 'একে দেখতে ঠিক মুলোর মতো, তাই না?' সঙ্গিনীরা বুঝল এবার আরেকজন প্রেমিকের আসার সময় হয়েছে। অবশ্য তারও স্থায়িত্ব বেশিক্ষণের নয়।

এই সময়ে প্রিন্স আলবার্ট তাঁর এক বন্ধুকে চিঠিতে লেখেন: 'ভিক্টোরিয়ার সংগে আমার যে বোঝাপড়া ছিল, তা ভেঙে গেছে – রানীরই ইচ্ছেয়।' কিন্তু এরপরেও একবার আলবার্ট রানীর সংগে দেখা করতে গেলেন। ইচ্ছে, রানীকে সরাসরি প্রশ্ন করার। আগে যেমন কেনসিংটন প্যালেসে থাকার সুযোগ পেতেন, এবার তা হল না। তাঁর জায়গা হল উইন্ডসর ক্যাসেলে। তবু দমলেন না প্রিন্স।

এরপরই অভাবিত ঘটনা ঘটল। যেমনভাবে ভিক্টোরিয়া তাঁর অন্য পাণিপ্রার্থীদের দূরে সরিয়ে দিয়েছেন, তেমনভাবে সরালেন না আলবার্টকে। নিজেকে সমর্পণ করলেন, তাঁর কাছে। প্রিন্স ভাবলেন, মানুষের হৃদয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতি বোঝা সত্যি খুব শক্ত।

রানী যখন তাঁকে ডেকে পাঠান, আলবার্ট ভেবেছিলেন, এবারে হয়তো একটু অন্যরকম ব্যবহার পাওয়া যাবে। তাই হল। রানী মাথা নিচু করে লজ্জারুণ ভঙ্গিমায় বললেন: 'আলবার্ট, আমাকে ক্ষমা করো। আমি অনুতপ্ত। আমি তোমাকে সত্যিই ভালবাসি।'

'তাহলে কেন আমার সংগে অমন ব্যবহার করলে সেবার?'

'আমি ভুল করেছি। বিশ্বাস করো, রানী হওয়ার পর থেকে শুধু এ কথাই ভেবেছি, এখন আমার যোগ্য কেউ নেই। তখন বুঝিনি, এখন বুঝেছি, মানুষের জীবনে প্রেমের স্থানই সবচেয়ে উঁচুতে।'

প্রিন্স আলবার্ট রানীর দুটি কোমল হাত নিজের হাতে টেনে নিয়ে বললেন, 'আমার অনেক দিনের স্বপ্ন আজ সত্যি হল। তোমার ভালবাসা আমার জীবনে বিরাট সম্পদ। তাই ক্ষমা করার কথা আমাকে বোলো না। এতে তোমার থেকে আমিই দুঃখ পাব বেশি।'

রানী লিওপোল্ডকে চিঠিতে লিখলেন, 'স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে... আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি... আলবার্টকে কাছে পেয়ে... আমি খুব সুখী...

কদিন পর। প্রিভি কাউন্সিলকে সাক্ষী রেখে রানী ধীরে ধীরে পড়লেন তাঁর বিবৃতি: 'আমি রানী ভিক্টোরিয়া, আজ ২৩ নভেম্বর ১৮৩৯, স্যাক্সকোবার্গের প্রিন্স আলবার্টের সংগে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হবার ইচ্ছা প্রকাশ করছি।'

তাঁর নিজস্ব জার্নালে রানী লিখে গেছেন, 'সেদিন সেই মুহূর্তে আমার হাত দুটো খুব কাঁপছিল। আনন্দে। যখন পড়া শেষ হল তখন মনের মধ্যে যেন খুশির ঝরনা বয়ে চলেছে।' প্রধানমন্ত্রী লর্ড মেলবোর্নের কিছু দুর্বলতা ছিল রানীর প্রতি। তাঁর চোখ দুটো ছলছলে। অন্য কাউন্সিলরদের চোখে উৎসুক দৃষ্টি।

১৮৪০ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি। রয়াল চ্যাপেলে বিয়ে হল রাণী ভিক্টোরিয়া আর প্রিন্স আলবার্টের। দুজনেরই বয়স একুশ। লন্ডন থেকে উইন্ডসর ক্যাসেল, দীর্ঘ পথ, রাস্তার দু'পাশে অজস্র লোক দাঁড়িয়ে। রানীকে স্বাগত জানাচ্ছে। তাদের আজ আনন্দের শেষ নেই। তারা জানে, রানী ভিক্টোরিয়া প্রিন্স আলবার্টকে ভালবেসে বিয়ে করেছেন। উইন্ডসর ক্যাসেলে মধুচন্দ্রিমা হল দুজনের।

সেদিন রাতে প্রিন্স আলবার্টের বুকে মুখ রেখে রানী কত কথাই বলে গেলেন। যেন দীর্ঘ কবিতা

'জানো, ছেলেবেলা থেকে আমি এমন একজন মানুষের স্বপ্ন দেখে এসেছি, যে শুধু সুন্দরই নয়, শান্ত, স্থির, তুমি ঠিক সেইরকম। তোমাকে ঘিরে আমার অনেক স্বপ্ন। তুমি পূর্ণ করবে তো?'

'চেষ্টা করব। তুমি আজীবন পাশে থাকলে কোনো কাজই আমার অসাধ্য নয়।'

'জানো রানীর মুখোশ পরে থাকতে থাকতে আমার মাঝে মাঝে কেমন যেন হাঁপ ধরে যায়। তুমি আমার ওয়েসিস

একসময় সব কথা থেমে যায় দুজনের নিবিড় আলিঙ্গনে।

পারিবারিক জীবনে রানী সাদাসিধেভাবে থাকতে ভালবাসেন। কিন্তু প্রিন্স আলবার্ট কেতাদুরস্ত জীবনই পছন্দ করেন। রানী লন্ডনের ভক্ত। গ্রাম-জীবন তাঁর ভাল লাগে না। আলবার্ট শহরে থাকতেই পারেন না বেশিদিন। শুরু হয় মানসিক দ্বন্দ্ব। কিন্তু তা অচিরেই মিটে যায়। প্রেমের জন্য এটুকু মূল্য দিতে রানী পিছপা নন। সহজেই মেনে নেন আলবার্টের ইচ্ছে। মাঝে মাঝে ঘুরতে যান গ্রামাঞ্চলে।

দিন কাটে। বছর ঘুরে যায়। আট বছরের মধ্যে রানীর পাঁচটি সন্তান হয়। দুটি ছেলে। তিনটি মেয়ে। প্রিন্স আলবার্ট আর রানী

ভিক্টোরিয়া নতুন এক খেলায় মেতে ওঠেন। ছবি আঁকার খেলা। তাঁদের ছেলেমেয়ের বিভিন্ন বয়সের মুডের ছবি এঁকে যান দুজনে। দুজনের হৃদয়ের গভীর প্রেম যেন এক নতুন রূপ পায়।

এরও পরে আরও চারটি ছেলেমেয়ে হয় রানীর। বিভিন্ন ধরনের প্রদর্শনী আয়োজনে প্রিন্স আলবার্ট ও রানীর প্রবল উৎসাহ। ১৮৫১-য় হাইড পার্কে আয়োজন করলেন 'গ্রেট একজিবিশন'। বিরাট আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী। যেহেতু হাইড পার্ক সাধারণ লোকের বেড়াবার জায়গা, তাই এই প্রদর্শনী নিয়ে সমালোচনার ঝড় বয়ে গেল। পত্র-পত্রিকা নিন্দেয় মুখর। কিন্তু রানী তাতে একটুও বিচলিত নন। স্বামীর ওপর তাঁর অগাধ ভরসা। তিনি বলেন, 'এসব কিছুই নয়। কিছু স্বার্থপর মানুষের হীন মনোভাব। একে আমল দিয়ো না আলবার্ট, এগিয়ে চল। দেখবে দারুণ জমবে একজিবিশন।'

উদ্বোধনের দিন হাইড পার্কে লোকারণ্য। লন্ডনের মানুষ এরকম বিরাট প্রদর্শনী আগে কখনও দেখেনি। রানী নিজে উদ্বোধন করেছেন। রোজই ভিড় সেখানে।

গভীর রাতে আলবার্টকে কাছে টেনে নিয়ে রানী বলেন, 'দেখলে তো আমার কথা সত্যি হল কি না!'

'দেখলাম। তোমার ভবিষ্যদ্বাণী কখনও মিথ্যে হবার নয়।'

রানী আর প্রিন্সের জীবনে যেন সুখের শেষ নেই। রাজনীতির টানাপোড়েনে দুজনে কখনও কখনও বিভ্রান্ত ঠিকই, কিন্তু অন্তর্জগতে তাঁদের মত সুখী আর কেউ নেই। দুজনের প্রেম দুজনকে বেঁধে রেখেছে গভীর বাঁধনে। এমনি করেই কেটে গেল আরও দশ বছর।

তারপর হঠাৎই ফুরিয়ে এল সুখের দিন।

১৮৬১ সালের নভেম্বরে প্রিন্স আলবার্ট অসুস্থ হয়ে পড়লেন। চিকিৎসার কোনো ত্রুটি হল না। তবু সারল না অসুখ। শেষ পর্যন্ত টাইফয়েডে গিয়ে দাঁড়াল।

রানীর মনে হল, সমস্ত জগৎ শূন্য হয়ে যাচ্ছে। তাঁর কষ্টের কথা কাউকে বলতে পারেন না। শুধু নিজের হাতে সেবা করে যান স্বামীর। দিন-রাত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকেন পাশে। চোখে ঘুম নেই। শুধু তাকিয়ে থাকেন ঘুমন্ত স্বামীর মুখের দিকে।

অবশেষে এল সেই কঠিন মুহূর্ত। রানী নিদারুণ কষ্টে তা সহ্য করলেন। পরে নিজেই লিখেছেন :

...সেদিনের কথা কখনও ভুলব না। আমি ঘরে ঢুকলাম। আমার প্রিয়তমকে কত সুন্দর দেখাচ্ছে। শুয়ে আছেন পরম নিশ্চিন্তে। ভোরের আলো এসে পড়েছে মুখের ওপর। চোখ দুটো অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। যেন অদৃশ্য কোনো কিছুর দিকে তাকিয়ে আছেন। আমার দিকে তাঁর কোনো লক্ষ্যই নেই।'

আগের রাতে প্রিন্স আলবার্ট মারা গেছেন। রানী ভিক্টোরিয়ার মনে পড়ে, এই উইন্ডসর ক্যাসেলেই তাঁরা বিবাহসূত্রে বাঁধা পড়েছিলেন। তাঁদের মধুচন্দ্রিমা হয়েছিল এখানে। তাঁদের সুখী জীবনের বেশিরভাগ কেটেছে এখানেই। একুশ বছরের সুখী জীবন।

এরপর রানী বেঁচেছিলেন আরও চল্লিশ বছর। এই দীর্ঘ সময়ে তাঁর হৃদয়ে প্রিন্স আলবার্টই রয়ে গেছেন। অনেকদিন তিনি চুপচাপ বসে থাকতেন। কাউকেও বিশেষ সহ্য করতে পারতেন না। একমাত্র রাজকুমারী অ্যালিস ছাড়া।

প্রিন্স আলবার্ট মারা যাবার পর আরও একুশ বছর রাজত্ব করেছেন রানী ভিক্টোরিয়া। বেশিরভাগ সময় চিঠিপত্র-রিপোর্ট দেখেছেন, বিদেশী শাসকদের সঙ্গে চিঠিপত্রে যোগাযোগ রেখেছেন। নিজেই নিজের সেক্রেটারির কাজ করেছেন। লোকে তাঁকে ভুল বুঝেছে। তবু তিনি নিশ্চল। তাঁর যা কিছু শান্তি তা গৃহকোণেই।

১৮৪৮ সালে রানী, প্রিন্স আলবার্ট ও ছেলেমেয়ে



রানীর কাছে আলবার্ট আর তাঁর প্রেম শাশ্বত, স্বর্গীয়। তাই যতই দিন যায়, তিনি নিজেকে গুটিয়ে নেন। অনেকদিন পর প্রকাশ্যে উপস্থিত হন প্রিন্স আলবার্টের মূর্তি স্থাপনের সময়। সেদিন আবেগভরা কণ্ঠে রানী বলেন।

আলবার্টের মধ্যে শ্রদ্ধা করার মতো অনেক গুণ ছিল। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয় সে ছিল প্রেমিক। প্রকৃত অর্থেই প্রেমিক। তাঁর ভালবাসা পূজোর বেদীতে ফুল অর্পণ করার মতো। তাঁর জন্য আমার হৃদয় এখনও দুর্বল। আমাকে আপনারা ক্ষমা করুন ...'

এরই মাঝে রানীর মন বারেবারেই শূন্য হয়ে পড়ে। মনে হয় তিনি নিঃসংগ, একা। তখন আশপাশের মানুষের স্মৃতি তাঁর মনকে ভরিয়ে তোলে। তিনি জানেন এ ফাঁকি, তবু তা গ্রহণ না করে পারেন না। অনেকেই তাঁর কৃপাপ্রার্থী। তবু তাঁরই মধ্যে লর্ড বিকন্সফিল্ড একটু যেন বেশি কাছের। লর্ড নিয়মিত ফুলের তোড়া নিয়ে আসেন। রানী তা দু'হাত বাড়িয়ে নেন। মৃদু হাসি ছড়িয়ে পড়ে মুখে। লর্ড মুগ্ধ হয়ে যান। তবু রানী পুরোপুরি মন দিতে পারেন না তাঁকে। পুরনো দিনের অনেক স্মৃতি তাঁর মনকে নাড়া দিয়ে যায়। মনে পড়ে, গ্রামের রাস্তায় দুজনের ঘোড়ার গাড়ি চেপে বেড়ানো, সূর্যাস্তের দিকে তাকিয়ে মোহিত হয়ে যাওয়া।

১৯ বছর বয়সে ভিক্টোরিয়া রানী রূপে



মনে পড়ে, দুজনের অন্তহীন চিঠি লেখা। এখন সেই চিঠি আবার পড়ে দেখতে কষ্ট হয় রানীর। শুধু শান্তি পান আলবার্টের স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কিছু করতে। তাই যেদিন রয়াল আলবার্ট হলের উদ্বোধন করলেন, সেদিন অসীম আনন্দে মন ভরে গিয়েছিল তাঁর।

যেদিন তাঁর রাজত্বের ষাট বছর পূর্ণ হল, সেদিন সবার আগে এসে দাঁড়িয়েছেন আলবার্টের ছবির সামনে। হয়তো মনে মনে তাঁর আশীর্বাদ চেয়েছেন। মনে হয়েছে, তাঁর পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন আলবার্ট। বলছেন, 'তোমার এ জয় তো আমারই জয়।'

লন্ডনে এরকম জাঁকজমক অনুষ্ঠান আগে কখনও হয়নি। রানী এখানে উপস্থিত না থেকে পারলেন না। দেশের মানুষ শুধু তাঁকে দেখার জনাই উদগ্রীব. এ আহ্বান তিনি অস্বীকার করেন কেমন করে?

এরও পর আরও চোদ্দ বছর বেঁচেছিলেন রানী। বিরাশি বছর বয়েসে মারা যান অসবোর্নে। তাঁর ইচ্ছে ছিল, মৃত্যুর পর তাঁর দেহ যেন প্রিয়তম স্বামীর পাশেই সমাহিত করা হয়। সে-ইচ্ছেই রাখা হয়েছিল।

রানী হিসেবে ভিক্টোরিয়া অনেক পুরুষের সংস্পর্শেই এসেছিলেন। গ্ল্যাডস্টোন ডিজরেলি, লর্ড পালমারস্টন আরও অনেকে। কিন্তু এঁরা কেউই তাঁর প্রেমিক নন। শুধু লর্ড মেলবোর্ন ও লর্ড বিকন্সফিল্ডের সংগে তাঁর সম্পর্ক ছিল খুব কাছের। তবু তাঁরাও ছিলেন আসলে বন্ধুর আসনে, প্রেমিকের আসনে নন। রানী ভিক্টোরিয়া একান্তভাবেই ভালবেসেছিলেন তাঁর স্বামী প্রিন্স আলবার্টকে। তাঁকেই উজাড় করে দিয়েছিলেন মন-প্রাণ সব কিছু। তাঁর প্রেম প্রকৃত অর্থেই একনিষ্ঠ প্রেম।

শুভেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পরবর্তী বিষয় ঃ গোটে

বন্ধুদের ছোঁড়া বুলেটের স্বর

শমীতা দাশ দাশগুপ্ত

বন্ধুদের ছোঁড়া বুলেটের স্বর
চিনে নিয়েছি বেশ কিছুদিন
প্রেমিকের ফেলে যাওয়া দু-একটা শীৎকার
তাও কি আর মনে রাখিনি –
পার্কে শোওয়া জুজুবুড়ির হাঁপানির টান
খাতার পাতায় লিখে রেখেছি
চুপি চুপি, তারপর
রাতের পর রাত
খুঁজে চলেছি দুটো স্নিগ্ধ শব্দ
স্বাগত! স্বাগত! অথচ বিদায়ের বার্তাগুলো
শেখা হয়ে গেছে বহুদিন আগেই।

সন্ত্রাস

অলকেশ ভট্টাচার্য

যে ভূখণ্ডে আমার ছোট্ট বাড়িটি আঁকা
কাল তার মাটির খোলা ও শিল্পময় কড়িবরগাটি
খসেছে ধুলোয়।

পিছনে গোটা কয় জামরুল গাছের জংগলে
লুকিয়ে রেখেছে কিছু দুশমন পাখি, নিজেদের।
শীতের ভ্রমণে এসে সন্ত্রাসের গন্ধে তারা বিভোর হয়েছে।

মৃত্যুর পর মানুষের চোখ তারা ছিঁড়ে নিয়ে যায়।
এখানে পাহাড় নেই, গুহা নেই, নেই জংগলের রহস্য
বরফও পড়ে না। শীতার্ত কিছু গরিব চাষির ছোট ছোট
কুটির ঘেরা এই গ্রামে – সন্ত্রাস এসেছে নেমে –
এই সংবাদে তোলপাড় এই গ্রাম, এই গঞ্জ।

শীতের শেষে এ সন্ত্রাসও থেমে যাবে – লিখেছে কাগজ।

জেনেছে মানবশিশু, জেনেছে ভ্রমণ পিপাসু কিছু দুশমন পাখি।

অমরতার গান

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

আমারও শ্রাবণ চাই; বৃষ্টির কাঙাল
কে নয়? যে বলে, তাকে অবিশ্বাস করি।
নাহয় পেরিয়ে এলে মেঘের জাঙাল,
এমন কী ক্ষতি হবে? বালুকার ঘড়ি

যখন উপরিতল থেকে ঝ'রে যায় –
বালির সমূহ কৃতী সন্তানেরা ঝরে,
ওদের হাত-পা-মাথা বালিমৃত্তিকায়
কে আর গড়বে, যদি ব্রহ্মশূল নড়ে।

সময় – বালুকাঘড়ি, এতো পর্যটন
সবই মিথ্যে? অন্য কোনো যাত্রা নেই আর?
শিকড়ে ডানার শব্দ, দেওদারবন
কোথায় উড়বে, হায়, কী নীল প্রাকার।
সতত আষাঢ় তাই নিজের মতোন
মেঘ হ'য়ে ঘিরে থাকে ঘন জম্বুবন।

সেতুহীন

বিশ্বজিত রায়

ডুবেছে উঠোন, দেওয়াল আর দিকচক্রবাল
শেষ সেতু হঠছে পেছনে
তবুও কীভাবে তোমার কাছেই
ফিরে যাই বল?

প্রণিপাতে অথবা সন্তাপে
নতজানু হলে
তুমি আশ্রয় দিতে পারো
এ জেনে
আর্তনাদে আরও যত্ন নিতে পারি
কিন্তু কেন নেবো?
তুমি ঈশ্বর হলে আমি যে বন্ধু হারাবো!

তার চেয়ে ভাল এই ডুবে যাওয়া।

অদ্ভুত পুরুষ ও রমণী

শিক্ষা কাকে বলে ?

অনেক বছর আগের কথা। কোনো একটি সরকারি অফিসে বসে একটি মেয়ের সংগে গল্প করছি। তখন আমি কনট্রাক্ট সারভিসে কাজ করি। আমার অধস্তন অথচ এক গেজেটেড্ অফিসার এসে আমায় খানিকক্ষণ লক্ষ্য করল। তারপর সাহস সঞ্চয় করতেই বোধহয়, বাইরে চলে গেল। তারপর আবার ফিরে এসে বলল, – আপনি কিন্তু একজন গেজেটেড অফিসারের চেয়ারে বসে আছেন।

বলাই বাহুল্য চেয়ারটি উক্ত গেজেটেড অফিসারের। লোকটি ঘুরে আশা করেছিল তার কথায় আমি খুব ক্ষুব্ধ হব। সে আমাকে রাগাতে এবং অপমানিত করতে চেয়েছিল। একজন লেখক বা আঁকিয়ে বা অভিনেতা বা যে কোনো শিল্পের প্রতি আসক্ত মানুষকে অফিস অঞ্চলে এ ধরনের হেনস্তা করার সুযোগ পেলে এই ধরনের লোকেরা কিছুতেই ছাড়তে চায় না সে সুযোগ। কিন্তু আমার নিছক হাসি পাচ্ছিল, তাই একটুও রাগ না করে বললাম, আপনি আমাকে এমন কোনো অফিস অর্ডা. দেখাতে পারেন যাতে এমন কথা লেখা আছে যে আমি গেজেটেড অফিসারের চেয়ারে বসতে পারব না? আচ্ছা ঠিক আছে আমি আপনার 'বস' বা সুপ্রিম বসের কাছ থেকে ব্যাপারটা জেনে নিচ্ছি। আমার হাসি লোকটিকে আরো ক্রুদ্ধ করে তুলল। কিন্তু তার সামনেই আমি বসকে ফোন করলাম এবং তিনি বললেন, ওকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন ও পাগল হয়ে গেছে। এ লোকটি কিন্তু এম, এ পাশ করেছে এবং শিক্ষিত বলে গর্বও করে। এমনি বহু শিক্ষিত কালচারড্ লোক আমাদের আশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে যারা অনেক ডিগ্রি কুড়িয়েছে, অনেক সম্মান অনেক পুরস্কার। ট্রামে বাসে ট্রেনে প্রতিদিনের জীবনের ছকে মানুষকে ফেলে দেখলে তবেই মানুষের প্রকৃত শিক্ষা যে কতখানি এবং প্রকৃত শিক্ষার স্বরূপ কি তা বোঝা যায়।

ঠিক এমনিভাবে প্রকৃত শিক্ষা কতটা তার দেখা পেয়েছিলাম জনৈক ভুঁইফোঁড় লেখকের আত্মম্ভরিতায়। তিনি কোনো এক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে গিয়েছিলেন তাঁর নিজেরই কাজে। নির্দিষ্ট দিনে যেতে পারেননি। নির্দিষ্ট সময়েও না। তাঁর নিজস্ব সময়ে যাওয়ার ফলে তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল, বলাই বাহুল্য। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিলেন, জানেন আপনি কাকে এভাবে অপেক্ষা করাচ্ছেন আমি অমুক পয়লা নম্বর ইংরিজি কাগজে কাজ করি! যে প্রতিষ্ঠানে গিয়ে তিনি এসব কথা বলেছিলেন সেখানে সকাল বিকেল কলকাতার ও ভারতের জ্ঞানী গুণী মানুষরা যান। এবং যিনি যত বড় তিনি তত সবিনয় আচরণ করেন। এবং সবচেয়ে মজার কথা, এ লোকটি মানে লেখকটি যদি একথাও বলতেন যে আমি একজন লেখক, তাহলেও তাঁকে সহ্য করা যেত। কিন্তু তিনি বলে বসলেন, আমি অমুক কাগজে কাজ করি। ইংরেজি কাগজ। অর্থাৎ তাঁর পদাধিকার বা মোটা মাইনের উল্লেখ করলেন। এই সব ক্ষেত্রে শিক্ষা মাত্র চামড়াস্পর্শ করেছে। চামড়ার ওপরটাই ঝকঝকে হয়েছে। ভিতরটা নিকষ কালো।

এরই উল্টোপিঠে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁরা যাঁদের চালকলা বাঁধা বিদ্যা নেই। যাঁরা কোনো ডিগ্রির ক্রাচের জোরে দাঁড়িয়ে নেই। নিজের পায়ের জোরে দাঁড়িয়ে আছেন।

জানিনা সেই গরিব চর্মকারকে আমি কি ভাবে প্রণাম জানাব যিনি মাত্র একটি কথায় আমার এক বান্ধবীকে চরম সর্বনাশ থেকে বাঁচিয়েছিলেন।

আমার বান্ধবী তখন একটি টেম্পোরারি চাকরি করত। রোজই সে ডালহৌসির বাসস্টপে দাঁড়াত ঘরে ফেরার জন্য। আর তার উর্ধ্বতন অফিসার তার পাশে দাঁড়িয়ে তাকে নানান প্ররোচনা আর প্রস্তাব দিত। দরিদ্র বৃদ্ধ চর্মকারটি রোজ বসে বসে এই ঘটনা দেখত। বান্ধবীর এক জোড়া ছেঁড়া চটি ছিল। রোজই প্রায় বৃদ্ধ তার চটিটি সারাই করে দিত। যতক্ষণ সারাই করত বান্ধবীকে রামায়ণ মহাভারতের নানান ছোট ছোট কাহিনী তার নিজস্ব ভাষায় বলত।

একদিন সেই অফিসার আমার বান্ধবীকে তার সংগে রেস্তোঁরায় যাবার জন্য খুব পীড়াপীড়ি করতে লাগল। এমনও ভয় দেখাল যে বান্ধবীর চাকরি পরের মাসে নাও রিনিউ হতে পারে। আত্মগ্লানিতে আমার বান্ধবী ঠিক করল, আজ সে লোকটির সংগেই রেস্তোঁরায় যাবে। দারিদ্র্য আর সয় না। সে ভদ্রলোক (?)কে বলল, ঠিক আছে। আপনি একটু অপেক্ষা করুন। আমি চটিটা সারিয়ে আপনার সংগে যাচ্ছি। লোকটি সানন্দে কাছাকাছি কোনো দোকানে বিড়ি ধরাতে গেল।

সেই প্রথম সেই গরিব চর্মকার তার কাঁচাপাকা চুলে ভরা সদানিচু মাথাটি তুলল। তুলে বলল, বেটি, ইয়ে চপ্পলকো ঠিক সে ইস্তেমাল করো, আজহি উও দিন হায়!

আমার বান্ধবীর ভিতরে এই একটি কথায় এমন একটা শক্তি এল যে লোকটি ফিরে এসে যেই দাঁত বের করে হাসল, সে আর কোনো কথা না বলে, লোকটিকে পা থেকে চপ্পল খুলে এলোপাথাড়ি পিটিয়ে দিল। সেখানে তার অফিসেরও কিছু লোকজন ছিল।

পরদিন থেকে আমার বান্ধবীর আর অফিসে কোনো অসুবিধা হয়নি। একবার কোনো পত্রিকার তরফ থেকে এক খরাপীড়িত অঞ্চলে গিয়েছিলাম। সেখানে এক দীর্ঘ রেখায় মানুষ চলেছিল কয়েক মাইল দূরে জলের খোঁজে। তার মধ্যে জলপাত্র হাতে চলেছে বৃদ্ধ বৃদ্ধা যুবক যুবতী গর্ভিণী নারী এমন কি কচি শিশুও।

ছোট্ট একটি বালিকাকে দেখে আমার বড় দুঃখ হল। মুখ দিয়ে স্বতই বেরিয়ে এল, আহা, ও পারবে কি?

হঠাৎ ভাঙা গলায় কে যেন বলে উঠল পারবে! পারবে!

তাকিয়ে দেখি পাশের এক বটগাছ তলায় জটিল শিকড় জটাজালের মধ্যে বসে আছে ছিন্নবসনা এক বৃদ্ধা। বোধহয় শ্রান্ত হয়ে একটু বিশ্রাম নিচ্ছে। বলল, – মাগো, ওর তেষ্টাই ওকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে মা!

জল আগে এগোয়? না পিপেসা আগে এগোয়?

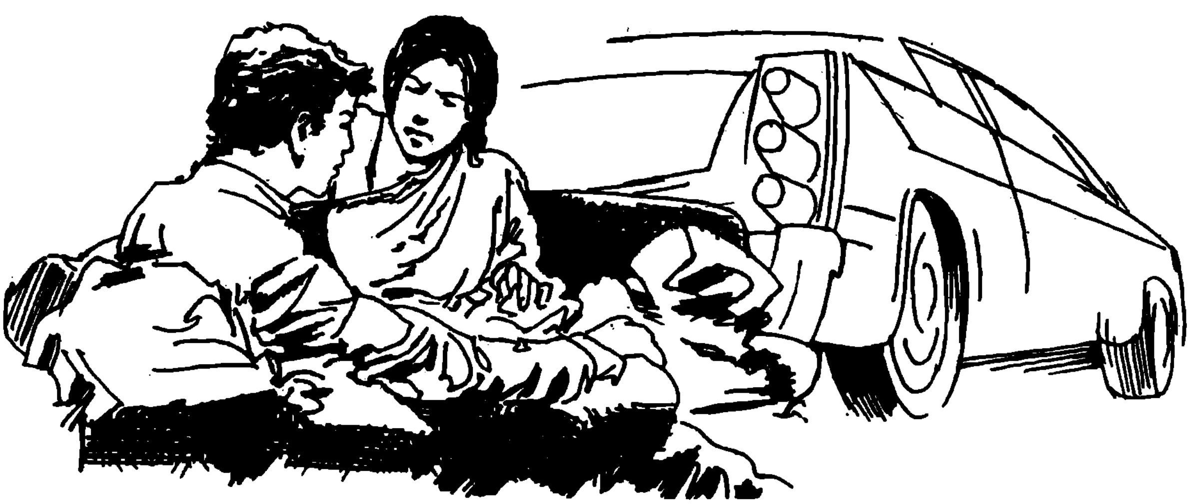
আমি হতবাক হয়ে ভাবলাম আমরা কিসের গর্ব করি? কোন শিক্ষার? কোন সাহিত্যের? এত ভাল কবিতার লাইন আমি তো আমার সারা জীবনেও একটা লিখতে পারিনি। □



কবিতা সিংহ

ছবি : দেবাশিস

জন্মান্তর



নভেম্বর ১৯৮০-র হিমেল হাওয়ায় স্পন্দিত ভাবনগর এয়ারপোর্টে একটি কর্মচঞ্চল দিন। আমার ভাগিনেয় ট্রাফিক অফিসার অমিতাভ ব্রহ্মচারী ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে, সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা তার শেষ মুহূর্তের তদারকিতে। কারণ রাজকোট রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী ভোমায়ানন্দের কাছ থেকে নির্দেশ এসেছে মিশনের প্রেসিডেণ্ট বীরেশ্বরানন্দ মহারাজ (সদ্য প্রয়াত) যে এরোপ্লেনে রাজকোট যাচ্ছেন, সেটি একটু পরেই কিছুক্ষণের জন্য থামবে, তাই ভক্ত গুরুভাইরা যাতে স্বামীজীর দর্শন পান তার সুব্যবস্থা যেন অমিতাভ করে রাখে।

যথা সময়ে প্লেন ভূমি স্পর্শ করল। প্রণাম, কুশল সংবাদ আদান প্রদানের পর বায়ুযান আবার আকাশচারী হয়ে ক্রমশ একটি বিন্দুতে পরিণত হল। নিঃসীম নীলের মধ্যে মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত শ্রীমতী রশিদা ফিদুভাই সেই সুদূর পানে তাকিয়ে রইলেন অপলক দৃষ্টিতে; তারপর ধীর পায়ে আনমনা এগিয়ে চললেন নিষ্ক্রমণের পথে।

পরিচয় প্রগাঢ় না হলেও প্রতিবারই বাক্যবিনিময় হয়। চলতি পথে অমিতাভ প্রশ্ন রাখে, 'এবার আপনারা স্বামী-স্ত্রী দুজনে রাজকোট না গিয়ে মিঃ ফিদুভাই যে একলা গেলেন?' উত্তরে রশিদা বল্লেন, 'শরীর ভাল নেই তাই এবার সফর সংগী হতে পারলাম না। চলুন না, চা খেতে খেতে একটু গল্প করা যাক।'

নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনার পর রশিদা বললেন, 'মিঃ ব্রহ্মচারী, আমরা গুরুভাই, একই মিশনে দীক্ষিত। কেন জানি না, আজ আপনাকে এক আশ্চর্য, অবিশ্বাস্য কিন্তু নিছক সত্য ঘটনা জানাতে ইচ্ছা করছে। আপনার কি ধৈর্য ও যথেষ্ট সময় আছে এই কাহিনী শোনবার?' সাদর সম্মতি পেয়ে রশিদা শুরু করেন :

'বনেদী ধনী মুসলিম পরিবারে আমার জন্ম। অল্প বয়স থেকেই আমার মনপ্রাণ গুরুমহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণে সমর্পিতা, পরিণত বয়সে মঠে দীক্ষিতা। বিবাহ হয় নামী ব্যবসায়ী পরিবারে মিঃ ফিদুভাই এর সংগে। কালে জানতে পারলাম তিনি একজন ভোগী পুরুষ রেসের মাঠ ও মদ্য পানে আসক্ত। ফলে, অনিবার্য ভাবেই এসে পড়লো সংঘর্ষ। স্বামী বলেন একজন আদর্শ মুসলমানের পক্ষে হিন্দুকে গুরুরূপে বরণ ও ভজন অমার্জনীয় অপরাধ এ থেকে আমাকে সরে আসতেই হবে। এই ফতোয়া জারি মনে হল আমার কাছে মৃত্যুর শামিল। আমি একান্তভাবে বিশ্বাস করি যে মহাপুরুষ আমার মনে পরম সত্যের স্নিগ্ধ প্রদীপটি জ্বালিয়ে আমাকে মরলোক থেকে অমৃতলোকে উত্তরণের সন্ধান জানিয়ে ধন্য করেছেন তিনি মুসলমান, খ্রিস্টান না হিন্দু, সেটা আমার কাছে অতি নগণ্য – ধর্মের ধ্বজা নয়, প্রকৃত মানুষই আমার পরম আপনজন। দৃঢ় কণ্ঠে তাই স্বামীকে জানালাম, তুমি থাক তোমার মতে আর আমি আমার পথে – কেউ কারও ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করব না। সাময়িক শান্তি এল বটে কিন্তু কিছুকাল পরেই শুরু হল জোরজুলুমের পুনরাবৃত্তি। সহ্যের সীমা যখন এল শেষপ্রান্তে, চরম সিদ্ধান্ত জানাতে বাধ্য হলাম যে ডাইভোর্স ছাড়া বোধহয় আর কোন নিষ্পত্তি নেই। ফলে, বিবাদের হল আপাত নিবৃত্তি।

কিছুদিন পরে ঠিক করলাম আগামীকাল ভোরে ঘণ্টা পাঁচেক ড্রাইভ করে যাব রাজকোটে রামকৃষ্ণ মিশনে আর সারাদিন সেখানে কাটিয়ে ফিরব সন্ধ্যাবেলা। এ কথা জানা মাত্রই স্বামী জেদ ধরলেন আমার সংগী হবার। ব্যাপারটা অপ্রত্যাশিত কারণ আগে আমার সংগে রাজকোটে উনি খুব কমই গেছেন। অকারণ বাগবিতণ্ডা এড়াবার জন্য এককথায় রাজি হতে বাধ্য হলাম। রাজকোট থেকে ভাবনগরে ফেরবার পথে আমাকে সরিয়ে দিয়ে চালকের আসনে বসলেন ফিদুভাই। গাড়ি ছুটলো তীরবেগে। ঘণ্টাখানেক যাবার পর মোটরকার গেল আকস্মিকভাবে থেমে। আনমনা জিজ্ঞাসা করলাম কী হল? গাড়ি থামালে কেন কোনো উত্তর নেই। ওনার ...ক তাকিয়ে দেখি চোখে কিরকম বিহ্বল দৃষ্টি নিয়ে উইণ্ড স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে আছেন। দু এক মিনিট পরে গাড়ি আবার চলতে শুরু করল বটে কিন্তু অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম বার চারেক একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। বারবার কারণ জানতে চাইলাম, প্রতিবারই রইলেন নীরব। ফিরে আসার পর থেকেই নজরে এল ওনার স্বভাবের কিছু পরিবর্তন। চোখের দৃষ্টি কেমন দূরমনস্ক, আমার ব্যাপারেও যথেষ্ট নির্লিপ্ততা – আগের মেজাজের উত্তাপ যেন রূপান্তরিত হয়েছে চরম উদাসীনতায়।

কয়েক মাস পরে মিশনের ভাইস প্রেসিডেণ্ট স্বামী ভূতেশানন্দ আমাদের ভাবনগরের বাড়িতে এলেন কয়েকদিনের আতিথ্য গ্রহণ করে। উনি কিন্তু স্বামীজীর সংগে একবার দেখা করার প্রয়োজন আছে বলে বোধ করলেন না – কথা বলা তো দূরের কথা। কিন্তু স্বামীজী ফিরে যাবার পর থেকেই চোখে প্রকট হতে লাগল আমার স্বামীর অদ্ভুত পরিবর্তন। ধীরে ধীরে ছাড়লেন মাছ, মাংস, মদ, জুয়া – পরিবর্তে এল শ্রীরামকৃষ্ণে মতি। পরে দীক্ষা নিলেন বীরেশ্বরানন্দ

মহারাজের কাছে।' এরই মাঝে একদিন এক বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় অশ্রুসজল চোখে ভারাক্রান্ত কণ্ঠে ফিদুভাই ব্যক্ত করলেন তার জীবনের পরমপ্রাপ্তির অনির্বচনীয়, অবিশ্বাস্য ঘটনা – বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না, বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে যা কোনোদিন যাচাই করা সম্ভবপর নয় – বুঝি অধ্যাত্মজগতের অদৃশ্য আলোকে মনের নেগেটিভে মুদ্রিত হওয়াই শুধু সম্ভব তাঁর অপার করুণাধারার প্রতিচ্ছবি!

কী দেখেছিলেন সেদিন সন্ধ্যায় ফিদুভাই বারবার গাড়ি থামিয়ে? সেই করুণাঘন, সুমিষ্ট হাসিতে ভরা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের রক্তমাংসে গড়া বরাভয় মূর্তি তাকে আশ্বাস দিয়ে বলছেন, ওরে ভয় কিসের – আমি তো আছি! একবার এমনকি দুবার দেখলেও ফিদুভাই ভাবতেন নিশ্চয়ই চোখের ভুল – কিন্তু বারবার চারবার ভুল করে এই ক্ষমার দেবতাকে প্রত্যাখ্যান করার মূঢ়তা কি কারুর পক্ষেই সাজে? জীবনের এই পরম লগনকে ফিদুভাই অন্তরের সমস্ত আকুতি দিয়ে আঁকড়ে ধরলেন।

আকুল আগ্রহে অমিতাভের হাত দুটি ধরে রশিদা সাগ্রহে প্রশ্ন করেন, 'মিঃ ব্রহ্মচারী, আপনি বলুন তো কত নিষ্ঠাভরে গুরুমহারাজের পূজা করে এলাম সারাজীবন। কিন্তু একবারের জন্যও তো তাঁর দেখা পেলাম না। অথচ কত নিম্নস্তরের জীবন যাপন করে ফিদুভাই পেলেন ঠাকুরের দর্শন ও কৃপা – এ কেমন করে সম্ভব! আপনাদের গিরীশ ঘোষকে শ্রীরামকৃষ্ণ কি ঠিক এইরকমভাবেই কৃপা করেননি – আমার স্বামী কি তাহলে দ্বিতীয় গিরীশ?'

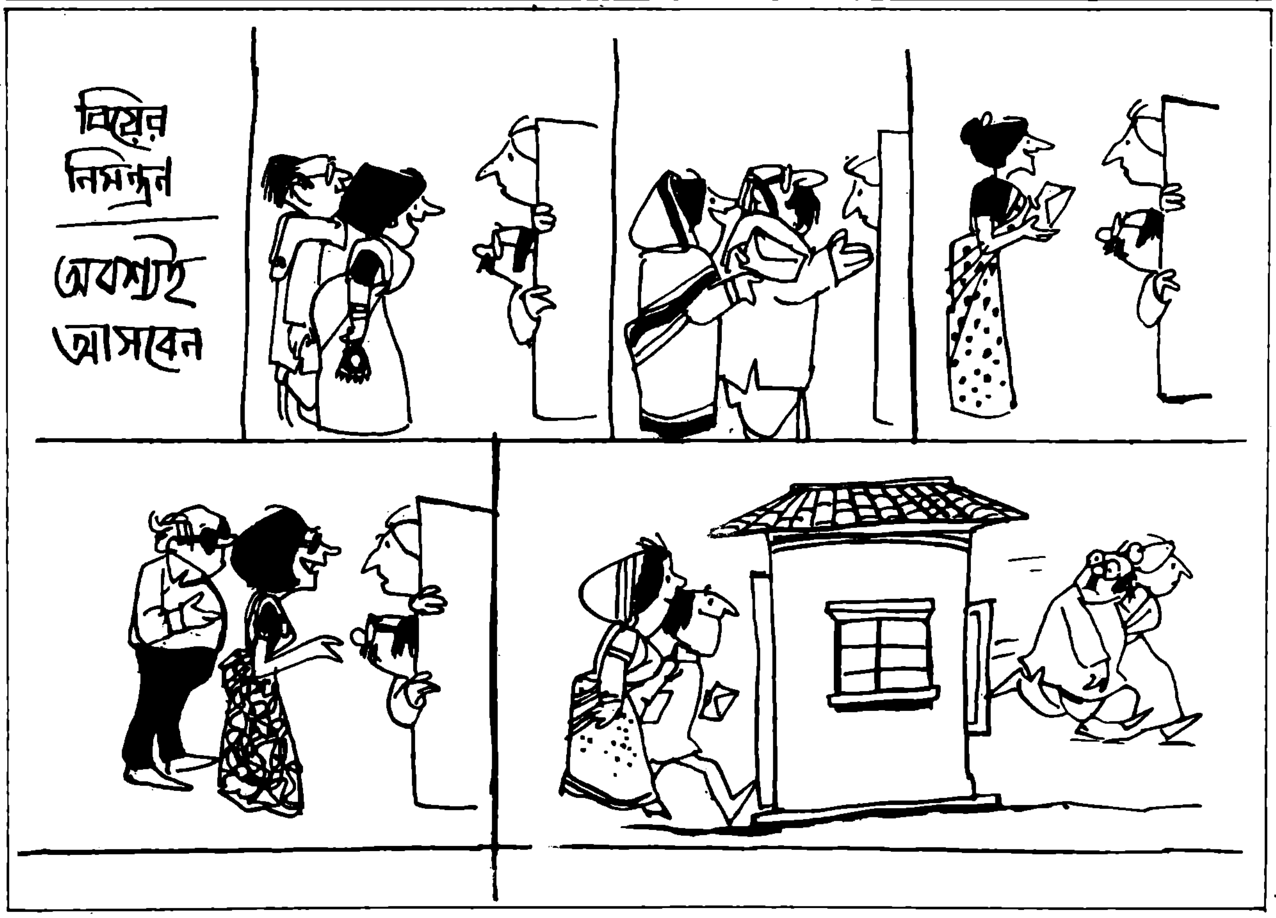
রশিদার কাহিনী এইখানেই শেষ। আবেগে আর হতাশায় তিনি বাকরুদ্ধা। পুঞ্জীভূত ব্যথা, না পাবার বেদনা অশ্রুতে রূপান্তরিত হয়ে ফোটায় ফোটায় ঝরে পড়ছে। গোধূলির ম্লান আলো পঞ্চাশোত্তীর্ণা রশিদার মুখমন্ডলকে করে তুলেছে মহিমান্বিত, সারা দেহে এসেছে এক অপার্থিব দিব্য লাবণ্য।

শ্রীমতী রশিদার অন্তরের হাহাকার হৃদয়ের গভীর গহনে গোপনে বাজবার বোঝবার নয়। বিশুদ্ধানন্দ মহারাজের কাছে দীক্ষিতা হয়ে শুদ্ধ মনে আজীবন নিজেকে উজাড় করে তিনি গুরু মহারাজের চরণবন্দনা করেছেন; অতীন্দ্রিয়লোকের আলোর পরশে হয়তো তাঁর অধ্যাত্মজগত চকিতে আলোকিত হয়েছে, কিন্তু 'ঈশ্বরকৃপায়' মন তো ভরে ওঠেনি এ বেদনা রশিদা দেবী কোথায় লুকোবেন? অন্যদিকে ভগবৎ ভক্তির লেশমাত্র যেখানে নেই, জীবনযাত্রা শুধু উচ্ছৃঙ্খলতায় ভরা সেই ফিদুভাই আকস্মিকভাবে পেলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দুর্লভ দর্শন ও অযাচিত কৃপা। পাপিষ্ঠ জগাই মাধাইকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কেন বুকে স্থান দিলেন, গিরীশ ঘোষের সমস্ত পাপপুণ্যের বকল্‌মা শ্রীরামকৃষ্ণ কেন নিজের কাঁধে তুলে নিলেন এই দুর্জ্ঞেয় রহস্যের কারণ আমাদের অজানা। হয়তো এরই নাম 'প্রারব্ধ'। কিন্তু শ্রীমতী রশিদার এই ঐকান্তিক সাধনার শেষ পরিণতি কোথায়? আমার স্থির বিশ্বাস তাঁর অন্তর সেই দিব্যভাবে উদ্দীপিত হয়ে ঈপ্সিতের পরম প্রাপ্তিতে ভরপুর হয়ে উঠবেই কোনো একদিন – এই জন্মে, না হলে অবশ্যই জন্মান্তরে!

এই কাহিনীর মধ্যে এতটুকু অত্যুক্তি নেই। সবটাই নির্ভেজাল সত্য। ভেবেছিলাম স্থান, কাল, পাত্র, পরিবেশ পরিবর্তন করে কাল্পনিক নামের আশ্রয় নেব। কিন্তু যে পরশমণির ছোঁয়ায় লোহা লহমার মধ্যে রূপান্তরিত হয় সোনায়, তারই মাহাত্ম্য স্মরণে রেখে যেমনটি শুনেছি, ঠিক তেমনটি অকপটে লিপিবদ্ধ করলাম।

যদি কোনোদিন এই লেখা; মিঃ ফিদুভাই ও শ্রীমতী রশিদার নজরে আসে, বিষয় বস্তুর গভীরতা উপলব্ধি করে শ্রীরামকৃষ্ণের অপার করুণার একটি কণা জনমানসে আনার জন্য আশাকরি আমাকে তাঁরা ক্ষমার চোখে দেখবেন □

সমীর চট্টোপাধ্যায়





রস ও রসনা

লীলা মজুমদার

শুকনো পাতার সুগন্ধ

আজ ১ জানুয়ারি ১৯৮৭। এই নিয়ে আমার মাথার ওপর দিয়ে ৭৮টি ১ জানুয়ারি পার হয়ে গেছে। চেষ্টা করলে তার ৭০/৭২টি একটু একটু মনে করতে পারি। সব মিলে সেগুলি মনের রাজ্যে এমন একটা সৌরভ ছড়িয়ে রেখেছে যে ভাবলেও চারদিক খুশি হয়ে ওঠে। বড়দিন আর নতুন বছর, এরা হল আনন্দের নিদান। রোমক পঞ্জিকার সংগে সংগে আমাদের হৃদয় এদেরও দত্তক নিয়েছে, এরাও আমাদের জাতীয় উৎসব হয়ে উঠেছে। উৎসব করার সুযোগ পেলেই আমরা মেতে উঠি, সাধ্য বা সামগ্রী যত কমই হক না কেন। যিশুর জন্য আমরা একটা মমতা বোধ করি। দয়া আর ক্ষমার মতো দুনিয়াতে কিবা আছে? এ ধর্মের এমন একটা সর্বজনীন আবেদন আছে যে এ সময়ে আমরা সকলে মায়ের কোলে খুদে যিশু, কিংবা ভেড়ার ছানা কোলে কিশোর যিশু, যাই বল না কেন, যেই দেখি অমনি তাঁর ভক্ত বনে যাই। বিনা অনুষ্ঠানে, বিনা আড়ম্বরে, বিনা খরচায়, মনে কেমন একটা আশ্বাস পাই।

বলা বাহুল্য এসব নিতান্ত আমার নিজের মনের কথা, কিন্তু চারদিকে আমাদের নগরবাসীদের ঘর ছেড়ে শীতের রাতে বেরিয়ে পড়ে আনন্দে মাততে দেখি, যদিও তাদের শতকরা দশ ভাগও খ্রিশ্চান নয়, তাতেই বোঝা যায় যিশু কেমন সবার মনে একটা কোমল উষ্ণ জায়গা করে নিয়েছেন। আমাদের গরিব দেশ, যিশু ছুতোরের ছেলে, তাঁর শিষ্যদের অনেকেই চাষী, কিংবা জেলে, কিংবা ওই রকম কিছু। তাঁকে ভালবাসব নয় তো কাকে বাসব? অবিশ্যি অনেকে হৈ হুল্লোড়ের গন্ধ পেলেই মেতে ওঠে। তা সে যেখানেই হক।

তাছাড়া এই সময়ে আমার ছোটবেলাকার আকুল আনন্দের স্মৃতিগুলোও তুমুল কোলাহল করে আমার কান ঝালাপালা করে দেয়, আমার সমস্ত সত্তাকে প্লাবিত করে। তার ভাগ তোমাদের দিতে ইচ্ছা করে, কারণ এখন আর সে জিনিস তোমরা খুঁজে পাবে না। শিলং পাহাড়ে আমার জীবনের প্রথম ১০/১২টা বছর কেটেছিল। সেখানকার লোরেটোতে খুব ছোটবেলা থেকে পড়তাম। বড়দিনের দিন পনের আগে, বার্ষিক পুরস্কার বিতরণের অনুষ্ঠান হত। তাতে বাইরের কাউকে ডাকা হত না, ছাত্রীদের বাড়ির লোকদেরও না। খালি গির্জার ফাদাররা, নানরা, শিক্ষিকারা সকলে আর ছাত্রীরা। তারপর আড়াই মাসের মতো স্কুল বন্ধ হয়ে যেত। এখনো মনে আছে, রিপোর্টে যাই লেখা থাকুক না কেন, যে যত নম্বরই পাক না কেন, ভালমন্দ নির্বিশেষে সকলকে পুরস্কার দেওয়া হত। হয়তো একটা রঙিন ছবির, বা গল্পের বই, কিংবা এক বাক্স রং আর তুলি, অথবা খুদে একটা সেলাই বাক্স। ভাল ছাত্রীদের পুরস্কারের হয়তো দাম বেশি থাকত, কিন্তু তখন আমরা অত হিসাবের ধার ধারতাম না। সে ছিল সস্তাগন্ডার বাজার, পুরস্কারগুলোর দামও আট/দশ আনা। এদিকে অন্তরালে কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামা বাজছিল। কিন্তু তার সংগে আমাদের কী? সে আওয়াজ তখন আমাদের কানে পৌঁছয়নি। সেই সুখের স্বর্গ থেকে তিলে তিলে কখন ভ্রষ্ট হয়েছিলাম, নিজেরাই টের পাইনি। আমরা জানতাম শীতকাল হল কেক প্যাটি খাবার সময়। মোরেলো সাহেবের দোকান থেকে দেড় টাকা পাউন্ড কেক, চার আনা করে চিকেন-প্যাটি কেনা হত। ফ্রাই আর ক্যাডবারির চকোলেট আসত। কত দাম, কোন দেশে তৈরি, তাই নিয়ে কোনো কথাই কানে আসেনি। এমন পরিপূর্ণ সুখের কথা এখন কেউ ভাবতেও পারে না। মুখ্যদের স্বর্গ যে কি ভাল জিনিস সে আর কি বলব। আমাদের যে একটাও রেশমি জামাকাপড় নেই, বাড়িতে এক জোড়া চটি আর বাইরে বেরুতে এক জোড়া মজবুত জুতো, শীত ঠেকাবার জন্য একটি মাত্র মোটা সোয়েটার, মোজা, ওবারকোট। এতেই আমরা খুশি ছিলাম। আমাদের বন্ধুবান্ধবদের একই অবস্থা। কেউ কাউকে হিংসা করতাম না, জাঁক করতাম না। অবস্থার তারতম্য থাকলে, তবে তো ওসব মনে পড়বে। দুজন আই সি এসের মেয়ে এসে কয়েক মাস পড়ে আবার চলেও যেত। তাদের কেমন অহংকার, তাই নিয়ে আমরা হাসাহাসি করতাম। কিন্তু তারা কখনো মন্দ ব্যবহার করত বলে মনে হয় না, তবে আমাদের মতো নেটিভদের সংগে খুব একটা অন্তরংগতাও করত না। বরং ফিরিংগিদের সংগে মিশত।

আমাদের জাতীয়তাবোধ কত ঠুনকো তা ভাবলে এখন আশ্চর্য লাগে। তখন মনে মনে রাগ হত। এদিকে আমাদের অজ্ঞাতে দেশপ্রেমিকরা প্রাণ দিচ্ছিলেন। তবে আমাদের গুরুজনরা যে ব্রিটিশ-ভক্ত ছিলেন না, সেটা বোঝা যেত। আমার মা অচলানন্দ স্বামীর নাতনি আমাদের নেটিভ বলে অপমান করে একথা শুনে বলেছিলেন, 'অপমান কোথায় দেখলি রে? ভারতবর্ষের নেটিভ হয়েছিস বলে গর্ব করতে হয়। ও বেচারিরা কোনো জায়গারই নেটিভ নয়।' আর বাবা বলতেন, 'ফিরিংগিদের কাছ থেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা শিখতে হয় আর ব্রিটিশদের কাছে দুটি জিনিস শিখতে হয় – কথা রাখা আর সময় রাখা।'

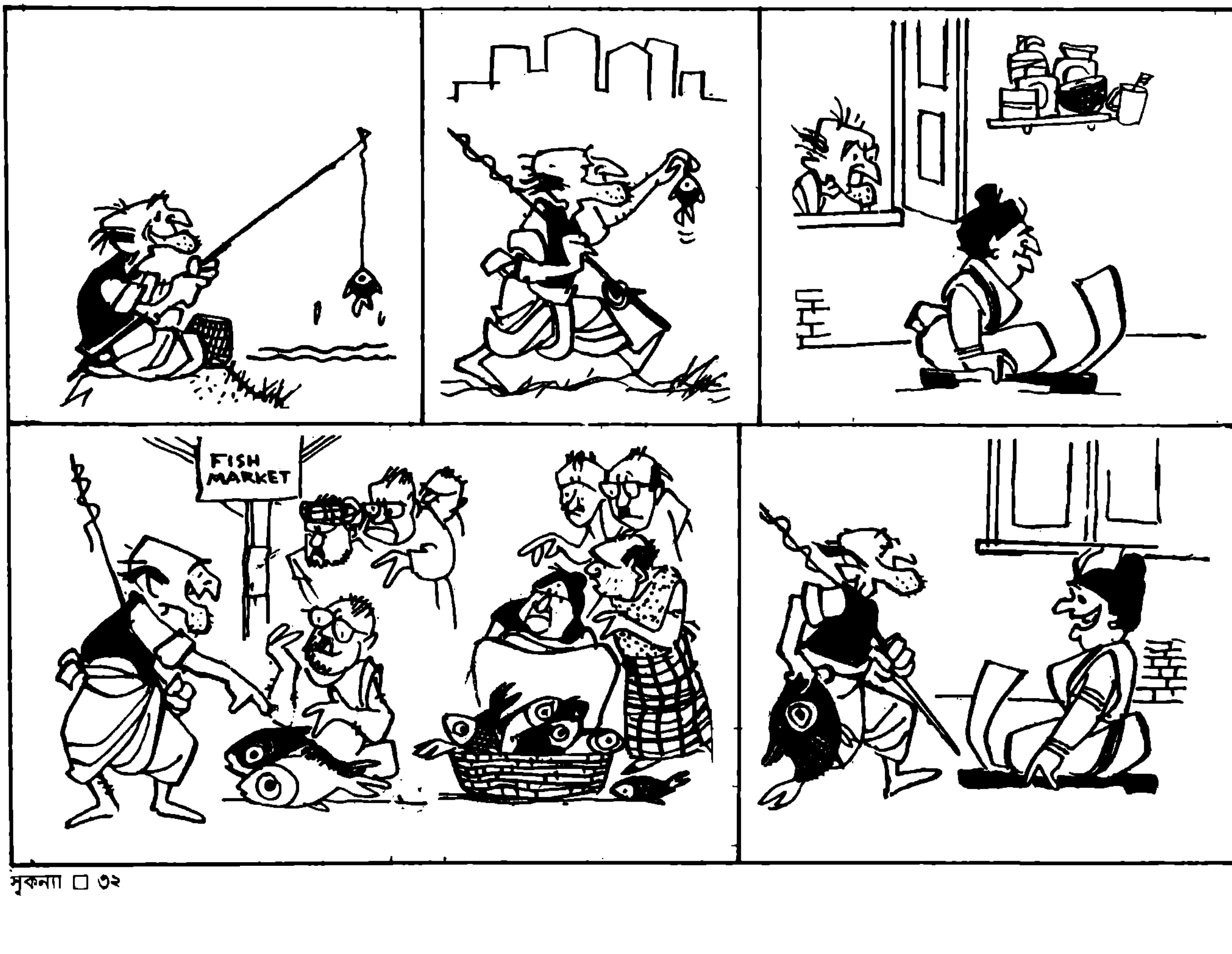
বলা বাহুল্য স্কুলে খুব সুখী ছিলাম না, কিন্তু একটা বড় লাভ হয়েছিল। তাকে বলে আত্মসম্মান। দেখতাম কাজেকর্মে পড়াশুনোয় আমরা ফিরিংগিদের চেয়ে অনেক উপরে। উচ্চাশা বলে কিছুই ছিল না ওদের। স্বাধীনতা লাভের সংগে সংগে ওদের সমাজ ঝুরঝুর করে ভেঙে পড়ল। একটু ফরসারা বিদেশে চলে গেল, কালোরা ক্রমে দেশী খ্রিস্টীয় সমাজে মিশে গেল। তবে এদের কাছে আমাদের ঋণ অপরিশোধেয়। ওরা আমাদের কানে দয়া, ক্ষমা, সেবা ধর্মের মন্ত্র দিয়ে গেছে। যখনি মিশনারিদের উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে অভিযুক্ত করা হয়, তখুনি আমার চোখের সামনে ভাসে

অক্সফোর্ড মিশনের সন্ন্যাসিনীরা ঘোর শীতকালে খালি গায়ে খাসিয়া পাড়ায় গিয়ে মর্মান্তিক রুগীদের দুহাতে সেবা করছেন। ডন বসকোর ফাদাররা গাঁয়ের নিরক্ষর ছেলেদের গরম জামা পাজামা কিনে দিয়ে, লিখতে পড়তে আর কাঠের কাজ, চামড়ার কাজ করতে শেখাচ্ছেন। তাদের আর কখনো পরমুখাপেক্ষী হবার দরকার হত না। কই, হিন্দুদের তো সে সময়ে এরকম কিছু করতে দেখিনি। একমাত্র চেরাপুঞ্জীর নীলমণিবাবুর বাড়িতে কুড়িজন অনাথ ছেলে থাকত, খেত, পড়ত এবং তাঁর খুদে স্কুলে লেখাপড়া শিখত।

আর অন্যরা কি করত? না, তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি করত। অনেক বছর পরে একজন আমাকে বলেছিলেন, হতে পারে খুব দয়ালু ছিলেন। তাঁর দৃষ্টান্ত দেখে অনেক গ্রামবাসী প্রকৃতিপূজো ছেড়ে দিয়ে, একমাত্র অদৃশ্য ভগবানের উপাসনা ধরেছিল। তবে মুশকিল হল যে ওদের ধারণা ছিল উনিই সেই একমাত্র অদৃশ্য ভগবান। ভাবি তাদের কাছে হয়তো তাই ছিলেন। তাতে কার কি ক্ষতি হয়েছিল। আমার ছোটবেলা থেকে ওই আরেকটি উষ্ণ কোমল মধুর স্মৃতি মনে জমা আছে।

আনন্দ-বেদনায় মেশানো আমার ছোটবেলাটি চিরকালের মতো মাটির পৃথিবী থেকে মুছে গেছে। অনেক বছর পরে দেখে এলাম গাছগুলো পর্যন্ত কেটে ফেলে বনভূমি হালকা করে দিয়েছে। নদীগুলো বাঁধ দিয়ে স্রোত কমিয়ে দিয়েছে। সব নিয়ে গেলেও স্মৃতিটুকু রেখে গেছে। আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ওই নীল আকাশ, ওই উত্তরমুখী পাখির সারি, ওই সরলগাছের শুকনো পাতার সুগন্ধ। যা কেউ কোনো দিন কেড়ে নিতে পারবে না।

আরেকটু হলে সেই মধুরেণ সমাপয়েৎ করতে ভুলেই যাচ্ছিলাম। আমার মায়ের তৈরি শীতকালের পুডিং করা শেখো। এক পেয়ালা আটার সঙ্গে তিন ভাগের এক ভাগ পেয়ালা ঘি (বা বাদাম তেল) আধ পেয়ালা চিনি কিংবা খেজুর গুড় হলে আরো ভাল, ২ পেয়ালা একসঙ্গে কুচনো নানা জাতীয় ফলের মোরব্বা, শুকনো কমলার খোসা, খোবানি কিশমিশ ইত্যাদি, দারুচিনির গুঁড়ো, এলাচের গুঁড়ো, এই সব একসঙ্গে মাখো। একটা অ্যালুমিনিয়মের বাটিতে তেলা কাগজের লাইনিং দিয়ে, উপকরণগুলো ভরে দাও। পাত্রের মুখ ঢেকে, একটা পরিষ্কার ন্যাকড়ায় বেঁধে, পাত্রটাকে একটা ছোট ডেকচিতে বা বড় বাটিতে বসাও। বাটিটাকে একটা বড় ডেকচিতে জলের মধ্যে বসাও, যাতে বাটির অর্ধেক ডুবে থাকে। ভাসলে চলবে না। উপরে ছোট নোড়া কি পাথরের টুকরো চাপাতে পার। এবার বড় ডেকচিটা ঢাকা দাও। ফুটতে থাকুক। জল কমে গেলে, কেতলি থেকে সাবধানে আরেকটু ঢেলে লেভেল ঠিক রেখ। ভাপে রান্না হবে। গ্যাস, জনতা স্টোভ, তোলা উনুন, একটা হলেই হল। আঁচ মাঝারি রেখ। ঘণ্টা আড়াই ফুটবে। কেকের মতো দেখতে হয়ে যাবে। পাতলা কাস্টার্ড দিয়ে খেতে দিও। ন্যাকড়া বাঁধা বাটি ব্যবহার না করে, আমি মুখ আঁটা অ্যালুমিনিয়মের কৌটোর পৌনে এক ভাগ ভরতি করে, ওই ভাবে জলে বসিয়ে ফুটোই। খুব ভাল হয়। ওই মাত্রা রেখে পরিমাণ বাড়াতে পার। □



রঙ্গচিত্র : অজিত

এই 'ডিসকাউন্ট কুপন স্কিম'-এ অংশ নিয়ে বিনামূল্যে নকশা-নির্দেশিকা সংগ্রহ করুন



ফ্লোরাল টেবল ক্লথ



ট্রেক্লথ ও টিকোজি

আজই আপনার 'কুপন' নিচের ঠিকানায় ডাকে পাঠান ঃ

সুকন্যা/মাদুরা কোটস লিমিটেড (ক্রশ স্টিচ পাবলিকেশন)
অ্যাংকর ডিজাইন স্টুডিও ২২/১ এম. জি. রোড
ব্যাংগালোর – ৫৬০০০১

নিচের তালিকা থেকে আপনার পছন্দসই নকশার ছটি পুস্তিকা বেছে নিয়ে '√' চিহ্নে চিহ্নিত করুন। নির্বাচিত ছটি পুস্তিকা মাত্র ২৫.০০ টাকায় আপনি এই কুপনের মাধ্যমে সংগ্রহ করতে পারবেন। আটটি পুস্তিকার দাম ৩৫.০০ টাকা।
১) ক্রশ স্টিচ কার্নিভাল, ২) ক্রশ স্টিচ বর্ডারস, ৩) টাচ অব ওরিয়েন্ট, ৪) ক্রশ স্টিচ মনোগ্রাম, ৫) নার্সারি অ্যাট্রাকশন, ৬) ফেস্টিভ ক্রশ স্টিচ, ৭) ফ্লোরাল ডিলাইটস, ৮) বর্ডারস অ্যান্ড মোটিফস ইন ক্রশ স্টিচ।

এই পুস্তিকা সংগ্রহের সংগে সংগে বিনামূল্যে নকশা-নির্দেশিকাও আপনি পাবেন।

বিনামূল্যের নকশা-নির্দেশিকাসহ নির্বাচিত পুস্তিকা আমাকে নিচের ঠিকানায় পাঠান :–

নাম :--

ঠিকানা :--

পিনকোড :--------------------

'মাদুরা কোটস লিমিটেড, ব্যাংগালোর' নামাঙ্কিত ২৫.০০ টাকার পোস্টাল অর্ডার নং .... এই সংগে পাঠানো হল।

স্থান :--------------------

তারিখ :-------------------- স্বাক্ষর

কুপন পাঠানোর শেষ তারিখ ৩১ মার্চ, ১৯৮৭

সুকুমার রায়ের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে

কিশোর মন

ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৭ সংখ্যাটি



আবোল তাবোল সংখ্যা

হয়ে বেরচ্ছে

অসাধারণ এই সংখ্যাটি সাজাচ্ছেন

সত্যজিৎ রায় ■ শুধু ভারতের সাহিত্যে নয়, বিশ্বসাহিত্যেও সুকুমার রায় এক বিস্ময়কর লেখক।

আশাপূর্ণা দেবী ■ সুকুমার রায়কে নিয়ে লেখার সুযোগ পেয়েছি, এ আমার সৌভাগ্য।

প্রেমেন্দ্র মিত্র ■ রাজা নয়, ছড়ার বাদশা।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ■ সুকুমার রায়ের নাটক কি শুধু ছোটদের?

অন্নদাশঙ্কর রায় ■ আমি নিজেও তো ছড়া লিখি, কিন্তু অমন লেখা লিখতে পারিনি একটাও।

লীলা মজুমদার ■ এমন রসরচনার গুণ আমাদের দেশে তো নয়ই, পৃথিবীতেও দু-চারজনের বেশি দেখা যায়নি।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ■ একাই তিনি একটা সময়, একটা যুগ।

সুকুমার সেন ■ সমাজের উঁচুতলার মানুষদের সঙ্গে সুকুমার রায়ের ছিল নাড়ির যোগ। তাদের উদ্দেশ্যেই তিনি লিখেছিলেন, রামগরুড়ের ছানা, হাসতে তাদের মানা।

প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী ■ তাঁর লেখা আমার হারিয়ে যাওয়া রঙিন ছেলেবেলাকে ফিরিয়ে দেয়।

মমতা ব্যানার্জী ■ চলচ্চিত্তচঞ্চরী নাটকটি আমার সবচাইতে ভাল লাগে।

এ ছাড়াও

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অমিতাভ চৌধুরী, গণেশ পাইন, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, ঋষিণ মিত্র, সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, অনীশ দেব, অরূপরতন ভট্টাচার্য, অজয় হোম, নলিনী দাশ, জ্যোতিভূষণ চাকী, অশোককুমার মিত্র, সিদ্ধার্থ ঘোষ, বারিদবরণ ঘোষ, চন্ডী লাহিড়ী, বিষ্ণু বসু, উদয়শঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায়, নিতাই ঘোষ, কার্তিক ঘোষ, ডক্টর অশোক মিত্র, শক্তি চট্টোপাধ্যায় এবং সমরেশ বসু।

ঘরে এবং লাইব্রেরিতে রেখে দেওয়ার মত এই সংখ্যার দাম মাত্র পাঁচ টাকা

'ফান্ডামেন্টাল্স অব হাইড্রোজিওলজি'

ছয় খণ্ডে 'ফান্ডামেন্টালস অব হাইড্রোজিওলজি' প্রকাশিত হয়েছে। এটি একটি অভূতপূর্ব প্রকাশনা। নাউকা পাবলিশার্স-এর সাইবেরীয় শাখা এই গ্রন্থের প্রকাশক। গ্রন্থটি ১৯৮৬ সালের সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার লাভ করেছে। হাইড্রোজিওলজির মূল বিষয়গুলি এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

প্রখ্যাত বিজ্ঞানীদের মতে, তত্ত্বীয় ও ফলিত হাইড্রোজিওলজির গ্রন্থ হিসেবে এটিকে হাতের কাছে রাখা চলবে। চল্লিশজনেরও অধিক বিজ্ঞানীর লেখা এই গ্রন্থে বহু প্রস্তাবনার পক্ষে যুক্তি উপস্থিত করা হয়েছে এবং বহু অজ্ঞাত ব্যাপার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই কারণে গ্রন্থটি আরও মূল্যবান হয়ে উঠেছে।

এইডস ভাইরাস : প্রকৃতির না পেন্টাগনের দান

এইডস বা অ্যাকোয়ার্ড ইমিউন ডেফিসিয়েন্সি সিনড্রোমের উৎপত্তি সম্পর্কে মার্কিন ও কিছু কিছু পশ্চিম ইওরোপীয় পত্রপত্রিকায় লেখা হয়েছে, এইডস ভাইরাস বন্য জীবের মধ্যে রয়েছে। সবুজ বানররা এই ভাইরাস গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আফ্রিকায় বয়ে এনেছে। সেখান থেকে এসেছে পুয়ের্তো রিকোয় ১৯৪৫ সালে, পরে হাইতিতে। কিন্তু এইডস নিয়ে গবেষণারত সারা বিশ্বের কয়েকজন বিজ্ঞানীর ধারণা অন্যরকম। তাঁরা মনে করেন এই ভাইরাসটি উৎপন্ন হয়েছে পেন্টাগনের গবেষণাগারে। এই সিদ্ধান্তে তাঁরা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্রভাবে পৌঁছেছেন।

এই অভিমত সর্বপ্রথম ব্যক্ত করেন ব্রিটিশ ডাক্তার জন সিল। তাঁর মতে, ভয়ংকর এই ভাইরাসটি এক ধরনের ভেড়ার রোগসৃষ্টিকারী ভাইরাস থেকে উৎপন্ন এবং এরই দরুন গবাদি পশুর লিউকোমিয়া হয়ে থাকে।

ক্যালিফোর্নিয়ার প্রখ্যাত এইডস বিশেষজ্ঞ রবার্ট স্টেকারেরও তাই মত। মার্কিন গবেষণাকেন্দ্রগুলির ওপরে তিনি এই বলে দোষারোপ করেছেন যে, জন্তুজানোয়ারের রোগের ভাইরাসকে তাঁরা দাঁড় করিয়েছে প্রাণঘাতী ও দুরারোগ্য একটি ব্যাধিতে।

স্টিল ও স্টেকারের সংগে প্রায় একই সময়ে ব্র্যাডফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ আলাস্টেয়ার হে তাঁর বক্তব্য উপস্থিত করেছেন। পেন্টাগনের মহাফেজখানায় একটি চাঞ্চল্যকর আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেছেন তিনি। সেটি ১৯৬৯ সালের একটি দলিল। তাতে বলা হয়েছে, মানুষের শরীরে রোগ-প্রতিরোধ-ক্ষমতা দমন করার জন্য একটি নতুন মাইক্রোব বা ভাইরাস আবিষ্কারের কথা।

আমেরিকায় এইডস আক্রান্তদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে। এবিসি টেলিভিশনের খবর থেকে জানা যায়, পাঁচ বছরের মধ্যে আমেরিকায় এইডস রোগীর সংখ্যা দাঁড়াবে ১,৭৯,০০০। আর ১৯৯১ সালের মধ্যে এইডস রোগে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়াবে ৫৪,০০০।

মহাবিশ্ব সম্পর্কে নতুন তথ্য

সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা রেলিক্ট নামে একটি পরীক্ষাকার্যে জানতে পেরেছেন, দশ লক্ষ বছর বয়সের সময়ে আমাদের মহাবিশ্বের চেহারা কেমন ছিল। পরীক্ষাকার্যটি সম্পন্ন হয়েছে অভূতপূর্ব সক্রিয়তাসম্পন্ন একটি রেডিও টেলিস্কোপের সাহায্যে। ১৯৮৩ সালের জুলাই মাসে এই রেডিও-টেলিস্কোপটি প্রোগনোজ-৯ নামে একটি মহাকাশযানে বাহিত হয়ে কক্ষপথে স্থাপিত হয়েছিল। পরীক্ষাকার্যের উদ্দেশ্য ছিল তথাকথিত অবশিষ্ট বিকিরণ পর্যবেক্ষণ করা। পরীক্ষাকার্যের ফলাফল থেকে বিগ ব্যাংগ ও সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্বের তত্ত্বটি পরোক্ষভাবে সমর্থিত হয়েছে।

পরীক্ষাকার্যের অন্যতম অধিকর্তা আই স্ত্রুকভ বলেন, 'আমরা ধরে নিই যে মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে এবং এই প্রক্রিয়ার গোড়ার পর্বে মহাবিশ্বের বস্তু ছিল অতি-উত্তপ্ত ও অতি-ঘন অবস্থায়। এই অনুমান থেকে আমরা যুক্তিসংগতভাবেই ব্যাখ্যা করতে পারি ১,৫০০ কোটি বছর আগে বিগ ব্যাংগ ঘটার সময়ে আসলে কী ঘটেছিল। আমরা মনে করি, সম্পসারণ ঘটেছে পর্বে পর্বে। গোড়ার পর্বে বিদ্যুৎচৌম্বক বিকিরণ ও বস্তুর মধ্যে প্রচণ্ড বিক্রিয়া ঘটার ফলে মহাবিশ্ব ছিল অস্বচ্ছ। তার ফলে বর্ণালির বিদ্যুৎচৌম্বক এলাকায় সেটি ছিল অদৃশ্য। দশ লক্ষ বছর পরে বস্তু থেকে বিকিরণ 'বিচ্ছিন্ন' হয়ে যায় এবং স্বতন্ত্রভাবে সম্প্রসারিত হয়ে চলে। এই রেডিও তরংগগুলিকেই এখন আমরা বলি অবশিষ্ট বিকিরণ।'

পরীক্ষাকার্য থেকে প্রচুর তথ্য পাওয়া গিয়েছে। এই তথ্য বিমান থেকে পেতে হলে সময় লাগত ২৫০ বছর। তথ্যগুলি বিশ্লেষণের জন্য বহু বছর সময় লাগবে। বিজ্ঞানীর মতে, লব্ধ তথ্য যথেষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে যে, সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্বের মডেলটি গ্রহণীয়। এই মডেলে বিগ ব্যাংগ ঘটার পরবর্তীকালে বস্তুর সম্প্রসারণ ও শীতলীভবনের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

গবেষণা-জাহাজ প্রফেসর ভিজে-র আন্টার্কটিক যাত্রা

গবেষণা জাহাজ 'প্রফেসর ভিজে' ৩২তম সোভিয়েত আন্টার্কটিক অভিযানের বিজ্ঞানীদের নিয়ে লেনিনগ্রাদ থেকে দক্ষিণমেরুর দিকে যাত্রা করেছে। এই জাহাজকে প্রায় অগম্য রস্ ও ওয়েডেল সাগরে প্রবেশ করতে হবে। জাহাজে আছে ২৯টি ল্যাবরেটরি, কম্পিউটিং কেন্দ্র, গভীর সমুদ্রে অবতরণের কপিকল এবং আবহ গবেষণার উদ্দেশ্যে রকেট উৎক্ষেপণের ব্যবস্থা। গবেষকরা মহাসাগর বরফ ও বায়ুমণ্ডলের সমস্ত রকমের বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম চালিয়ে যাবেন।

কুড়ি বছর আগে নির্মিত এই জাহাজটি ৪৭ বার সমুদ্র-অভিযান করেছে এবং বিশ্বের মহাসাগরে দশ লক্ষ মাইল পাড়ি দিয়েছে। এই জাহাজে প্রায় ১০,০০০ গবেষক কাজ করে গিয়েছেন। সম্প্রতিকালের সমস্ত প্রধান প্রধান আন্তর্জাতিক অভিযানে এই জাহাজ যোগ দিয়েছে। এখানে সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের সংগে একযোগে কাজ করেছেন বুলগেরিয়া, হাংগেরি, জিডিআর, ভারত, মংগোলিয়া, পোল্যান্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, ও ইকুয়াডরের বিজ্ঞানীরা। □

'স্পেকট্রাম' শব্দটির বাংলা অর্থ হচ্ছে বর্ণচ্ছটা। সম্প্রতি নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠানটি দেখতে দেখতে এই নামকরণের সার্থকতা খুব ভালভাবেই উপলব্ধি করতে পারছিলাম। শিশুদের দ্বারা এরকম বর্ণালী উৎসবের কথা ভাবাই যায় না। অথচ ব্যাপারটি বাস্তবে ঘটেছিল। ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়েরা রামধনুর মতো রঙিন হয়ে কত না নাচ-গান দেখিয়ে আমোদে মাতাল!

বি কে বিড়লা গ্রুপের স্কুলগুলি অর্থাৎ অশোক হল গার্লস হাই স্কুল (শরৎ বসু রোড ও টালিগঞ্জ শাখা), মহাদেবী বিড়লা গার্লস হাই স্কুল ও মহাদেবী বিড়লা শিশুবিহার, আপন গোষ্ঠীর মধ্যে সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে, ১৯৮৩ সাল থেকে এই বর্ণাঢ্য উৎসবের আয়োজন করে চলেছেন।

'আমরা একই সমাজভুক্ত' – এই মনোভাব সার্থক করার জন্য এর প্রথম পরিকল্পনা করা হয়। একই কমিউনিটির ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা যাতে নিজেদের মধ্যে মেলামেশা করতে পারেন, পারস্পরিক ভাব-বিনিময়ের দ্বারা মানসিক উৎকর্ষ যাতে আরও বৃদ্ধি পায় সেই কারণে এই 'স্পেকট্রাম' নামক অনুষ্ঠানের প্রচলন হয়ে ছিল। আজ তৃতীয় বর্ষপূর্তির শেষে কয়েকজন শিক্ষিকার অভিমত, 'উৎসবের উদ্যোগ সর্বাংশেই সার্থক হয়েছে।'

তিলক ফ্রেমার







অনুষ্ঠান দেখেছি তার কিছুটা বর্ণনা দিচ্ছি। প্রথমে অশোক হল (জুনিয়র) করেছে 'ডার্কনেস টু লাইট', মহাদেবী বিড়লা গার্লস হাই স্কুল (জুনিয়র) দেখিয়েছে 'ভিলেজ ফেয়ার'। সত্যি কচি-কাঁচাদের দিয়ে এরকম মনোরকম অনুষ্ঠানের কথা যাঁর মাথা থেকে বেরিয়েছে তাঁকে অনেক ধন্যবাদ দিতে হয়। যেমন অভিনব পরিকল্পনা, তেমনই সুষ্ঠু প্রয়োগ! অশোক হল, টালিগঞ্জ (জুনিয়র) ও মহাদেবী বিড়লা শিশুবিহারের খুদে ছাত্রীরা দেখাল যথাক্রমে 'হারমনি অব সিজনস্' ও 'একতা কি শান'। এরাও ভাল পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। অপেক্ষাকৃত বড় ছাত্রীদের অনুষ্ঠানও উল্লেখযোগ্য, যেমন মহাদেবী বিড়লা গার্লস হাই স্কুলের 'প্যানোরামা', অশোক হল, টালিগঞ্জের 'কাবুই নাগা ডান্স' বা অশোক হল, শরৎ বসু রোড শাখার 'ড্রিল উইথ আ ডিফারেন্স' নামের বিভিন্ন উপস্থাপনাগুলি।

চড়াপর্দার গানগুলি অনেকাংশেই অবোধ্য রয়ে গেছে। সেগুলি শুনতেও খুব শ্রুতিমধুর লাগেনি। তবে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো, এত বিপুল সংখ্যক ছাত্রীদের নিয়ে এজাতীয় সুশৃংখল ও ছন্দোবদ্ধ অনুষ্ঠান সচরাচর দেখাই যায় না। □

রীতা গুহঠাকুরতা

ফটো : শংকর নাগ দাস



নাগা ডান্স



একতা কি শান



হারমনি অব সিজনস

প্রশ্ন : তিস্তা গাঙ্গুলী, হাওড়া। পেঁয়াজের রস মাখতে গেলে কীরকম পেঁয়াজ চাই? মাথায় কীভাবে লাগাব? ঘরে দই (টক) কী করে পাতব?

উত্তর : তিস্তা, তুমি পুরো নাম ঠিকানা দাওনি চিঠিতে, ভবিষ্যতে এ বিষয়ে খেয়াল রেখো।

মাথায় চুলের জন্য যে-পেঁয়াজ মাখতে হয়, তা ছোট্ট ছোট্ট পেঁয়াজ, যাকে বলে ধানী পেঁয়াজ। ওই পেঁয়াজ সামান্য থেঁতো করে রসটা মাথায় চুল সরিয়ে সরিয়ে ঘষে ঘষে মাখবে।

তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলি, ঘরে দই পাতা খুব সোজা। যে পরিমাণ দুধে দই পাততে চাও, দুধটা ভাল করে ফুটিয়ে সামান্য ঘন করে নেবে। দুধ ঠান্ডা হলে এক চামচ দই অল্প দুধে ভাল করে ঘেঁটে নিয়ে, ওই দুধে মিশিয়ে দিয়ে ভাল করে নেড়ে নেবে একবার। বেশি নাড়ানাড়ি করবে না। যে পাত্রে দই বসাবে তা স্টেনলেস স্টিল, পাথর বা কাচের হলে ভাল। কয়েক ঘণ্টা পরে দেখবে দই জমে গেছে। তখনই ফ্রিজে ভরবে। তার আগে নয়। নইলে দই জমবে না। শীতের সময় দই বসাবার পাত্রটা গরম জলের পাত্রে বসিয়ে রাখলে ভাল, কারণ ঠান্ডায় দই ভাল জমে না। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি টক দই স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব ভাল। টক দই নিয়মিত খাওয়া অভ্যাস কর। তাছাড়া মুখে মাখতে, চুলে দিতে – টক দইয়ের জুড়ি মেলা ভার। সপ্তাহে তিন-চার দিন এক চামচ টক দই সারা মুখে মেখে নিয়ে পনেরো মিনিট পরে ধুয়ে নিও। দেখবে মুখের ত্বক কত উজ্জ্বল, কত মসৃণ লাগে। মাথা ঘষবার আগে চুলে টক দই মেখে রাখলে চুলও মসৃণ ও উজ্জ্বল দেখায়।

প্রশ্ন : ঝর্না দত্ত, মুরারই, বীরভূম। আমি বেশ কিছুদিন ডান পায়ের একজিমায় ভুগছি। নানারকম মলম লাগিয়েও ফল পাচ্ছি না। কিসে উপকার পাব জানালে বাধিত হব। গায়ে প্রচণ্ড ঘামাচি হয়। ওইজন্যেই এগুলো হচ্ছে কিনা জানি না। ডান হাতও বোধহয় আক্রান্ত হচ্ছে।

উত্তর : ঝর্না, তুমি একটি শিশুকন্যারও জননী বলে লিখেছ, তুমি যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি কোনো চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নাও, সেইমত চিকিৎসা করাও। তোমার সব সমস্যাই তাঁকে খুলে বলবে।

প্রশ্ন : দ্বারিকা (:), হাওড়া। আমার শখ আবৃত্তি করা, কিন্তু আবৃত্তি বিষয়ে আমি আরো কিছু শিখতে চাই। তাছাড়া আকাশবাণীতেও আবৃত্তি করতে চাই। ওদের সঙ্গে কিভাবে যোগাযোগ করতে হয়? একজন ভাল মহিলা আবৃত্তিকারের সন্ধান দিলে ভাল হয়। আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন, আমি পার্সনালিটি, গ্র্যাভিটি আর স্ট্যামিনা বাড়াতে চাই। কিভাবে স্মার্ট হওয়া যায়? তাছাড়া



গলার স্বরও কিভাবে ভাল করা যায়

উত্তর : আপনি আরো ভাল করে আবৃত্তি করা শিখতে চান জেনে ভাল লাগল। কারণ নিষ্ঠা আর উৎসাহই মানুষকে সব কাজে সম্পূর্ণতা এনে দেয়। এরজন্য আপনি আবৃত্তি শিল্পী কাজল চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। ঠিকানা কাজল চৌধুরী, ফ্ল্যাট নং ১২ এ, (তেতলা), ১০৪ বি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৯।

আকাশবাণীতে আবৃত্তি করতে হলে আপনাকে 'অডিশন' দিতে হবে। অডিশনের ফল সন্তোষজনক হলে তবেই কর্তৃপক্ষ আপনাকে ডাকবেন। আকাশবাণীর ইডেন গার্ডেনস্থ কেন্দ্রে গিয়ে অনুসন্ধান বিভাগে খোঁজ নেবেন। ওখানে 'অডিশন' দেবার জন্য নির্দিষ্ট আবেদনপত্র পাওয়া যায়।

আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলছি, চলাফেরা, কথা বলার ভঙ্গি – সব কিছুতেই মানুষের ব্যক্তিত্ব এবং স্মার্টনেসের পরিচয় পাওয়া যায়। অনর্থক তাড়াহুড়ো করা, বেশি কথা বলা, সব বিষয়ে অকারণ কৌতূহল এগুলো পরিহার করার চেষ্টা করুন। ধীর গম্ভীর পায়ে চলাফেরা করুন, মেরুদণ্ড সোজা করে সামনের দিকে চোখ রেখে চলবেন, সামান্য গ্রীবাভঙ্গির কৌশলও আপনাকে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন করে তুলবে। স্পষ্ট গলায় কথা বলুন। যে যতটুকু প্রশ্ন করছে, সেই মতই উত্তর দেবেন। স্ট্যামিনা বাড়াবার জন্য এবং গলার স্বরের জন্যও নানা ধরনের যোগব্যায়াম আছে। এ বিষয়ে বিশেষ কিছু জানতে হলে এই পত্রিকার 'স্বাস্থ্য প্রতি পদে' বিভাগে চিঠি লিখুন। যোগব্যায়াম আপনার ব্যক্তিত্ব বিকাশেও সহায়তা করবে।

এ প্রসঙ্গে আবার একটি পুরনো কথা নতুন করে মনে করিয়ে দিতে চাই যে, অন্তরঙ্গ বিভাগে চিঠি লেখার সময় পুরো নাম ঠিকানা দেওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

প্রশ্ন : সুদেষ্ণা চক্রবর্তী, মেদিনীপুর।

উত্তর আপনি নতুন চাকরিতে যোগ দিচ্ছেন, সেজন্য আমাদের অভিনন্দন রইল। আপনার নতুন চাকরিই আপনাকে প্রার্থিত ব্যক্তিত্ব আর সৌন্দর্য এনে দেবে। আপনি ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে কোনো ভাল টনিক খান, এছাড়া হালকা ব্যায়াম করবেন। সুকন্যায় এর আগে মেয়েদের খালি হাতে ব্যায়ামের অনেক নির্দেশ বেরিয়েছে। ১ ১৫ জুলাই, ১৯৮৬ সংখ্যাটি পড়ে নেবেন।

সামান্য উঁচু হিলের জুতো পরলে আপনাকে লম্বা দেখাবে। হিল পরার অভ্যাস থাকলে তবেই এ ধরনের জুতো পায়ে দেবেন কিন্তু। চুলে খোঁপা বাঁধবেন, নানা ধরনের এলোখোঁপা। এ ধরনের চুল বাঁধায় আপনার ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠবে। মাঝে মাঝে বড় ক্লিপও খোঁপায় দিতে পারেন। রঙিন শাড়ি পরবেন নিশ্চয়ই, শাড়ি থেকে রং বাদ দিলে জীবন থেকেও রং মুছে যায়। দিনের বেলায় চড়া বা গাঢ় রঙের শাড়ি পরবেন না। হালকা রঙের ছোট নকশা পাড়ের শাড়ি মানাবে আপনাকে। চওড়া পাড় একেবারেই আপনার উচ্চতার জন্য নয়। লম্বা দিকের ডুরে শাড়ি পরলে ভাল হয় অথবা তেরছা দিকে ছাপা ডুরে। বড় বড় ছাপের চড়া রঙের শাড়িও বাদ দেবেন। হালকা ছোট ছোট ফুলপাতা ছাপ পরবেন।

আপনার শেষ প্রশ্নের উত্তরে বলছি, এ বিষয়ে সম্মতি দিলে আপনার ভালই হবে। আপনিও তো কিছুটা মানসিকভাবে প্রস্তুত, চিঠি পড়ে তো তাই মনে হল। আপনি জীবনে সুখী হবেন এই আমাদের কামনা।

প্রশ্ন অজন্তা মজুমদার, মেদিনীপুর। সমস্যা মনের মতো ভ্রূ

উত্তর : অজন্তা, তুমি ছেলেমানুষ তুমি তো সাজবেই। আমার মনে হয় তুমি আগে আইব্রাউ পেন্সিলে তোমার মনের মতো ভ্রূ এঁকে নিয়ে সেইমত প্লাক কর যদি ভ্রূতে যথেষ্ট লোম না থাকে তো রাতে শোবার আগে সামান্য অলিভ অয়েল লাগিয়ে নিও

প্রশ্ন অনুরাধা সেনগুপ্ত কাছাড়, আসাম। আমি প্রায় ৬০ খানা লোকগীতি, আধুনিক ও ভজন গান রচনা করেছি ১০ খানা অল ইন্ডিয়া রেডিও নিয়েছে আমি গীতিকার হিসাবে কিছু ফোক সং শ্রীমতী রুমা গুহঠাকুরতাকে দিতে চাই আমি রেকর্ড ও ক্যাসেট করাতে চাই। ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়্যার-এর ঠিকানা জানালে বাধিত হব

উত্তর : ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়্যার, ৩৮ বালিগঞ্জ প্লেস, কলকাতা ১৯

প্রশ্ন : গৌরী গুহ, ইব্রাহিমপুর রোড, যোধপুর পার্ক। সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতির বালিগঞ্জ কেন্দ্রের ঠিকানা চাই।

উত্তর সরোজনলিনী মেমোরিয়াল অ্যাসোসিয়েশনের ঠিকানা – ২৩/১ বালিগঞ্জ স্টেশন রোড, কলকাতা-১৯।

প্রশ্ন : শচী হালদার, ক্যানিং ২৪ পরগনা। স্বামী পরিত্যক্তা অসহায় অবস্থার সমস্যা।

উত্তর আপনি উপরের ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন। মেয়ের জন্য মৈত্রেয়ী দেবী, ১৩/১ পাম অ্যাভিনিউ, কলকাতা-১৯, এখানে যোগাযোগ করে দেখতে পারেন। □

লেখা গুপ্ত



প্রশ্নোত্তরে 'আপনার সন্তান'

অভিভাবক-অভিভাবিকার প্রতি

সন্তানের চরিত্রগঠনের ব্যাপারে 'সুকন্যা'র পাতায় নিয়মিত পরামর্শ দিচ্ছেন বিশিষ্ট শিশু বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষাবিদ শ্রী কে পি চৌধুরী। আপনার সন্তানের ব্যক্তিত্ব গঠন ও তৎসংক্রান্ত সমস্যা বিষয়ে 'সুকন্যা'র সম্পাদকীয় দপ্তরে চিঠি লিখুন। সন্তানের নির্দিষ্ট সমস্যার বিবরণ ছাড়াও অবশ্যই আর যা জানাবেন তা হল – ১. আপনার সন্তান ছেলে না মেয়ে; ২. বয়স; ৩. সন্তান সংখ্যা এবং তাদের ক্রম-অনুযায়ী সমস্যায় কবলিত সন্তানের স্থান; ৪. মা-বাবা উভয়ে জীবিত কিনা; ৫. মা ও বাবা দুজনেই রোজগারের জন্য বেরিয়ে পড়েন কিনা; ৬. মা ও বাবার সম্পর্ক – ভাল, মাঝারি বা খারাপ; ৭. সন্তান কী পড়ে? পড়াশোনায় তার অগ্রগতি – ভাল, মাঝারি বা পিছিয়ে পড়া; ৮. পড়াশোনা ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে তার আগ্রহ; ৯. প্রয়োজন বোধ করলে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়।

প্রশ্ন : সমস্যা আমার ভাসুরের ছোট মেয়েকে নিয়ে। ওরা প্রথমে এক বোন ও এক ভাই জন্মায়। তারপর গর্ভাবস্থায়ই একটি সন্তান নষ্ট করে ফেলা হয়। শেষে শ্বশুর-শাশুড়ির চাপে ছোট মেয়েটি জন্মেছে। এখন আমার জা অপারেশন করে ফেলেছেন। বড় মেয়ে ও ছেলেটি শান্ত, পড়াশুনায়ও ভাল। মা, বাবা ও গুরুজনদের কথা শোনে। ছোট মেয়েটি কারো কথা শোনে না। সব সময় বায়না করে। বায়না পূরণ না হলে পাড়া জানিয়ে কাঁদে। এক বায়না পূর্ণ হলে সংগে সংগে নতুন বায়না ও কান্না। কান্না আরম্ভ হলে সহজে থামেও না। সব সময়, রান্নাঘরে ওর মায়ের পেছন পেছন ঘুরবে, আর বায়না ধরে কাঁদবে। পড়াশুনাও একেবারে করতে চায় না। কী করলে মেয়েটা শান্ত ও ভাল হবে

রাজা মণীন্দ্র রোড, কলকাতা

উত্তর : মেয়েটির সমস্যা কী, তা হয়ত সুকন্যার নিয়মিত পাঠক পাঠিকা অনেকেই বুঝতে পেরেছেন। পুরনো সুকন্যাগুলি দেখলে আপনিও সমস্যার প্রকৃতি বুঝতে পারবেন। যে-কোনো কারণে, সন্তান মা-বাবার কাছে অপ্রার্থিত হলে, শিশুমনে তার যে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, তা অনেক ছেলেমেয়ের ব্যবহার-সমস্যার ক্ষেত্রেই আলোচনা করা হয়েছে। ব্যবস্থাপত্রের মত করে, আপনাকে নির্দিষ্ট পরামর্শ দিতে অসুবিধা – ১। মেয়েটির বয়স, কোন ক্লাসে পড়ে এবং পড়াশুনায় কতখানি অনগ্রসর তা স্পষ্ট করে লেখেননি। ২। ছেলেমেয়েদের ব্যবহার-সমস্যা সাধারণত মা-বাবাকে ঘিরেই হয়। মা-বাবাকে সমস্যা বুঝতে হয়, ছেলেমেয়েদের জন্যে, নিজেদের ইচ্ছা, অনিচ্ছা, সুখস্বাচ্ছন্দ্য ছাড়তে হয় এবং নিজেদের ব্যবহারে পরিবর্তন আনতে হয়। কাজেই মা-বাবা নিজে আগ্রহী না হলে, কোনো ছেলেমেয়ের ব্যবহার সমস্যায়ই সাহায্য করা যায় না। ৩। আপনি মেয়েটি সম্বন্ধে যতই উদ্বিগ্ন হোন, মা-বাবার হয়ত মেয়েটির ব্যবহার-সমস্যা সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা হতে পারে। তাই মেয়ের মা-বাবাকে চিঠি লিখতে অনুরোধ করি।

পরামর্শ : তবু কয়েকটি পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। ওইগুলি অনুসরণ করতে আরম্ভ করে আবার বিস্তারিত লিখুন। ১। আশা করছি, মা-বাবার মনে মেয়েটি সম্বন্ধে অপ্রার্থিতের বোধ এখন আর নেই। মা-বাবাকে মেয়েটির মন থেকে অপ্রার্থিতের বোধ দূর করার জন্য সবরকম চেষ্টা করতে হবে। ২। তাঁদের বুঝতে হবে, বায়না ধরাটা মেয়ের একটা অস্ত্র মাত্র। আসলে সে চায়, তার প্রতি মা-বাবার বিশেষ দৃষ্টি, তাঁদের আদর ভালবাসা। তাই মেয়েকে বকাবকি, মারধর করলে, তার বায়না ও কান্না আরও বেড়ে যাবে। মেয়েকে বকাবকি ও মারধর একেবারে বন্ধ করতে হবে। ৩। বায়না ধরে কান্নাকাটি শুরু করলে, তা শুধু অবহেলা করে চলুন। কিন্তু কোনো রাগ বা বিরক্তির ভাব দেখাবেন না। মেয়ের কান্নায় বাড়ির সবাই বিরক্ত হলে, ঠাকুরমা ছুটে এলে (আপনি লিখেছেন) তাঁদের বোঝাতে হবে। যতক্ষণ ও যত জোরে মেয়েটি কাঁদতে পারে, কাঁদতে দিন। কান্না থামলে মা-বাবাকে কিন্তু মেয়েকে প্রচুর আদর করতে হবে। এই ব্যবস্থা বাস্তবে রূপায়িত করতে গিয়ে যেসব অসুবিধা হবে জানাবেন। ৪। মা, মেয়েকে কাছে নিয়ে জড়িয়ে ধরে শোবেন। যতটা সম্ভব, ওর মতে চলবেন এবং ওকে আদর করবেন। মেয়ের প্রতি রূঢ় হবেন না। ৫। বাবাকেও মেয়ের জন্যে সময় দিতে হবে। তাকে গল্প বলতে হবে, বেড়াতে নিয়ে যেতে হবে, তার খেলার সাথী হতে হবে। ৬। মেয়েকে পড়াশুনায় ভাল করতেও চেষ্টা নিতে হবে। মেয়ের পড়াশুনার ব্যাপারে বিস্তারিত জানালে, সে বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে।

প্রশ্ন : আমার এক ছেলে ও এক মেয়ে। ছেলে বড়, মেয়ে ছোট। সমস্যা ছেলেকে নিয়ে। কলেজে যাওয়া ও পড়াশুনার ব্যাপারে প্রচণ্ড অনাগ্রহ। আগে কিন্তু পড়াশুনায় ভাল ছিল। ১৩ বছর বয়স থেকেই পড়াশুনায় খারাপ হতে শুরু করে। স্কুল কামাই করতেও আরম্ভ করে। তবু মাধ্যমিক ভালভাবেই পাশ করেছে। উচ্চমাধ্যমিক মোটামুটিভাবে পাশ করে। বর্তমানে বি. কম পড়ছে।

ওর রাগ ভীষণ বেশি। ১৩ বছরের পর থেকে তা আরও বেড়ে যায়। রাগলে জ্ঞান থাকে না। জিনিসপত্র ভাঙচুর করে ও বাবা-মা, বোনের গায়ে হাত তোলে। ও কোনো কিছুতেই লেগে থাকতে পারে না। মাকে বিরক্ত করাতেই যেন ওর আনন্দ। ভীষণ অস্থির, কোনো কিছুতেই মনস্থির রাখতে পারে না। যোগশিক্ষা, সাঁতারের ক্লাব, শরীরচর্চা কত কিছুই করল। কিন্তু সবই দুদিনের জন্যে। আর একটা বদ অভ্যাস, সব সময়ই চুরুট খেয়ে চলেছে।

তবে এখন যেন দেখছি, একটু বুদ্ধি বিবেচনা হয়েছে। আগের তুলনায় শান্ত ও অনুতপ্ত। বাড়িতেই থাকতে চায়। বাড়ির কাজকর্মও করে। কিন্তু কলেজে যেতে চায় না। কোনো বিশেষ প্রতিষ্ঠানে (Reformatory) দেব কি

দেওদার রহমান রোড, কলকাতা

উত্তর : প্রথমেই, ছেলের সমস্যা দূরীকরণে বিশেষভাবে চেষ্টা করতে আপনাকে অনুরোধ করি। ছোটবেলা থেকেই আপনার ছেলের মানসিক ভারসাম্য গুরুতরভাবে বিঘ্নিত হয়েছে। বর্তমানে আপনার ছেলের যে মানসিক অবস্থা, তাতে অনেক ছেলেমেয়ে একেবারে উন্মাদ হয়ে যায়, না হলে হেরোইন প্রভৃতি নেশা ধরে। বর্তমানে আপনি যাকে শান্ত অবস্থা বলছেন, তাতে আরও বেশি উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ রয়েছে। দেরি না করে আপনার ছেলেকে বিশেষজ্ঞ দেখিয়ে চিকিৎসা করানো প্রয়োজন। আপনাদেরও ছেলের সমস্যা বুঝে বিশেষজ্ঞের সংগে সহযোগিতা করতে হবে। সমস্যা বুঝে পরামর্শমত চলতে পারলে এমনিতেও কিছুটা উপকার হবে। এমনকি ছেলে সুস্থও হয়ে যেতে পারে।

সমস্যা : মনে হয় সন্তানজন্মের ব্যাপারে আপনারা পরিবার-পরিকল্পনার নীতি মেনে


পরিবর্ত্তনশীল আপনার জীবন... সদা কর্ম চঞ্চল।
নতুন উদ্দীপনা...নতুন প্রত্যাশা...
নেসকাফে তো তারই অনুভব।
তাহ'লে...
হয়ে যাক নেসকাফে
জীবনের কর্মব্যস্ততার মধ্যে আপনার চাই, এক সজীব প্রাণস্ফর্ত্তির অনুভব। আর এটাই তো নেসকাফের বিশেষত্ব। কেননা, নেসকাফে মানে ১০০% বিশুদ্ধ কফি। এতে না আছে চিকরী, না অন্য কোনো মিশাল। এই জন্যই তো নেসকাফে।
আর তৈরী করাও কত সহজ।
ছোটো চামচের এক চামচ নেস্কাফে নিন। কড়া কফি খেতে চান তো ভর্ত্তি চামচ নেবেন। সর্বদা শুকনো চামচ ব্যবহার করবেন। কাপে কফি দিন।
তাতে ঢালুন ফুটন্ত জল। নেস্কাফে আপনা থেকেই গুলে যাবে।
ইচ্ছামত দুধ আর রুচি অনুযায়ী চিনি মিশিয়ে নেড়ে নিন, ব্যস্ নেসকাফে তৈরী।
মনে রাখবেন! কফি পাউডার কখনও ফোটাবেন না।
"জানেন কি ৫০ গ্রামের এই প্যাকে ৪০ থেকে ৫০ কাপ পর্য্যন্ত কফি হয়"
NESCAFÉ
SELECT
100% pure coffee
100% COFFEE
প্রাণবন্ত জীবনের পরিপূর্ণ স্বাদ।

চলেছিলেন। ছেলে জন্ম-লগ্নে আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর একান্ত কামনার ধন ছিল। এই অনুকূল পরিস্থিতিতে ছেলের নিরাপত্তাবোধ বিঘ্নিত হল কেন? কেন তার মনে উদ্বেগাকুলতার সৃষ্টি হল? মা-বাবার ভালবাসা হারানোর ভয়ই বা তার মনে জাগল কেন? এবিষয়ে সুকন্যায়, আগের আলোচনা দেখবেন (১ জুন থেকে ১৫ জুন ও পরবর্তী কয়েকটি সংখ্যা)। আপনার ছেলের বর্তমান ব্যবহার, শিশুকালে তার নিরাপত্তাবোধ বিঘ্নিত হওয়ার প্রতিক্রিয়া। ছেলের মনে, নিরাপত্তাবোধ সৃষ্টি করতে পারলে, তার মানসিক ভারসাম্য ফিরে আসবে। আপনার ছেলের নিরাপত্তাবোধের অভাব কেন হল, নিচের কারণগুলির মধ্যে তা খুঁজে পাবেন আশা করি – ১। যে কারণেই হোক ছেলে হয়ত বেশিদিন মায়ের বুকের দুধ খেতে পায়নি। যে কয়দিন খেয়েছে, তাও সময় নিয়ে, মায়ের বুকে ঘনিষ্ঠ হয়ে লেগে থেকে খাওয়ার সুযোগ পায়নি। ২। নিতান্ত শিশুকালেই আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর মতদ্বৈধ প্রচণ্ডভাবে তার সামনে প্রকাশিত হয়েছে। মা-বাবাকে হারানোর ভয়ে শিশু আতঙ্কিত হয়েছে। ৩। অল্পবয়স থেকে ছেলের পায়খানা – পেচ্ছাব নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা হয়েছে এবং তার জন্যে ওই বয়সেই হয়ত শিশু শাসিত হয়েছে। ৪। ছেলেকে সব রকমে আদর্শ করে তোলার জন্যে, একটু বড় হওয়ার সংগে সংগেই, তার খাওয়া, ঘুম, জামাকাপড় পরা, বেড়ানো, সব কিছুতে তার ইচ্ছার মূল্য না দিয়ে, মায়ের ইচ্ছা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। ৫। ছেলের সব চাইতে ক্ষতি হয়েছে, যে সময় থেকে সে লেখাপড়া শুরু করেছে, মা তখন ছেলেকে ক্লাশে প্রথম দ্বিতীয় করার জন্যে আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছেন। ছেলের বুক সব সময় আশংকায় দুরু দুরু করেছে, সে মায়ের আকাংক্ষা পূর্ণ করতে পারল না – বুঝি বা মায়ের ভালবাসা হারাল (১-১৫ সেপ্টেম্বর থেকে সুকন্যার পরপর সংখ্যা দেখুন)। এ থেকেই ছেলের মনে হীনম্মন্যতাবোধ, আত্মবিশ্বাসের অভাব ও উদ্বেগাকুলতার সৃষ্টি হয়েছে। ফলশ্রুতি, একাকিত্ববোধ, মরণ আকাংক্ষা ইত্যাদি।

এ বিষয়ে আর বিস্তারিত না বলে, আপনার করণীয় সম্বন্ধে পরামর্শ দিতে চেষ্টা করছি। ১। ছেলেকে সমস্যা কবলিত ছেলেমেয়ের 'আরোগ্য নিকেতনে' (Reformatory) দেবেন না। ওর সমস্যা হচ্ছে আপনাকে নিয়ে। ওর ব্যবহার বুঝবার চাবিকাঠি হল, আপনার ভালবাসা পাওয়ার প্রবল আকাংক্ষা। আপনার কাছ থেকে দূরে গেলে তার সমস্যা হাজার গুণ বেড়ে যাবে। ২। সে যে, ভালয়-মন্দয় আপনার কাছে একান্ত প্রার্থিত, সে বোধ তার মনে জন্মানোই হবে আপনার সাধনা। ৩। আপনার আশা আকাংক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে পড়াশুনায় ভাল হতে না পারলে, ছেলের মনে আপনার ভালবাসা প্রাপ্তির বোধ জন্মাবে না। তার হীনম্মন্যতা ও আত্মবিশ্বাসের অভাব মন থেকে যাবে না। একটু বয়সাপেক্ষ হলেও, অংকে পারদর্শী Commerce এর জন্য, একজন গৃহ শিক্ষক রাখুন। তিনি, তার পিছিয়ে পড়া দূর করে, কলেজে যা পড়া হচ্ছে, তা থেকে, তাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবেন। ৪। সে Chartered Accountant হবে এ আশা তার মনে জাগিয়ে তুলুন। ৫। আপনি কিন্তু কোনো কারণে, তার প্রতি অসন্তুষ্টি দেখাতে পারবেন না। পড়াশুনার জন্য বা উচ্চাকাংক্ষা জন্মানোর জন্য চাপ সৃষ্টি করতে পারবেন না। তাকে পেয়ে, তাকে ভালবেসেই যেন আপনি কৃতার্থ। আপনার নিজের ব্যক্তিত্বকে পরিবর্তিত করতে না পারলে পরামর্শ অনুসরণ সম্ভব হবে না। যে সব পরামর্শ দেওয়া হয়েছে তার সম্বন্ধেও জিজ্ঞাসা থাকতে পারে। প্রশ্ন করলে, সুকন্যার মাধ্যমে উত্তর পাবেন। □

উত্তর দিচ্ছেন
কে পি চৌধুরী

একান্তে

রেখা মল্লিক

বাংলা চলচ্চিত্রকে সুবর্ণময় যুগে প্রতিষ্ঠিত করতে যে সকল শিল্পীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন, এঁদের অনেকের নাম আজকের দর্শক জানেন না। পশ্চিমবাংলা শিল্প ও শিল্পীর পূজারী এ কথা আমরা অহংকার করে সবসময় বলে থাকি। সত্যি কি তাই? তাই যদি হত, অতীতের সুঅভিনেতা ও অভিনেত্রীরা আজ কেন কাজ পাচ্ছেন না? একটি ছবিতে নায়ক-নায়িকা, প্রধান চরিত্রগুলি ছাড়াও বহু ছোট ছোট চরিত্র থাকে যেমন মাসিমা, পিসিমা, বৃদ্ধা ইত্যাদি। পুরনো কালের দক্ষ অভিনেত্রীদের কি এই চরিত্রগুলিতে অভিনয় করার সুযোগ দেওয়া যায় না? এ প্রশ্ন আমার নয়। এ প্রশ্নের মুখোমুখি বারবার হতে হচ্ছে আমাকে, পুরনো দিনের অভিনেত্রীদের সংগে দেখা করতে গিয়ে।

আজ অতীতের এমন একজন বিখ্যাত অভিনেত্রীর জীবন কাহিনী আপনাদের শোনাব।



অভিনেত্রীটির নাম শ্রীমতী রেখা মল্লিক। কিছুদিন আগে আকাশবাণীর বহু পুরনো কার্ড থেকে ওঁর ঠিকানা সংগ্রহ করি। শ্রীমতী কাননদেবী, শ্রীমতী চন্দ্রাবতীদেবী প্রভৃতি শিল্পীদের পরবর্তী যুগে যে সব নায়িকারা দর্শকের মন জয় করে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে শ্রীমতী রেখা মল্লিক একটি উজ্জ্বল তারকা।

শ্রীমতী রেখাদেবীর আদি বাড়ি বারাসাতের নলকূড়ো গ্রামে। বাগবাজারের একান্নবর্তী মিত্র পরিবারে তাঁর জন্ম। বাবার নাম ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র, মায়ের নাম মন্দাকিনী দেবী। শিল্পীর যখন তিন বছর বয়স, মায়ের সংগে দেশের বাড়িতে গিয়ে বাস করতে থাকেন। শিল্পীর মামার বাড়ি ছিল হাওড়া আমতাতে। রক্ষণশীল পরিবারে রেখাদেবীর জন্ম। কিন্তু বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান বলেই তাঁর সব আবদার তাঁরা ইচ্ছার বিরুদ্ধে মেনে নিতেন।

অভিনেত্রী রেখাদেবী প্রথম পড়াশোনা শুরু করেন গ্রামের ছোদমঞ্চ পাঠশালাতে। ক্লাস ফোর পর্যন্ত ওই পাঠশালাতে পড়াশোনা করে ছিলেন। বাড়ির নিয়ম ছিল মেয়েরা ক্লাস ফোর পর্যন্ত পড়াশোনা করতে পারবে।

কিন্তু ধীরেনবাবু একমাত্র মেয়ের আবদার রাখতে ক্লাস ফোর-এর পর মেয়ে ও স্ত্রীকে কলকাতায় আনতে বাধ্য হলেন। কলকাতায় আসার পর বাগবাজারের একান্নবর্তী পরিবারে থাকতে পারলেন না। ভবানীপুরে বাড়ি ভাড়া করলেন। শ্রীমতী রেখা দেবী বেথুন স্কুলে ভর্তি হলেন। পড়াশোনার মাঝে চলল তাঁর সংগীত ও নৃত্যের শিক্ষা। শিল্পীর সংগীতগুরু হলেন বিখ্যাত গায়ক পঙ্কজ মল্লিক ও নৃত্যগুরু হলেন ব্রজবাসী সিং। সে সময় কোনো মেয়ে প্রকাশ্যে নাচ বা গান করলে, সমাজ বলত 'ও মেয়ে খারাপ হয়ে গেছে', এক কথায় বলতে পারি সমাজে সেই মেয়ের কোনো স্থান হত না।

এবার শুনুন শিল্পী নিজে আমাকে যা বলেছিলেন তাঁর মা ও বাবার বিষয় – 'এখন অনেক বয়স হয়েছে, বুঝতে পারি আমার জন্য সে সময় বাবা ও মাকে কত যন্ত্রণা এবং অপমান সহ্য করতে হয়েছিল। আমার কাছে আমার বাবা, মা ঈশ্বর-স্বরূপ। তাঁরা আমাকে সমাজের কোনো আঘাত স্পর্শ করতে দেননি। মুখ বুজে আমার জন্য আত্মীয় পরিজনের কাছে অপমানিত হয়েছেন। কারণ ছিল একটাই, আমার হাসি মুখ দেখা।

শ্রীমতী মল্লিক বেথুন কলেজে আই এ পর্যন্ত পড়েছিলেন, কিন্তু পরীক্ষা দেওয়া হয়নি।

সেই সময়ের রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে হয়ে কি করে চলচ্চিত্র ও সংগীত জগতের সংগে তিনি যুক্ত হয়েছিলেন- এই প্রশ্ন তাঁকে আমি করেছিলাম।

আমার প্রশ্ন শুনে হেসে বললেন – 'যখন জানতে চাইছ তখন সব কথাই তোমায় বলি। আমার শিল্পী হওয়ার কাহিনীকে একটা ইতিহাস বলতে পার। আমার বাবা-মার কথা তোমায় আগেই বলেছি। এবার আমার কথা বলি। ছোট থেকে খুব জেদি ছিলাম। আমার কোনো কাজে কেউ বাধা দিলে, সেটাই আগে গিয়ে করতাম। আমার জনাই বাবা তাঁর আপনজনদের ছেড়ে ভবানীপুরে ভাড়া বাড়িতে থাকতে বাধ্য হন। মুখে এ কথা উনি কখনও প্রকাশ করেননি। কিন্তু আজ আমি এ বয়সে এসে তাঁর সেদিনের না বলা ব্যথা অনুভব করতে পারি। আমার মামার খুব নিকট বন্ধু ছিলেন বিখ্যাত নট ও পরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়া। মাঝে মাঝে মামার সংগে আমাদের বাড়িতে বেড়াতে আসতেন। নরেশ মিত্র মশাই তখন 'বাংলার মেয়ে' ছবির শুটিং করছেন। এই ছবিতে একটি শিশু শিল্পীর প্রয়োজন ছিল। আমার তখন দশ বছর বয়স। নরেশবাবু বড়ুয়া সাহেবের মুখে আমার কথা শোনেন। তারপর আর কি – স্বয়ং পরিচালক মশাই আমাকে দেখতে বাড়িতে – হাজির। বাবাকে অনেক বুঝিয়ে রাজি করালেন। আমার জীবনে 'বাংলার মেয়ে' প্রথম ছবি। আমার গান শুনতে মা খুব ভালবাসতেন, কিন্তু নাচলেই খুব রেগে যেতেন। এই ছবিটিতে অভিনয় করার পর অনেকগুলি বছর আমাকে কোনো ছবি বাবা অভিনয় করতে দেননি। পুরোপুরিভাবে আবার আমি ছবিতে অভিনয় শুরু করি যখন, তখন আমার বয়স ১৪ বছর ৬ মাস। ছবির নাম 'ব্রাহ্মণকন্যা'। ছবির পরিচালক ছিলেন বাবার খুব নিকট বন্ধু নিরঞ্জন পাল। ওঁর অনুরোধ বাবা ঠেলতে পারেননি তাই আবার আমায় অভিনয় করতে দিলেন। এ ছবির হিরো ছিল জ্যোতির্ময় মুখোপাধ্যায়।

শ্রীমতী রেখা মল্লিক যখন আমাকে বলছিলেন তাঁর ফেলে আসা অভিনেত্রী জীবনের কথা, তখন আমি কিছুদিন আগে টি ভি-তে দেখা 'অভয়ের বিয়ে' নায়িকা শ্রীমতী রেখা মল্লিককে খুঁজে চলেছি তাঁর প্রতিটি কথা বলার ভঙ্গির মধ্যে।হ্যাঁ, এবারে আপনারা ঠিক ধরেছেন ইনিই সেই 'অভয়ের বিয়ে' লাস্যময়ী নায়িকা শ্রীমতী রেখা মিত্র। বিয়ের পর ইনি রেখা মল্লিক হন। সে অনেক পরের কথা। 'অভয়ের বিয়ে' নায়ক ছিলেন ধীরাজ ভট্টাচার্য। এ ছাড়া এ ছবিতে ছিলেন ছবি বিশ্বাস, ছায়াদেবী, অহীন্দ্র চৌধুরী। 'অভয়ের বিয়ে' সুপার হিট হয়। নায়িকা রেখাদেবীর জীবনে এর পরের ইতিহাস শুধু একটির পর একটি ধাপ এগিয়ে যাওয়ার। এই ছবিতে প্লে-ব্যাক হয়েছিল। প্রযোজকের ইচ্ছা অনুসারে শ্রীমতী সুপ্রীতি ঘোষ এই ছবিতে প্লে-ব্যাক করেছিলেন। শ্রীমতী রেখাদেবী সুকণ্ঠী গায়িকা হয়েও এই ছবিতে নিজের গান নিজে গাইতে পারেননি। এ ঘটনা তাঁর মনে বড় লেগেছিল। শ্রীমতী রেখাদেবী যখন চলচ্চিত্র জগৎ-এর সংগে যুক্ত ছিলেন, তখন বুক-কনট্রাক্ট-এর সব শিল্পীরাই কাজ করতেন। আটশো টাকা থেকে তাঁর পারিশ্রমিক শুরু হয়েছিল। 'অভয়ের বিয়ে' হিট হওয়ার পর প্রতিটি ছবি হাজার টাকা বুক-কনট্রাক্ট-এ সই করতেন।

শিল্পীর নিজের মুখে বলা সংগীতশিল্পী হওয়ার কাহিনী শুনুন –

'ব্রাহ্মণকন্যা' ছবির কাজ করার সময় আমার স্বামী বিখ্যাত সুরকার শ্রী গোপেন মল্লিকের সংগে আমার পরিচয় হয়। উনি এই ছবির সহকারী সুরকার ছিলেন। আমার গান শুনে উনি মুগ্ধ হন। পরিচয়ের পর নিজেই মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ি আসতেন এবং আমাকে গান শেখাতেন। ওঁর উৎসাহ ও চেষ্টায় 'কবি-জয়দেব' ছবিতে আমি প্লে-ব্যাক করি। এ ছবিতে আমি অভিনয় করিনি। আমার স্বামী শ্রী গোপেন মল্লিক ছিলেন এইচ এম ভি-র একজন মিউজিক ট্রেনার। ১৯৪২ সালে এইচ এম ভি থেকে আমার প্রথম গানের রেকর্ড বেরোয়। গীতিকার ছিলেন প্রণব রায়। একটি গানের সুর দিয়েছিলেন কমল দাশগুপ্ত, অপর গানটির সুর দিয়েছিলেন আমার স্বামী। আমার কিন্তু তখনও বিয়ে হয়নি, আমি তখনও শ্রীমতী রেখা মিত্র।

অভিনেত্রী শ্রীমতী রেখা মল্লিকের সংগীত শিল্পীর জীবনকাল ১৯৪২ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত। এইচ এম ভি প্রথম দিকে প্রতিটি গানে ৫০ টাকা পারিশ্রমিক দিত, পরে ১৫০ টাকা পেতেন প্রতিটি গানে।

১৯৪৩ সালে শ্রাবণ মাসে শ্রীমতী রেখাদেবীর জীবনে চিরসাথী হয়ে এলেন গোপেন মল্লিক। বিয়ের পর তিনটি ছবিতে অভিনয় করেছিলেন – ছবির নাম 'উদয়ের পথে', 'হামরহি' (হিন্দি) এবং 'দুই পুরুষ'। এন টি স্টুডিও-র মালিক বীরেন সরকার এই ছবিগুলির প্রযোজক ছিলেন।

'উদয়ের পথে' বাংলা চলচ্চিত্রের একটি নতুন আঙ্গিক ও অভিনয় ধারার বাহক। বিমল রায় ক্যামেরা-ম্যান থেকে ডিরেক্টর-এ রূপান্তরিত হন এই ছবিতে। বিখ্যাত নট রাধামোহন ভট্টাচার্য, দেবী মুখোপাধ্যায়, বিনতা রায়, নিবেদিতা দাশ প্রভৃতি শিল্পীদের প্রথম অভিনয় এই ছবিতে।

১৯৪৪ সালে 'উদয়ের পথে' ছবির জন্য শ্রীমতী রেখা মল্লিক বেস্ট সাপোর্টিং অ্যাকট্রেস হিসাবে পুরস্কার পান। 'দুই পুরুষ' শিল্পীর শেষ ছবি। অভিনেত্রী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিতা করতে যাঁদের কাছে সব সময় উৎসাহ পেয়েছেন তাঁরা হলেন বিমল রায়, মধু বসু, সুশীল মজুমদার, এবং তাঁর স্বামী গোপেন মল্লিক। বিয়ের পর শ্বশুর বাড়ির কেউ রেখাদেবীর অভিনেত্রী জীবনকে ভাল চোখে দেখেনি। সারাদিন শুটিং করে বাড়িতে পা দেওয়ার মুহূর্ত থেকেই তাঁকে প্রতিদিন বিশ্রী, নোংরা কথা শুনতে হত। অভিনয়কে জীবনের চেয়ে ভালবাসতেন তাই শত অপমান মাথায় নিয়ে অভিনয় জীবনকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে অভিনয় ছাড়তে বাধ্য হলেন একদিন, তা না হলে সংসার ভেঙে যেত।

শ্রীমতী রেখাদেবীর মতে তখনকার শিল্পীরা অভিনয়কে সাধনা ভাবত, ভাবত ঈশ্বরের পূজা।

নিঃসন্তান শিল্পীর জীবন ভীষণ একাকিত্বময়। সারাদিন সংসার নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে চান। তবু হঠাৎ মাঝে মাঝে মনে পড়ে পুরনোদিনের ফেলে আসা সেই কর্মময় সুন্দর জীবনটার কথা। বুকে যন্ত্রণা হয়, দু-চোখে জল ভরে ওঠে। কী পেয়েছেন, আর কী পাননি তাঁর হিসাব এত বছর পরে আজও অভিনেত্রী রেখা মল্লিক মেলাতে পারেননি। □

শর্মিষ্ঠা চট্টোপাধ্যায়


দিনে দু'বার...
শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা—যে কোন ঋতুতেই বোরোটোন-ই
আপনার ত্বকের একমাত্র রক্ষক।
কে এম পি
বোরো টোন
অ্যান্টিসেপ্‌টিক ক্রীম
যা এতটুকু চট্‌চটে নয়,
অস্বস্তিকর নয়—যার সযত্ন
ছোঁয়া সারিয়ে তোলে কাটা-ছেঁড়া,
মিলিয়ে দেয় ছোপ দাগ, আর
আপনার ত্বক ফিরে পায় তার
সজীবতা, উজ্জ্বলতা ও
কোমলতা।
KMP
BORO TONE
বোরোটোন-
সজীব ও সুন্দর
ত্বকের একমাত্র
প্রতিশ্রুতি
কে এম পি
আয়ুর্বেদিক
রিসার্চ সেন্টার
১ই বর্মন স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭

সংস্কৃতি সংবাদ ও আলোচনা

কোমল গান্ধার-এর রাজটিকা

এই সময়কার গ্রুপ-থিয়েটার-গুলির মঞ্চ প্রযোজনায় রবীন্দ্রনাথের নাটক বা নাট্যরূপ খুব বেশি দেখা যায় না। যেটুকু দেখা যায় তাতেও কেমন যেন একটা দায় মেটানোর ভাব থাকে। কোমল গান্ধার নাট্য-সংস্থাকে ধন্যবাদ, তাঁরা শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা নিয়ে কয়েক বছর ধরেই রবীন্দ্র-নাটক মঞ্চস্থ করছেন। 'দৃষ্টিদান' ও 'ল্যাবরেটরি' নাটক-দুটির পর সংস্থার সাম্প্রতিকতম প্রযোজনা 'রাজটিকা'। রবীন্দ্র-কাহিনীর নাট্যরূপ করেছেন সুধাংশু দাশগুপ্ত। নাট্যকারের কৃতিত্ব তিনি এই নাটকের কোথাও অযাচিত



'রাজটিকা'র একটি দৃশ্য

আবেগকে প্রশ্রয় দেননি। রাবীন্দ্রিক ভাবনাকে সম্পূর্ণ অক্ষত রেখেই নাট্যরূপকে তিনি রসোত্তীর্ণ করার চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্র-কাহিনীর নাট্যরূপে এই দায়িত্ববোধের ইঙ্গিত স্বীকৃতি পাবার যোগ্য। শুভেন্দু মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় শিশির মঞ্চে সংস্থার প্রযোজনাটি সম্প্রতি মঞ্চস্থ হল।

জমিদার নবেন্দুশেখরের বাবা ইংরেজদের সেবা করে রায় বাহাদুর হয়েছিলেন। ইংরেজ-ভজনার পথ ধরেই নবেন্দুরও সব সময়ের চেষ্টা কেমন করে রায় বাহাদুর হবে। কিন্তু ব্যাপারটা ওর স্ত্রী অরুণলেখার মোটেই পছন্দ নয়। বড় শালিকা লাবণ্যলেখাও নবেন্দুকে ইংরেজ ভজনার পথ থেকে যে কোনোভাবে সরাতে চাইল। তার স্বামী নীল-রতন বস্কারে বড় উকিল। সুরেন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেসের হাল ধরার পর তিনি কংগ্রেসে নাম লিখিয়েছিলেন। অরুণলেখা, লাবণ্যলেখা ও নীলরতনের প্রভাবে নবেন্দু এক সময় কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকলো। কংগ্রেসকে তাঁর মোটা টাকা চাঁদা দেওয়ার খবরটা কাগজে ফাঁস হয়ে যেতেই নবেন্দু কিছুটা অসুবিধায় পড়ে গেল। কারণ গোপনে সে আগের মতই ইংরেজদের সেবা চালিয়ে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত মহারাণীর জন্মদিনে খেতাবের যে লিস্ট বেরোল তাতে নবেন্দুর নাম ছিল না। নাটকের কাহিনী মোটামুটি এইরকম। আসলে আলোচ্য নাটকটিতে রবীন্দ্রনাথ উনিশ শতকের সেই সময়টাকে ধরতে চেয়েছেন যখন একদিকে কিছু মানুষ ইংরেজদের দেওয়া খেতাব পাবার আশায় দিন গুনছিলেন, অন্যদিকে আর একদল মানুষ কংগ্রেসে নাম লিখিয়ে দেশ-প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। 'রাজটিকা'কে সেই বিশেষ সন্ধি-কালের একটা দলিল বলা যায়, যদিও ব্যঙ্গপ্রধান কমেডির আঙ্গিকে নাটকটি পরিবেশন করা হয়েছে।

এই নাটকে শ্রেষ্ঠ অভিনয় অরুণলেখা চরিত্রে বন্যা দাশগুপ্তর। তিনি যে দক্ষতায় চরিত্রটিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন তা সঙ্গত কারণেই দর্শককে অবাক করেছে। প্রতিটি সংলাপ উচ্চারণে তাঁর কন্ঠের স্বাভাবিক ব্যাপ্তিও বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। আগাগোড়া তাঁর প্রাণবন্ত অভিনয় প্রযোজনাটি ভাল লাগার একটা প্রধান কারণ। নীলরতনের ভূমিকায় সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, লাবণ্যলেখা চরিত্রে পর্ণা বন্দ্যো-পাধ্যায় ও নবেন্দুর ভূমিকায় সুমন বন্দ্যোপাধ্যায়ও বেশ পরিচ্ছন্ন। সৌমেন সেনের দ্বিতীয় নবেন্দু এবং জগদীশ মুখোপাধ্যায়ের আর্দালি চরিত্র দুটি নাটকের মেজাজে তৈরি। প্রযোজনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এ'রা সুন্দর মানিয়ে গেছেন। শুভাশিস মিত্র, অশোক সরকার, সম্বুদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুপ্রিয় গুপ্ত, আর্তবন্ধু ভট্টাচার্য, দেবাশিস চট্টোপাধ্যায় প্রমুখদের অভিনয় আরো কিছু পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে।

ত্রুটি প্রসঙ্গে বলি, এই ধরনের কমেডিধর্মী নাটক আরো গতিশীল হওয়া দরকার, না হলে কাহিনীর ধারাবাহিকতা দর্শক-মনে যথাযথ প্রতিষ্ঠা পায় না—স্বভাবতই নাটকের কিছু কিছু অংশকে বিচ্ছিন্ন চটকের মত লাগে। মিনু চৌধুরীর আলোক-সম্পাতে মহলার অভাব স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে। নেপথ্যে আবহ সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত না হওয়ায় অভিনেতা অভিনেত্রীদের গানও সবক্ষেত্রে সঙ্গতি রক্ষা করেনি। এসব ত্রুটি, তবুও বলতে দ্বিধা নেই কলকাতার গ্রুপ থিয়েটার সংস্থার এরকম দায়িত্বশীল প্রযোজনা ইদানীংকালের মঞ্চে বিরল।

রাগিণী ভান্ডারী ও একটি সন্ধ্যা

সেদিন কলামন্দির বেসমেন্ট হলের মঞ্চটি রঙবেরঙের নানান ফুল দিয়ে ছিমছাম সাজানো। প্রতিদিনকার গতানুগতিক আলোর চেয়ে প্রেক্ষাগৃহে একটু অন্যরকমের আলো। এমনি সুন্দর পরিবেশে মঞ্চে মাইক্রোফোনের সামনে বসে আছেন সংগীত শিল্পী রাগিণী ভান্ডারী। পরনে হাল্কা সবুজ রঙের সিন্থেটিক শাড়ি, ম্যাচিং ব্লাউজ, ছিমছাম ঘরোয়া গয়না, ঠোঁটে গাঢ় গোলাপী লিপস্টিকের ছোঁয়া, মুখে কিছুটা প্রসাধনের ছাপ। গায়ের রঙ টকটকে ফরসা, হাসি জড়ানো দুটো চোখের দৃষ্টি। পর্দা উঠতেই শিল্পী কপালে হাত স্পর্শ করে স্বাগত জানালেন প্রেক্ষা-গৃহে উপস্থিত শ্রোতাদের। দৃষ্টি-নন্দন এই বিনম্র অভিব্যক্তিটুকুতেই সারা অনুষ্ঠানের একটা আভাস মিলল। মিসেস বারি, এই আসরের আয়োজক সংস্থা 'বারি অ্যাড-ভার্টাইজিং'-এর তরফ থেকে এক-গুচ্ছ ফুল দিয়ে শিল্পীকে সংবর্ধিত করলেন। দেড় ঘন্টাব্যাপী একক এই সংগীতানুষ্ঠানের শিরোনাম ছিল 'শাম-ই-গজল।'

শুরু নির্ধারিত সময় সাতটার বদলে সাতটা চল্লিশে। মাই-ক্রোফোনে ভেসে এল মহম্মদ বারির গমগমে কন্ঠস্বর। তিনি স্বল্প ভাষণে উপস্থিত সকলের সঙ্গে পরিচিত করালেন শিল্পীকে। এরপর শুরু হল মূল অনুষ্ঠান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাগিণী ভান্ডারী উচ্চাঙ্গ সংগীতের তালিম নিয়েছেন সংগীতাচার্য এ টি কাননের কাছে।

তিনি আসর শুরু করলেন ইমন কল্যাণ রাগে নিবদ্ধ 'আপনে দিল সে' গানটি দিয়ে। প্রথমেই বলে রাখি শিল্পীর কন্ঠটি মধুর কিন্তু তেমন সুরে বাঁধা নয়। অবশ্য এক ধরনের সপ্রতিভ বৈঠকী ঢঙ তাঁর পরিবেশনে প্রতি মুহূর্তেই ফুটে উঠেছে। সেই মজলিসী গায়ন-ভঙ্গি দিয়ে তিনি অনায়াসে শ্রোতাদের চমকিত করেছেন, একেবারে অন্য রকমের স্ফূর্তিতে প্রত্যাশা জাগাতে পেরেছেন। তাঁর পরিবেশনের বেশি অংশটা জুড়েই ছিল গজল। একটি রাগপ্রধান ও দুটি পাঞ্জাবী লোকগীতিও তিনি শোনালেন। শুরু থেকেই চমৎকার মেজাজ ছিল তাঁর গানে। কেদার রাগে 'তুম পুছ আউর ম্যায় না বতাউঁ' গানটি আবিষ্ট করেছিল শ্রোতাদের। এরপর আহির ভৈরব রাগে 'দম দমনে সরাব পিয়ে' পাঞ্জাবী গীতিটি মন করে তুলেছিল পরিবেশকে। স্বরচিত গান 'তুম সে কামাল তেরি' তেও সেই রেশ বজায় ছিল। মোট চোদ্দটি গান পরিবেশন করলেন তিনি। এর মধ্যে কয়েকটি গানেই শিল্পী প্রার্থিত রস সঞ্চারে সফল হয়েছেন। তার গানের ত্রুটি প্রসঙ্গে বলি, গলার কম্পন সম্পর্কে তাঁকে সচেতন হতে হবে। তার সপ্তকে সুরের ঘাটতিটুকুকে অনু-শীলন দিয়ে পূরণ করতে হবে। আর সবশেষে একটা কথা সবিন...

নিবেদন করি গান গাইবার সময় মাঝে মাঝে তাঁর মুখ অহেতুকই হাস্যোজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মঞ্চে এই ভঙ্গিটি খুবই দৃষ্টিকটু।

বিশু রায়, সুভাষ চট্টোপাধ্যায়, অমর দাস, সুপ্রিয় ভক্ত, অরুণ ভট্টাচার্য এবং রামলাল মিত্র এই আসরে শিল্পীর সঙ্গে যন্ত্রানুষঙ্গে সহযোগিতা করলেন। আক্ষেপের কথা, যন্ত্রসংগীত শিল্পীদের নাম আয়োজক সংস্থা কিংবা শিল্পীর পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হল না।

অমল মুখোপাধ্যায়

'রঞ্জনা'র গোরা

'রঞ্জনা—আকাদমী অফ পারফর্মিং আর্টস' ইতোমধ্যে বেশ কিছু গুরুগম্ভীর এবং সুরুচিপূর্ণ অনুষ্ঠান পরিবেশন করেছে। এবারে, কবিগুরুর ১২৫তম জন্মবার্ষিকীতে এদের সশ্রদ্ধ নিবেদন 'গোরা'।



'গোরা' নাটকের একটি দৃশ্য

জি ডি বিড়লা সভাগৃহের মনোরম পরিবেশে সেদিন অনুষ্ঠান শুরু হল রবীন্দ্রসংগীত দিয়ে। সংগীতের এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানটি পরিবেশন করলেন তিনজন শিল্পী। এঁরা তিনজনেই সুকণ্ঠের অধিকারী এবং গায়কী ঢঙ স্বচ্ছন্দ।

বিরতির পর শুরু হল নাটক 'গোরা'। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত উপন্যাস 'গোরা'-কে মঞ্চস্থ করার সাহস খুবই প্রশংসনীয়। নির্দেশক সুবীর মিত্র এই গুরুগম্ভীর উপন্যাসের যে সহজ, সাবলীল ও মনোজ্ঞ নাট্যরূপ দান করেন, তা সত্যিই কৃতিত্বের দাবি রাখে। তাঁর নির্দেশনায় কিঞ্চিৎ ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল। তা সত্ত্বেও কলাকুশলীদের দিয়ে সংযত ও হৃদয়গ্রাহী অভিনয়ের কাজটি তিনি আদায় করেছেন। কয়েকটি কম্পোজিশন তো অসাধারণ; বিশেষত শেষ দৃশ্যের আগের দৃশ্যে, নিজের জন্মবৃত্তান্ত জানতে পেরে গোরা যেখানে জাত-ধর্ম মুছে ফেলে নিজেকে সঁপে দিচ্ছেন, সেই কম্পোজিশন দর্শক বহুদিন মনে রাখবে। এবারে অভিনেতা অভিনেত্রীদের কথায় আসা যাক। গোরা-র চরিত্রে সৌমেন ভট্টাচার্যকে চেহারায় মানিয়ে গেলেও, চরিত্রের সঙ্গে তিনি একাত্ম হতে পারেননি। তিনি খুব আড়ষ্ট এবং সচেতন হয়ে পড়ছিলেন। মাঝে মাঝে সংলাপও জড়িয়ে যাচ্ছিল'। এ বিষয়ে তাঁকে আর একটু যত্ন নিতে বলি। সমীরণ চৌধুরীর বিনয় সু-অভিনীত। রামানন্দ রায়ের পরেশ এবং শান্তনু রায়ের পানুবাবু খুবই চরিত্রানুগ এবং উপভোগ্য। শিশু অভিনেতা সৈকত মিত্রের সতীশ অত্যন্ত সাবলীল। তনুকা ভট্টাচার্যের সংবেদনশীল, মনোজ্ঞ অভিনয়ে 'সুচরিতা' ও চিত্রলেখা বসু উইলিয়ামের প্রাণবন্ত এবং সাবলীল অভিনয়ে 'ললিতা' নাটকটিকে কৃতিত্বের শিখরে পৌঁছে দেয়।

পরিশেষে নির্দেশককে একটি কথা। সেদিনের সন্ধ্যাটি যথেষ্ট উপভোগ্য হলেও আলোকসম্পাত ও ধ্বনি সংযোজনের দিকে আর একটু মন দেবার দরকার ছিল।

অনামিকা

অ্যালিয়াঁস ফ্রাঁসেজ-এর সেতার নিবেদন

সম্প্রতি কলকাতার অ্যালিয়াঁস ফ্রাঁসেজ নিজস্ব প্রেক্ষাগৃহে নিবেদন করলেন একটি সেতার-সন্ধ্যা। শিল্পী ছিলেন অঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। অঞ্জন এখনকার তরুণ সেতারবাদকের মধ্যে প্রতিভাবান সন্দেহ নেই, সে-প্রতিভার পরিচয়ও উনি দিয়েছেন আগের কিছু অনুষ্ঠানে। 'সারা বাংলা সংগীত প্রতিযোগিতা'য় এ বছর অঞ্জন দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন সেতার বাজিয়ে। এটাও কম কৃতিত্বের কথা নয়। অঞ্জনের সেতারতালিম শুরু হয় দাদা গৌরীশংকরের কাছে। তারপর এখন পর্যন্ত তিনি তালিম নিচ্ছেন বিলায়েত-খানএর ছাত্রী প্রখ্যাত সেতার-বাদিকা শ্রীমতী কল্যাণী রায়ের কাছে। এছাড়া ওস্তাদ সৌকত আলি খানের কাছেও অঞ্জন লয় ও তালের তালিম নিয়ে চলেছেন। অঞ্জনের বাদনে পরিষ্কারভাবে কল্যাণী রায়ের বাদন-শৈলীর প্রভাব।

এদিনকার অনুষ্ঠানে অঞ্জন পরিবেশন করলেন রাগ ইমন। আলাপ - জোড়- ঝালা- গৎ-বিস্তার এবং যথারীতি বিলম্বিত ও দ্রুত তিনতালে নিবদ্ধ। আলাপে শিল্পী সুন্দর করে ইমনের মেজাজ ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। নি রে সা কিংবা নি রে গা ক্ষ রে সা নি ক্ষ প পর্দার উপর দিয়ে তাঁর অঙ্গুলি চালনা অদ্ভুত সহজ ও সুন্দরভাবে রাগরূপ পরিস্ফুট করে তুলেছে। কিংবা গতের মুখরা-য় গ ক্ষ ধ নি র' র্স-র ব্যবহার সুরকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। উদারার ক্ষ থেকে তারার পঞ্চম, মুদারার নি রে থেকে তারার ক্ষ—এমনভাবেই অঞ্জনের অঙ্গুলীচালনা অবাধ, অনায়াস। শিল্পীর তানকারী সপাট ও শ্রুতিমধুর। তবে কোনো কোনো তান-বিস্তারে বেশি মাত্রায় দুঃসাহসী হতে গিয়ে শিল্পী কখনও কখনও বেসুরো হয়েছেন। এটা অবশ্যই সংশোধনীয়। অঞ্জনের মীড়ের কাজ খুব সূক্ষ্ম ও হৃদয়স্পর্শী। তারার র্গ থেকে সুর নেমে আসে মুদারার ক্ষ-তে কি এক অদ্ভুত নমনীয়তায়। কিংবা গমকে গমকে যখন গ ক্ষপ নিরে গা গুমরে ওঠে, তখন শিল্পীর তারিফ না করে পারা যায় না। কিন্তু মধুর আলাপের মত রাগের পরিসমাপ্তি অতটা আকর্ষণীয় হয়ে ওঠেনি, যার জন্য মনে আক্ষেপ থেকেই যায়। এটা সম্ভবত তবলিয়ার সঙ্গে ঠিকমত সমঝোতা না হওয়ায় ঘটে গেছে। সঙ্গতকার অভিজিৎ ব্যানার্জি তরুণ প্রতিভাবান তবলা-বাদক হিসাবে পরিচিত। জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের সুযোগ্য ছাত্র ইনি। তবে শুরুতে তাঁর লয়কারী যেন কেমন ঝিমুনি মেরেছিল। তাঁর দক্ষতার পরিচয় পাওয়া গেল দ্রুত লয় থেকে। তাঁর টুকরা ও তেহাই খুব স্পষ্ট। তাল ভাঙ্গায় তিনি মাঝেমধ্যে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছেন শ্রোতাদের। তবে শিল্পীর দক্ষতা অনুযায়ী ডাঁয়া-র চাঁটি আরও সপাট হওয়া উচিত ছিল। তাহলে হয়ত অনুষ্ঠানটি আরও আকর্ষণীয় এবং মধুরেণ সমাপয়েৎ হত।

পরেশ সেনগুপ্ত

কুসংস্কারের নাগপাশে দেশ-বিদেশের মেয়েরা

সাড়ে চুয়াত্তর ও ভাঙা আয়না

অফিসে খামে আঁটা একটা চিঠি এসেছে অনিল রায়ের নামে। অথচ অনিল রায় তিনচার দিন ধরে ডুব মেরেছেন – অফিসে আসেননি। চিঠিটা এ টেবিল ও থেকে টেবিলে ঘুরছে। অবশেষে অনিল রায়ের পাশেই বসেন মাখন পাল, তাঁর টেবিলেই সেটা রেখে দেওয়া হল।

মাখন পাল চিঠিটার দিকে তাকিয়ে বললেন, মেয়েলি হাতের লেখা মনে হচ্ছে। খুলে দেখবো নাকি ?

ওদিক থেকে ফোঁস করে উঠলেন পরেশ নন্দী। বললেন, শখ তো কম নয়। খামের পেছন দিকটা উলটে দেখেছো। সাড়ে চুয়াত্তর লেখা রয়েছে অংক দিয়ে। মালিক ছাড়া অপরে খুললেই সাড়ে চুয়াত্তরের ধাক্কায় তাকে একেবারে নক আউট করে দেবে।

মাখন পাল বললেন, ওসব মেয়েলি আচার ছাড়ো তো। মেয়েরাই স্বামীর কাছে বা তাদের বন্ধুর কাছে চিঠি লিখলে খাম বন্ধ করে পেছনের দিকে সাড়ে চুয়াত্তর লিখে দেয়। অনিলের বউ হয়তো বাপের বাড়ি গেছে। বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে সেখান থেকেই চিঠি লিখেছে স্বামীকে। পাছে অন্য কেউ খুলে দেখে তাই ওটা লিখে দিয়েছে।

পেছন থেকে কানাই সামন্ত বললেন, সে তো মান্ধাতা আমলের সংস্কার। এখনো আছে নাকি ?

পরেশ নন্দী বললেন, থাকবে না কেন ? রাখলেই আছে, আবার না রাখলেই নেই। বাড়িতে তো বাথরুমে গেলে মায়ের জ্বালায় আমাকে কাপড় চোপড় ধুয়ে আসতে হয়। কী জ্বালা বল তো। অথচ অফিসে বাথরুমে গেলে ওসব নিয়ম আচার মানছে কে ?

সত্যি বিচিত্র ব্যাপার। কতকাল আগের কথা। উদয়সিংহ তখন মেবারের রাণা। মোগল সম্রাট আকবর মেবারের রাজধানী চিতোর আক্রমণ করলেন।উদয় সিংহ পালিয়ে গেলেন রাজ্য ছেড়ে। পুত্র বসলেন সিংহাসনে। যুদ্ধ করতে গিয়ে মোগল সৈন্যদের হাতে পুত্র নিহত হলেন। এরপর দেশরক্ষার ভার গ্রহণ করলেন জয়মল্ল। প্রবল যুদ্ধ হল। আকবর অন্যায়ভাবে জয়মল্লকে হত্যা করলেন। এরপর চিতোর রক্ষার জন্য কেউ আর রইল না। অসংখ্য রাজপুত সেনা ও মেবারবাসী মোগল সৈন্যদের হাতে নিহত হল।

জয়ের উল্লাসে উন্মত্ত আকবর যুদ্ধে যত রাজপুত নিহত হয়েছিল তাদের পৈতা খুলে ওজন করালেন। সমস্ত পৈতার ওজন হল সাড়ে চুয়াত্তর মন। তারপর থেকে রাজস্থানে একটা নিয়ম হল খামে আঁটা চিঠির উলটো দিকে সাড়ে চুয়াত্তর লেখার। ওটা লেখা থাকলে যার পত্র সে ভিন্ন অন্য কেউ খুললে তাকে চিতোরের ওই সব নরহত্যার পাপ স্পর্শ করবে। ক্রমে তা একটি সংস্কারে পরিণত হল। বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে। শুধু রাজস্থান নয়, ভারতের সব অঞ্চলেই তা ছড়িয়ে পড়ল।

সাড়ে চুয়াত্তর মন যদি পৈতার ওজন হয় তা হলে যে মোগলদের হাতে কত রাজপুত নিহত হয়েছিল তার সংখ্যা গণনা করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। অনেকে বলেন তখন নাকি দশ সেরে এক মন হত। তবু কিন্তু সংখ্যাটি নগণ্য নয়।

এ বিষয়ে অন্য একটি আখ্যায়িকাও পাওয়া যায়। চিতোরের পতনের পর রাজপুত রমণীরা মোগলদের হাতে অবমাননা থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য জহরব্রত পালন করে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন। সেই সমস্ত রমণীদের পরিত্যক্ত অলংকাররাশির ওজন হয়েছিল সাড়ে চুয়াত্তর মন। এই উভয় ঘটনার যেটাই সত্য হোক না কেন, সেই সময় হতেই সাড়ে চুয়াত্তরের প্রচলন। বর্তমানেও তা অনেক মেয়েদের সংস্কার।



ভূতপ্রেতে কিন্তু সব দেশেই পুরুষদের চেয়ে মেয়েরাই বেশি বিশ্বাস করে। বাড়ির মা ঠাকুরমা ছোট ছেলেমেয়েদের বলেন, ওখানে যাস্ না, ভূতে ধরবে। ছোটবেলায় বিধানচন্দ্র রায়কে তাঁর মা বাড়ির একটা অন্ধকার জায়গার দিকে দেখিয়ে বলতেন – ওখানে ভূত আছে। বিধানচন্দ্র বিশ্বাস করতেন। বড় হবার পর অবশ্য তাঁর সেই ভয় কেটে গিয়েছিল।

আমাদের দেশের মেয়েদের চেয়ে কিন্তু পারস্যের মেয়েদের ভূতপ্রেত ও দানোতে বিশ্বাস আরও বেশি। তাদের ধারণা ভূতেরা কবরস্থান, পোড়ো বাড়ি ও জঙ্গলের নির্জনে বাস করে। তারা পথিকদের পথ ভুলিয়ে দেয়, এমনকি কখনও কখনও মেরে ফেলে তাদের মাংস খায়। ভূতের ভয়ে কোন নারী একলা শোয় না, বাসি খাবার খায় না। বাসি খাবার ভূতে দেখতে পেলে নাকি সেটাকে বিষে পরিণত করে দেয়। পারসিকেরা কুকুর বিড়াল হত্যা করে না, কারণ অনেক সময় তাদের মধ্যে জিন এবং আফরিটস্‌রা বাস করে। তারা দেহ ছাড়া হলে হত্যাকারীর অমংগল হয়। কারমাল অঞ্চলে লোকের বিশ্বাস যে সোমবারে সাপ মারলে পাশের বাড়ির কেউ না কেউ মরে যাবে। চড়ুই পাখিকে কিন্তু মেয়ে পুরুষ সবাই ভাল চোখে দেখে। মেয়েদের চোখে পেঁচা খুব ঘৃণ্য প্রাণী। তারা স্বপ্নকে খুব বিশ্বাস করে।

বুধবার পারস্যবাসীদের কাছে অশুভ দিন। তাদের বিশ্বাস এইদিন পৃথিবীর শেষ বিচার হবে। এই দিনে তারা কারুর

সংগে ঝগড়া বিবাদ করা থেকে দূরে থাকে। আগে বুধবার সবাই ঘরের বাইরে কাটাত। এখন সেই প্রথা আর নেই।

দূরদেশে যাত্রা করার কিছুদিন আগে থেকে পারস্য দেশের নারীরা দান খয়রাত করে। তাদের ধারণা তাতে পথের বিপদ দূর হয়। যাত্রার দিন বাড়ির ভৃত্য প্রভৃপত্নীকে আয়না দেখায়। একটি পাত্রে জল রেখে তাতে ফুল ভাসিয়ে যাত্রাকারীর সামনে ধরে। তা ছাড়াও এক রকমের লতা পোড়ায়। এরকম করলে নাকি পথে কোন বিপদ ঘটে না। যাত্রার সময় কেউ হাঁচলে কিন্তু সেদিনের মত যাত্রা বন্ধ হয়ে যায়। আবার সময় বিশেষে হাঁচিকে শুভদায়ক হিসাবে বিবেচনা করে তারা। কেউ কোন কিছু মনে মনে কামনা করছে, এমন সময় কেউ যদি হাঁচে তা হলে তার মনে আশ্বাস জাগে তার মনস্কামনা পূর্ণ হবে।

কিন্তু সে দেশের একটা ব্যাপার বড় অদ্ভুত। শনিবারে কোন বন্ধু বাড়ি এলে সে সোমবারের আগে যেতে পারবে না। মংগলবার এলে বৃহস্পতিবার এবং বৃহস্পতিবার এলে শুক্রবার সেই বাড়ি থেকে যেতে পারে। এর পেছনে গৃহিণীদের যুক্তি হল, সেই নিয়ম পালন না করলে গৃহের অকল্যাণ হয়। কিন্তু স্ত্রীর বন্ধু বাড়ি এলেই হয় বিষম বিপদ। যতদিন সে বাড়িতে থাকে স্বামী বেচারীকে ঘরের বাইরে কাটাতে হয়।

অন্য দেশে কুসংস্কার দেখলে আমরা যেমন উপভোগ করি, নিজের দেশের কোন কুসংস্কারের জন্য আমাদের কম জ্বালাতন ভোগ করতে হয় না। কারুর হাত থেকে মুখ-দেখার আয়না ভেঙে গেলে মেয়েরা চেঁচিয়ে ওঠেন — আজ নিশ্চয়ই সংসারের কোন অকল্যাণ হবে।

শুধু ভেঙে গেলেই হল না, সেই ভাঙা আয়নার টুকরো বাড়ি থেকে সরিয়ে চোখের আড়াল করে দিতে হবে। বিশেষ করে বাড়ির মা বা ঠাকুরমারাই এই ফরমান জারি করেন।

বাড়ির কোন ছেলে হয়তো এই কুসংস্কার মানতে রাজি নয়। সে চ্যালেঞ্জ করে বলবে — আয়না ভেঙেছে তাতে ক্ষতিটা হয়েছে কি? আর একটা আয়না কিনে আনলেই চলবে।

মা অথবা ঠাকুরমা তখনই জবাব দেবেন 'কিনে আনলেই কি হল পয়সা দিয়ে কি অমংগল ঢাকা যায়

— কী অমংগল? কোন শাস্ত্রে তা লেখা আছে



বাড়ির মেয়েরা জবাব দেবেন — শাস্ত্র-টাস্ত্র অতসব বুঝিনে বাপু। লোকে বলে তাই জানি। আয়না ভাঙলে নাকি বাড়ির কারুর খুব কঠিন অসুখ হয়। কিন্তু আর একটা অন্ধ বিশ্বাস তাঁরা মনে পুষে রাখেন, সেটা প্রকাশ করেন না পারতপক্ষে। কথাটা খুবই মারাত্মক। হাত থেকে আয়না পড়ে ভেঙে গেলে বাড়ির কারুর না কারুর অকালমৃত্যু ঘটে।

কী ভয়ংকর ব্যাপার। আজগুবিও বটে। বিজ্ঞানের এত উন্নতি হচ্ছে, পৃথিবী দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে, তবু মন থেকে পুরনো জিনিসটা যাচ্ছে না কেন? অতি প্রাচীনকালে পৃথিবীতে আয়না ছিল না। জলের উপর মুখ রেখে মানুষ নাকি নিজের প্রতিবিম্ব দেখত। সেটাকেই সে মনে করত তার সত্তা — তার নিজের আত্মা। তারপর আয়নার আবিষ্কার হল। কিন্তু সব মানুষের মনে ধারণা পালটাল না। তাই কেউ আয়না ভাঙলে মনে করত, সে নিজের আত্মাকেই ভেঙে ফেলছে। তখন এই আশংকাই মনে জেগে উঠত, তার আত্মা বুঝি শিগগিরই দেহ ছেড়ে চলে যাবে।

অন্ধ বিশ্বাস আর কুসংস্কারের কি শেষ আছে? আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার কয়েকটি উপজাতি চাঁদকে পূজা করে। তারা মনে করে চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি জীবনের সুখসমৃদ্ধি ও দুঃখের কারণ। দক্ষিণ আমেরিকার কয়েকটি দেশের আদিম আধিবাসীদের ধারণা বর্ধিষ্ণু চন্দ্রের সংগে স্বাস্থ্য ও আয়ুর যোগ আছে। তাই নবজাত শিশুকে তাদের মায়েরা চাঁদের আলোতে শুইয়ে রাখে।

আমরা ছোটবেলায় দেখতুম বাড়ির মেয়েরা বিশেষ করে ঠাকুরমা দিদিমারা চন্দ্রগ্রহণ চলাকালীন, সবাইকে খেতে নিষেধ করতেন, এমনকি মলমূত্র ত্যাগ করতেও বারণ করতেন। সেই সময়ে আর একটি ব্যাপার চোখে পড়ত, খোল করতাল কাঁসি বাজিয়ে উচ্চস্বরে খোলা মাঠে বা বাড়ির আঙিনায় কীর্তন করা হচ্ছে। ঠাকুরমাদের জিজ্ঞেস করলে তাঁরা বলতেন, রাহু চাঁদকে গিলে ফেলে কি না, তাই রাহুকে ভয় দেখিয়ে তাড়াবার জন্যই এসব করতে হয়।

বিজ্ঞান বলে, পৃথিবী ঘুরতে ঘুরতে চন্দ্র ও সূর্যের মাঝখানে এলেই হয় চন্দ্রগ্রহণ। অনেক দেশের লোকের ধারণা চন্দ্র ঘুমিয়ে পড়লেই অমন হয়। গ্রহণের সময় ঢাক ঢোল বাজানো ও হই হল্লা চেঁচামেচি করা হয় চাঁদের ঘুম ভাঙাবার জন্য।

অনেকের ধারণা কারুর বাঁ কাঁধের উপর দিয়ে অমাবস্যার চাঁদ দেখাটা দুর্ভাগ্যজনক। তখন রৌপ্যমুদ্রা বা চাঁদির জিনিস স্পর্শ করে সেই দুর্ভাগ্যকে প্রতিহত করতে হয়।

চন্দ্রকে লাতিন ভাষায় বলা হয় 'লুনার'। এই লুনা থেকে লুনাসি শব্দ এসেছে যার অর্থ হল উন্মাদ। লোকের বিশ্বাস অনেকক্ষণ চন্দ্রদর্শনে কিংবা চন্দ্রকিরণে ঘুমোলে মানুষ উন্মাদ হয়ে যায়। চন্দ্রের ছায়া মাড়ালেও নাকি অশুভ। তাই কোন কোন দেশের মায়েরা যেমন শিশুকে চাঁদের আলোতে মনের আনন্দে শুইয়ে রাখে আবার কোন কোন দেশের মায়েরা সেটা করতে ভয় পায়।

ম্যাডাগাস্কারে সন্তানকে সাধারণত দুই বছর বা চার বছর মায়ের দুধ খাওয়ানো হয়। মায়েরা সন্তানকে পিঠে বহন করে। সন্তান বড় হবার পর সে তার মাকে একটা মুদ্রা দেয়। সেই মুদ্রা দেওয়ার অর্থ ছেলেবেলায় মা যে তাকে পিঠে করে বহন করেছে, বুকের দুধ খাইয়েছে — তার মূল্য প্রদান। এর পর থেকে মায়ের সংগে ছেলের সম্পর্ক প্রায় ছিন্ন হয়ে যায়। ওই দ্বীপের ইমারিনা জাতির মধ্যেই এটা বেশি প্রচলিত।

আমাদের দেশের মায়েরা যেমন শিশুদের জুজুবুড়ির ভয় দেখায় তেমনি এস্কিমো দেশের মায়েরা তাদের ছেলেমেয়েদের ভয় দেখায় 'বগি' নাম শুনিয়ে। জুজুবুড়ি বলে অবশ্য কোন কিছুই নেই, এটা নেহাত কল্পনা। কিন্তু বগি বলে কিছু আছে। সাদা ভালুককে ওদেশে

বগি বলে। বগিকে খুব ভয় পায় এস্‌কিমো শিশুরা। মায়েদের এই ভয় দেখানোর ফলে কোন কোন ছেলেমেয়ের সাহসী হয়ে উঠতে অনেক দেরি হয়ে যায়।

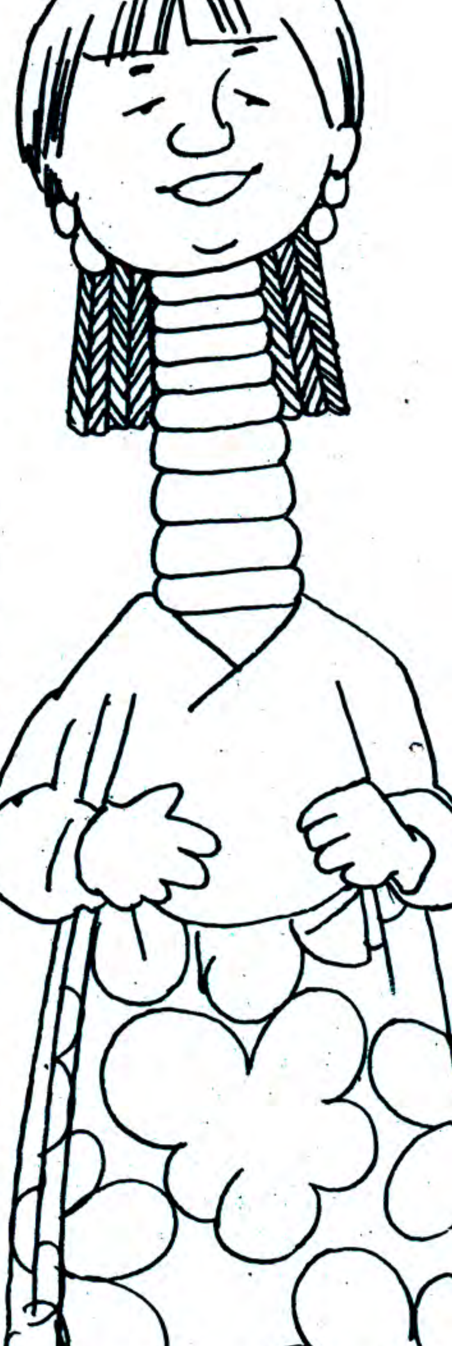
অস্ট্রেলিয়ার মাওরি মেয়েরা সাধারণত সুন্দরী হয়। কিন্তু তারা ইচ্ছা করলেই কাউকে পছন্দ করে বিয়ে করতে পারে না। প্রার্থীদের মধ্যে লড়াই হয়। সেই লড়াইকে বলা হয় .'হা-কাহাকা'-তামাহাইন' অর্থাৎ কনে-শিকার।

কনে শিকার করারও একটা নিয়ম আছে। কনেকে প্রথমে একটি ডিঙির মধ্যে বসানো হয়। তারপর তার ভাই ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনরা সেই ডিঙিতে চড়ে এবং দাঁড় ও বৈঠা নিয়ে তা চালিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত থাকে। আর ওদিকে যে কয়জন প্রার্থী মেয়ের জন্য উপস্থিত হয়, তারাও প্রত্যেকে এক একখানা ডিঙি করে সার বেঁধে দাঁড়ায়। প্রত্যেক ছেলের নৌকোয় পাঁচজন করে লোক থাকে, তার মধ্যে প্রধান হবে ছেলে। প্রত্যেক প্রার্থীর ডিঙির মধ্যে মেয়ের জন্য একটি আসন পৃথক করে রাখা হয়। যদি কনেকে লাভ করা যায় তা হলে তাকে সেখানে বসানো হবে।

এদিকে মেয়ের ডিঙি কতকটা এগিয়ে দাঁড়াবে, আর ছেলেদের নৌকো থাকবে তার পেছনে সার বেঁধে। ঘণ্টা পড়লে নৌকো চলতে থাকবে। নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছবার মধ্যে মেয়েকে মেয়ের ডিঙি থেকে তুলে যে বর প্রথমে তার নিজের ডিঙিতে বসিয়ে আবার যথাস্থানে পৌঁছোতে পারবে, সে-ই লাভ করবে কনেকে। কী বিচিত্র ব্যবস্থা ও সংস্কারের বলি হতে হয় সুন্দরী মাওরি মেয়েদের।

ভারতবর্ষে প্রাচীন এক প্রবাদ আছে, যে সব কুমারী মেয়ে স্বপ্নে তাদের ভাবী স্বামীদের দর্শন লাভ করতে চাইত, তারা ঘুম থেকে উঠে বাসি মুখে লাক্ষারঞ্জিত পায়ে পুষ্পিত অশোক গাছে তিনবার পদাঘাত করত। সে পদাঘাতের ফলে যে অশোকফুল মাটিতে ঝরে পড়ত সেগুলো তুলে এনে এক কোমল শয্যা রচনা করে বালিশের তলায় সেগুলো রেখে দিত। রাত্রে সেই শয্যায় শয়ন করলেই তারা স্বপ্নে সাক্ষাৎ লাভ করত ভাবী স্বামীর।

আয়ারল্যান্ডেও একটি সংস্কারের কথা শোনা যায়। সে দেশে বিশেষ এক প্রকার কাঁটা গাছ আছে। যে সব মেয়েরা ভাবী স্বামীদের দেখবার জন্য উৎসুক, তারা সেই কাঁটা মুচড়ে ভেঙে এনে বালিশের তলায় রেখে নিদ্রা যাবে। তাতেই তারা



স্বপ্নে দেখতে পাবে ভাবী স্বামীদের।

আমাদের প্রতিবেশী দেশ হল ব্রহ্মদেশ। সেখানকার দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে যে উপজাতিটির বাস তারা মন-ক্ষের-পেতাং নামে পরিচিত। এদের মেয়েদের মধ্যে সুন্দরী সম্বন্ধে একটি বিচিত্র সংস্কার প্রচলিত আছে। এরা মনে করে সুন্দরী বলে গণ্য হওয়ার একমাত্র বস্তু কণ্ঠ। যে মেয়ের গলা যত লম্বা – সে মেয়ে তত সুন্দরী বলে স্বীকৃত। সুন্দরীদের সভায় বা বিয়ের বাজারে তাদেরই কদর বেশি। তাই খুব ছোটবেলা থেকেই মেয়েদের গলায় পরানো হয় পেতলের আংটা। মোটামুটি সেগুলি আট ইঞ্চি চওড়া। বয়স বাড়বার সংগে সংগে আংটার সংখ্যাও বাড়তে থাকে। এগুলি এত আঁট হয়ে থাকে যে সারাজীবনে তা আর খুলে ফেলা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। বাড়তে বাড়তে এক একজনের গলায় আংটার সংখ্যা এত বেশি হয়ে যায় যে সেগুলির ওজন দাঁড়ায় প্রায় পঁচিশ ত্রিশ কিলো। বেচারী সুন্দরীরা সেই বালা পরে জিরাফের মত গলা টান করে ঘুরে বেড়ায় সারাজীবন।

নিউগায়েনা দ্বীপের সমুদ্র উপকূলের মেয়েদের বিয়ের আগেই বুকের মাঝখানে ইংরেজি ভি (V) অক্ষরের মত একটি উল্কির দাগ কাটে। বালিকা যে নারীত্বে উপনীত হয়েছে এই চিহ্নই তার পরিচয়পত্র। নারী মহলের অন্ধ ধারণা রয়েছে ওই স্থানে ওই চিহ্ন না থাকলে কোনো মেয়ের ভাগ্যেই নাকি বর জোটে না।

আমাদের দেশে বাঁশের তৈরি কুলো গৃহস্থালীর এক অপরিহার্য জিনিস। মেয়েরা ধান, চাল, গম, মসলা ঝেড়ে নেয় সেই কুলোতে। কিন্তু কুলো নির্বাচনের ব্যাপারেও তাদের একটা সংস্কার আছে। নতুন কুলো কেনবার সময় তারা গুনে দেখে কুলোর চারদিকে বেতের বাঁধনগুলো। রাম, লক্ষ্মণ, সীতা – এই তিনটি নাম ধরে গুনে নেবে বাঁধনগুলো। যদি সীতায় এসে বাঁধন শেষ হয় তা হলে সেই কুলো কিছুতেই ব্যবহার করা চলবে না। রাম বা লক্ষ্মণের নামে শেষ হলে কোন দোষ নেই। সীতা নামের ওপর অনেক মেয়েদের মনে ভয়ানক দুর্বলতা। সীতা জনম-দুঃখিনী ছিলেন বলেই বোধ হয়।

আমাদের দেশের বয়স্কা মহিলারা এখনও অনেক সংস্কার মেনে চলেন। অনেকে থাকেন শুচিবায়ুগ্রস্ত। খাওয়া-দাওয়া, এঁটো বাসনপত্র, বাসি কাপড় চোপড় ইত্যাদির ব্যাপার নিয়ে অনেক সংসারেই নানারকম অশান্তি হয়। আধুনিক দৃষ্টিভংগি নিয়ে তাঁরা যদি মন থেকে সেই কুসংস্কার দূর করতে পারেন তা হলে সংসার থেকে অনেক ঝামেলা দূর হতে পারে। □

রবিদাস সাহারায়

ছবি : দেবাশিস

রবি শাস্ত্রী ও অমৃতা সিংকে নিয়ে আলোচনার তুফান উঠেছিল ক্রিকেট মহলে ও ফিল্ম জগতে। দুই শিবিরেই জল্পনা-কল্পনার সমাপ্তি ঘটল রবির ঘোষণায়। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই প্রেমোপাখ্যানের ধারাবাহিকতা ও প্রণয়ীযুগলের রোমাঞ্চময় বহু অন্তরঙ্গ মুহূর্ত নিয়ে এই রচনা।





রবি-অমৃতা সমাচার

বিলিয়ন চোখের তারায় তখন চ্যানেল নাইন মেলবোরন, সিডনি, অ্যাডিলেড। ওয়ারলড সিরিজ ক্রিকেট চলছে ফ্ল্যাশব্যাকে গোলডেন ব্রাউন অডি ২000, – স্বপ্নের রাজদুয়ার। সিংহদরোজা খুললেই ঢুকবেন চ্যাম্পিয়ান অব চ্যাম্পিয়ানস্। কিন্ত কে হবেন সেই চ্যাম্পিয়ান অব চ্যাম্পিয়ানস্, কে হবেন ক্রিকেটের নতুন রাজকুমার ? বিচারকের রাজদন্ড হাতে বসে আছে ক্রিকেট-চাণক্যের দল, রিচি বেনো, ইয়ান চ্যাপেল, টনি গ্রেগ, বিল লরি, কিথ স্ট্যাকপোল্। ক্রিকেটদুনিয়া উন্মুখ। বিস্ফারিত চোখে দেখছে এক শালপ্রাংশু ভারতীয়র মুখ, আস্তে আস্তে যিনি হয়ে উঠছেন অতিকায়। নাম রবিশংকর জয়াদিত্য শাস্ত্রী। হ্যাঁ, ক্রিকেটদেবতা শুনলেন ভারতবাসীর প্রার্থনা, তিলকচর্চিত হল রবির মুখ, মাহিমে বসে দেখলেন ওর বাবা-মা। তাঁদের চোখের কোণে আনন্দের চিকচিকে রেখা। মাহিম থেকে আসুন আন্ধেরির ভারসোভায়। রঙিন টিভিতে অডির ভিকটরি ল্যাপ দেখছেন একটি মেয়ে আর অঝোরে কাঁদছেন। মাঝে মাঝে পাগলিনীর মত টিভির পরদাকেই কিস করছেন। মেয়েটি আর কেউ নন, অমৃতা সিং – হিন্দি ছায়াচিত্রের নায়িকা।

পূর্বরাতেই নাকি স্যাটেলাইটকে সারথি করে নেমে এসেছিল রবির কল। আনন্দের আর্তনাদে মাখামাখি হলেন গোটা শাস্ত্রী পরিবার, ফোনেই চলছিল আনন্দের কলরব, হঠাৎ আদুরে ছেলে জিজ্ঞেস করলেন, একি নিউজ ? এ প্রান্ত থেকে বাবার উত্তর, ইয়েস, দেয়ারস এ নিউজ, ইউ আর ইন দি হেডলাইনস হোয়াট ইজ দা অ্যাকচুয়াল ফ্যাকট ? রবি জানলেন মর্মার্থ : স্টারডাস্ট তুলেছে ডাস্ট স্টরম্। অমৃতার সংগে ওঁর নেপথ্য প্রেমকাহিনী ফাঁস করেছে। যাহোক, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখালেন রবি, – এই নিয়ে আর কোনরকম মন্তব্য করতে চাই না। নো কোশ্চেন অব ম্যারিং এনিবডি উইদিন নেকসট্ ফাইভ ইয়ারস। ফোন শেষ হল।

সারা ভারত তখন উত্তাল। টিভি দর্শকদের নয়নমণি রবি শাস্ত্রী।

উরদি চাপিয়ে সাড়ম্বরে বেরিয়ে পড়লাম। দাদার টিটি সারকেলের কাছেই সুনীলের (গাভাসকার) বাড়ি, – ক্রিকেটতীর্থ। ভিডিও দেখছেন মীনাল গাভাসকার, সুনীলের তারামাসি ও নাতনি চাল্লোনী (নূতনের মেয়ে)। কথার ফাঁকে পরদা ঠেলে ঢুকলেন এক তন্বী কিশোরী, হাতে স্টারডাস্ট। মীনাল গাভাসকার পরিচয় করিয়ে দিলেন, বললেন, 'মিস শিরোদকার, ওরা অস্ট্রেলিয়াপ্রবাসী। অস্ট্রেলিয়া গেলে পাপ্পি বা আমরা সবাই ওদের বাড়িতেই উঠি।' মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলাম, অস্ট্রেলিয়াতে ওয়ারলড্ সিরিজ চলছে, আর তুমি এখানে ছুটি কাটাতে এসেছ সাইড ডজ করলেন কুমারী শিরোদকার, কি ব্যাপার, আপনাদের রবি শাস্ত্রীও গ্রিলড্। ফিল্ম স্টারদের খপপড়ে পড়লে আর রক্ষে নেই। অত্যন্ত উৎসুক হলেন মীনাল গাভাসকার, 'কী ব্যাপার, সত্যি খবর নাকি ? রবি যাকে চাইবে সেই মেয়েই তো পায়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এটা কী হল ?' ভনিতার বালাই রাখলাম না, সরাসরি বললাম, 'হ্যাঁ, ব্যাপারটা নিয়ে তোলপাড় চলছে, আমিও শুনেছি, কানাঘুষা অনেককিছু জানি, এবার একটু খোঁজখবর করতে হবে বৈকি।' সুনীলের বাড়ি থেকে ট্যাক্সিতে সোজা মাহিমের নবজীবন সোসাইটি কম্পাউন্ড। শাস্ত্রী পরিবারে তখন চলছিল পুলকশিহরণ, জমাটি আড্ডা, আর সামনে ওয়ারলড সিরিজের ভিডিও রিপ্লে। রবির সাফল্য ও প্রাসঙ্গিক নানা আলাপ আলোচনা হল, হল মিষ্টিমুখ। একসময় অমৃতা-প্রসংগ তুললাম। ওয়ারলড সিরিজের পর থেকে আমি একজন কিন রবিওয়াচার। এই দীর্ঘ আসরে দেখেছি সময়ের সংগে পাল্লা দিয়ে আরো সন্নিবিষ্ট হয়েছে দুটি প্রণয়ান্ধ অ্যাপোলো, শরীরের উষ্ণ মাকড়সার সুড়সুড়িতে দুটি প্রাণ ছুটে গেছে জুহু-চৌপাটি থেকে গোয়ার আনজুনা হয়ে



স্পোর্টস্টারে রবির ছবি, পাশে অমৃতা সিং

নিউইয়রকের নিভৃতে। অনেক গোপন অভিসারের পর অমৃতা আজ রবির বাগদত্তা। ব্র্যাবোর্ন স্টেডিয়ামের উগ্র 'বডি অ্যান্ড সোল' ফ্যাশন প্যারেডের মাঝখানে প্রখর আলো ঠিকরে ভি আই পি আসনে হাজির হলেন রবি আর অমৃতা, নীরব হাসির মাঝখানেই জানালেন তাঁদের একাত্মতা। সাক্ষী অংগুরীয়, সাক্ষী চাঁদ, সাক্ষী আকাশের পালতোলা মেঘ। ওরলি সি-ফেসের সমুদ্র সাক্ষী রেখে এবার নীড় বাঁধবে দুটি দমকা-হাওয়ার প্রেমিক-প্রেমিকা। নাম যাদের রবি শাস্ত্রী ও অমৃতা সিং।

রুপোলি পরদার ডিঙির কোলে ক্রিকেটের খররবি। এ নিয়ে জল্পনাকল্পনার অন্ত নেই। দুজনেই হাইফ্লায়ার, এখানেই প্রতিবন্ধক। গোপন অভিসারে বেরিয়েও রক্ষে নেই, লেগে আছে প্রচারমাধ্যম – এঁটুলি পোকা। একটু ফিসফাস করলেই সর্বনাশ, হাই ব্যারিটোনে দিগ্বিদিক প্রকাশ। নিউইয়রকের হোটেলের নিভৃতিতেও রেহাই নেই, ফ্ল্যাশলাইট জ্বলে ওঠে। পাবলিক ফিগার হবার নজরানা।

কিনওয়াচার হিসেবে রবি-অমৃতার এই উদ্বেল প্রেমের রসঘন রোমাঞ্চ আমাকে যতটা না টেনেছে তার চেয়ে বেশি টেনেছে এর প্রেক্ষাপট। ভেবেছি শুধুই কি প্রচ্ছদের ছবি হয়ে বেঁচে থাকবে আজকের দুই প্রেমান্ধ কপোত-কপোতী, না হয়ে উঠবেন ভারতের চিরায়ত দাম্পত্যজীবনের সুখী প্রতীকী? হ্যাঁ, ছাঁদনাতলায় দাঁড়াবেন রবি-অমৃতা, হবে গান্ধর্ববিবাহ, স্পোরটস ফিল্ডের পাঁচতলায় উবু হয়ে ডুরেপাড় শাড়ি মেলবেন অমৃতা শাস্ত্রী, না কল্পনার জালবোনা নয়, নবজীবনের পাট গোছাচ্ছেন রবি, ভারসোভাতে অমৃতা। জানেন কি, স্পোরটস ফিল্ড হতে চলেছে একটি তীর্থক্ষেত্র, যে মন্দিরতীর্থে এক ছাদের নিচে থাকবেন আপনাদের সব আইডলস্, স্বর্ণাক্ষরে লেখার মত যাঁদের নাম – সুনীল গাভাসকার, অজিত ওয়াড়েকার, পলি উমরিগর, বাপু নাদকারনি, একনাথ সোলকার, রমাকান্ত দেশাই, দিলীপ বেংগসরকার, রবি শাস্ত্রী, উইলসন জোনস্ প্রমুখ। তীর্থদর্শনের নামে গিয়ে হয়ত দেখবেন আপনাকে নিরীক্ষণ করছেন সালংকারা বধূ, চেনাচেনা যাঁর মুখ – অমৃতা সিং। হ্যাঁ, ওখানে চলছে তারই তোড়জোড়। রবির ফ্ল্যাটের ইনটিরিয়ার ডেকরেটার সন্তোষ জাগতিয়ানি, নবজীবনের বাসিন্দা – রবিদের উলটো ফ্ল্যাটেই থাকেন। সারাক্ষণ ওঁকে টিপস দিয়ে চলেছেন রবি, ফোনে অমৃতা, আর জাগতিয়ানি সাহেব তা তালিম করে চলেছেন – 'পেশাদারি স্বার্থে নয়, স্নেহের দাবিতে।'

প্রেমের মজলিশে

আইসকুল রবি, ক্রিকেটের বিয়রন বরগ। রবির দিকে তাকিয়ে অনেকবার ভেবেছি। ভেবেছি, রবির হৃদয়ে কি ছিল মরুভূমির হাহাকার, আর অমৃতা আবির্ভূতা হলেন মরূদ্যানরূপে? না, হবার কথা নয়। ডন বসকো বয়েজের ছাত্র ছিলেন রবি, সেখান থেকে এসেছিলেন পোদ্দার কলেজ অব কমারস অ্যান্ড ইকনমিকস-এ। চারপাশে সুন্দরী অগুনতি মেয়ে। লম্বা, সুন্দর, মার্জিত চেহারার রবি এককথায় রূপবৈভবে ঈর্ষণীয়। কেরিয়ারসর্বস্ব রবি কিন্তু এদিকে তাকাবার ফুরসত পেলেন না, একটু আলতো ইশারা মশকরার বেশি আর কিছু পছন্দ করতেন না। ক্লাশ চুকেবুকে গেলেই সোজা ছুটতেন পোদ্দার কলেজের নেটে – নবজীবনের কম্পাউন্ডেও তো আর্দ্র চাহনি দেবার মত মেয়ের অভাব ছিল না। একদংগল প্রেমঅনাথিনীর দল, রবির কোনো খেয়াল নেই।

রবি কি তাহলে লাজুক, প্রেমপরাঙ্মুখ। না নবজীবনের রবির ঘনিষ্ঠ বন্ধুমহলের অনেকেই আজ আমার ঘনিষ্ঠ। সুজন তলোয়ার বা অশোক ভাদওয়ার-এর দল অকপটে বলেন, 'না, রবির যথেষ্ট মেয়ে বন্ধু আছে, নবজীবনের চৌহদ্দির মধ্যে নয়। ফিল্মিমহলেও ওর বেশ যাতায়াত।' অকপট সত্যভাষণ। স্বভাব-সরল ডাঃ শাস্ত্রী তো প্রথমদিনই বলেছিলেন, 'মিঠুন, কিশোর বাজাজ, রবি এরা খুব অন্তরংগ বন্ধু মিঠুন তো ওর ভীষণ ঘনিষ্ঠ বন্ধু। স্বাভাবিক কথা. ওরা এক সংগে যখন আড্ডা মারে, বিয়ার টিয়ার খায় তখন অন্যান্য ফিল্ম অ্যাকট্রেসরাও আসে। তখন হয়তো কেউ দেখে ফেলল এবং এটা হতেই পারে, রবি কোনো মেয়ের সংগে একান্তে একটু আলাদা আধঘণ্টা কথা বলেছে. ব্যস, সেটা দিয়েই স্টোরি হল বলা দরকার, এই কিশোর (বাজাজ) এক দুরন্ত পাবলিক। কোনরকম অভিনেতা-পরিচালক না হলেও ষোলআনা ফিল্মিজগতের মানুষ। বান্দ্রার লিং-কিং রোডের পাশেই ওয়াটারফিল্ড রোড, সেখানকার কুল-ইন



শৈশবে রবি

অ্যাপারটমেনটে ওর ফ্যাশন বুটিক 'বড়াসাব'। বোম্বাই মেলফ্যাশনের শেষ কথাটি বলেন বড়াসাব-এর বড়াসাব কিশোর বাজাজ। ড্রেস ডিজাইনার বললে কিশোরকে খাটো করা হবে। কারণ, কিশোর আর স্ত্রী কিটি হাই সোসালাইট। এই কিশোরমহিমা রবিতেও বিস্তৃত। সন্ধ্যাসমাগমে কিশোর একটু-আধটু হালকা নেশা করেন বোম্বাইয়ের নামকরা বিয়ার পাবে ওঁকে হাইফ্লায়ারস পরিবৃত দেখতে পাবেন আসরে যদি 'কভি আজনবি থি'-র- নায়ক নায়িকা সন্দীপ-পুনম, বা রবি শাস্ত্রী, মিঠুন চক্রবর্তী অ্যান্ড কোং এদেরকে বিয়ারের গেলাসে চুমুক দিতে দেখেন, তাহলে একটুও টাঁ-ফুঁ করবেন

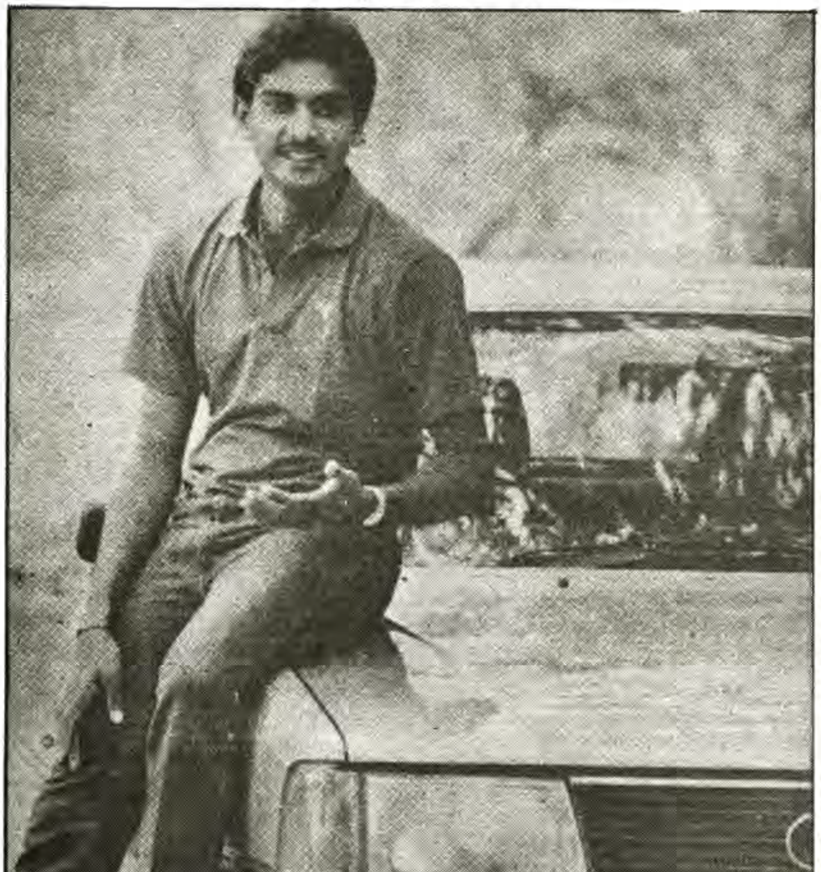
না। হ্যাঁ, এমনি এক মজার মজলিশি আসরেই রবিকে তাক করেছিলেন অমৃতা (বেতাব) সিং ওরফে ডিঙি। আসলে নিশান তো তাক করে রেখেছিলেন। ছিল উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষা। এবং সরল জ্যামিতিক নিয়মে জ্যামুক্ত ছিলা থেকে শর এসে বিঁধল হলিডে ইনের বিয়ার পাবে।

নিঃশ্বাসের দূরত্বে না হলেও, আনুষ্ঠানিক পরিচয়ের আগেই রবিকে অনেকবার দেখেছেন অমৃতা। যাহোক, নিশানা ছিল রবি এবং গ্র্যানটেড স্টোরিতে চামচে হলেন পুনম। পুনম কমন ফ্রেন্ড। চামচে বা শাগরেদ যাই বলুন, রবিকে তুলে আনেন অমৃতার টেবিলে। রবির আপাতগাম্ভীর্যের শিকল, সহজে ধরা না দেবার লুকোচুরি অমৃতাকে চঞ্চল করে তুলছিল। কিন্তু রুক্সানার কন্যারত্নটি বরাবরই জেদি, রবিকে কবজা করার জন্য বদ্ধপরিকর হলেন। প্রথমদিকে বন্ধুর তেমন সায় ছিল না, পরে অমৃতার জেদের কাছে নতিস্বীকার করলেন। ঠিক হল, বন্ধুটিই রবিকে ডিনারে নেমন্তন্ন করবে, সুকৌশলে সেই ডিনারে হাজির হবে অমৃতা। সৌজন্যবশত রবি অমৃতাকেও ডিনারে আসবার আহ্বান জানালেন। এবার গভীর জলে চারা ফেলার পালা। জলে পড়ল ফাতনা। রবি বড় পাঁকাল মাছ, ঘাই মারছেন তবু টোপ গিলছেন না। একটির পর একটি তীর মেরে চলেছেন অমৃতা। প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গ, ছুটছিলেন রবিপ্রেমার্থিনী অমৃতা। শরনিক্ষেপ করে চলেছেন অমৃতা দেবী, আর রবি নির্বিকার, আশুতোষ শিব। আস্তে আস্তে অচলায়তনের বাঁধ ভাঙতে থাকে, বুকটা টনটন করে ওঠে। কিন্তু মনের ঈশান কোণে একটা খচখচে ভাব, মেয়েটা একটু কেমন জেদি, গোঁয়ার, দামাল। একসময় উঠে পড়লেন ওঁরা সবাই, বিদায়লগ্নে তন্নিষ্ঠ মনে বললেন, 'সি ইউ, বাই গুডনাইট', বিদায়লগ্নে বিনিময় করলেন পুনর্মিলনের প্রতিশ্রুতি। অন্তঃ উৎসারিত ভালবাসার মোলায়েম আবেশ নিয়ে ঘরে ফিরে আসেন রবি, ঠোঁটদুটো অজান্তে কাঁপতে থাকে, বারবার ভেসে ওঠে ডিঙির মুখ। ভারসোভাতে ফিরে ডিঙিও চিতপটাং, ফোমের নরম গদিতে ডুব দিলেন, 'না, ছেলেটি স্বাধীনচেতা ও সৎ, হ্যাংলার মতো লাফিয়ে পড়ল না, বা মিথ্যে চাটুকারি প্রশংসা ছুঁড়ল না তো? তাজ্জব পারসোনালিটি।

প্রেমের উদার মজলিশে গালিব সাহেবই বলেছেন শেষ কথা, এ সেই প্রেমের আগুন ......। ডিঙির মধ্যেই রবি বিস্মিত হতে দেখলেন নিজের ভবিষ্যৎ, ভাবলেন মেয়েটির মধ্যে কোনরকম ইগোর বালাই নেই, নেই কোনো ঝুটা খোলস। চিন্তার অদৃশ্য প্রেক্ষাপটে দুজন দুজনকে জুড়ে থাকতে লাগলেন, সময়ের প্রান্তিক মুহূর্তে আত্মনিবেদনের পালাটুকু শুধু। প্রবাহিত প্রাণে দুজনে দুজনার কাছাকাছি হচ্ছেন, অথচ একান্ত নিভৃতিটুকু খোঁজার সাহস কারো নেই। সান্তাক্রুজ বিমানবন্দরে এল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। বিকেলের সেকেন্ড আমেদাবাদ ফ্লাইট, ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার দুটি দলই যাবে। ফ্লাইট আধঘণ্টা লেট। জামশেদপুরে অস্ট্রেলিয়া দলের মালপত্তর নিয়ে হুজ্জুতি হয়েছে, তারই জের। মাথার ঘুণপোকাটি নড়ে বসল। বন্ধুর কাছ থেকে আধুলি নিলেন রবি, পাবলিক টেলিফোন থেকেই ডিঙিকে রিং করলেন। ম্যারাথন টক, ফ্লাইটে লাস্ট চেক-ইন করলেন রবিশঙ্কর শাস্ত্রী। অপ্রাসঙ্গিক, তবু বলছি, সেদিন বিকেলের প্রথম ফ্লাইটে আমি ও রাজনবালা (ক্রীড়া সাংবাদিক) আমেদাবাদ গিয়েছিলাম। আমেদাবাদের কারনাভট হোটেলে উঠল দুটি দল। বোম্বাইয়ের বলবিন্দার সিং সাঁধু সেবার ভারতীয় দলে ছিলেন। কারনাভটের রুমে ওঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা বাল্লু, অমৃতার ব্যাপার কী ওকে নিয়ে অনেক গসিপ স্টোরি চলছে। সঠিক খবর কী 'বাল্লু থামস আপের ছিপি খুলে এগিয়ে দিতে গিয়ে বললেন, 'বহুতহি লাফরাবাজ। ফিলমি পিকচার। ডাবল অ্যাকটিংকা কিসসা। বাদমেঁ বাতাউংগা ... ।' যাহোক, সেদিনই ভারতীয় শিবির থেকে অমৃতার জীবনে নতুন মহানায়কের প্রবেশসংবাদ পেতে দেরি হয়নি মানে, রবি-অমৃতার প্রেমের শুভ লগ্নেই খবরটি পেয়েছিলাম, কিন্তু দীর্ঘদিন নীরব ছিলাম। নানা কারণবশত স্টারডাস্ট স্টোরি ও ওয়ারলড সিরিজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত খবর পরিবেশন করিনি।

যাহোক, আমেদাবাদ ইন্দোরের পালা পরপর দুদিনে খতম হল। বোম্বাইতে পা রেখেই আবার ডিঙিকে ফোন। হলিডে ইনে নয়, বান্দ্রার সমুদ্রতীরে সিরক, ওখানকার হেলথ ক্লাব ঘুরে রিভলভিং রেস্টুরেন্টে ডিনার। এবার নতুন ইমেজ, পরস্পর পরস্পরের কাছে হয়ে উঠেছেন লারজার দ্যান লাইফ। নিভৃতে ডিনার, দিলখুলাস কথাবার্তা, – 'এভরি টপিক আনডার দা সান' – বেরিয়ার' অ্যাপারটমেনট, গডফাদার সুনীল গাভাসকার কিছু বাকি রাখলেন না। সমুদ্রের প্যানোরমা, সিরকের অ্যাসথেটিক ডেকরেশন, স্বপ্নিল

অডি গাড়ির বনেটে রবি শাস্ত্রী



পরিবেশ, শপথ নিলেন দুটি তরুণ-তরুণী – চাই একটি সুখী নীড়। মনেমনে বুকে উল্কি আঁকলেন দুটি প্রেমদগ্ধ প্রাণ। শুরু হল প্রাণবন্যার জোয়ার, রেগুলার ডেটিং।

ক্যাসানোভা-টমবয়

রবি বলেন, 'আমি খুব ভালভাবে জানি, আমাকে অনেকে নাম দিয়েছেন ক্যাসানোভা মারকা ছেলে। এটাই কি আমার ইমেজ ? না, কখখনো না। এটা মিডিয়ার তৈরি। গসিপ ম্যাগাজিনগুলি এঁটে দিয়েছে এই লেবেল। একেবারে কাঁচাবয়েসেই টেস্ট আসরে আমি এসেছিলাম, আর এদেশে তো একটু সাকসেস পেলেই এরকম একটা ব্রানড দেবার প্রবণতা আসে। অনেকে আবার বলেন, আমি 'লেডিজ ম্যান' আই অ্যাম ওলওয়েজ মবড বাই গারলস্। আমারও ধারণা ছিল, মেয়েরা ভাবে রবির সংগে দাঁড়ালাম মানে স্ট্যাটাস সিমবল। প্রেস ফটোগ্রাফারদের নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া চলে, রবির সংগে একটা ছবি তুলে দিন, আসলে এটা কিছু নয়, একটা ক্রেজ, আ ফেজ। অ্যানড আই এনজয় ইট। অনেকের মধ্যে গেঁথে গিয়েছে, যে কোনো মেয়েকে চাইলেই পেতে পারি। অনেক নাম এ পর্যন্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এ সবই হচ্ছে মিডিয়ার কারসাজি। পিপল হিয়ার টেনড টু গ্রামারাইজ ক্রিকেটারস। ইয়ং অ্যানড আনম্যারিড লট আর মোসটলি দা ভিকটিমস। সোনু ওয়ালিয়া, পুনম ধীলন, পদ্মিনী এরা বন্ধু বইকি, এর বেশি কিছু নয়। কোনরকম সেনটিমেনটাল সম্পর্ক ছিল না, বা আজও নেই। অ্যাড ক্যাম্পেনে নেমেই সোনুর সংগে আমার পরিচয়, কিন্তু প্রোফেশনাল লেভেলের বাইরে কোনরকম ঘনিষ্ঠতা ছিল না। স্বীকার করছি, আমার বয়েসী একটা ছেলের পক্ষে যা ন্যাচারাল, আমি তাই। মেয়েদের সংগে হালকা ফ্লারটিং খারাপ লাগে না, কিন্তু সিরিয়াস সম্পর্ক নয়। আই অ্যাম জাসট্ আ সিম্পল মিডলক্লাস গাই ফ্রম মাহিম, টিল রিসেনটলি আই ডিডনট নো হাউ টু গেট আ গারল। মোসট অব দি টাইম আই এনডেড আপ পুটিং মাই ফুট ইনটু মাই মাউথ।

না, ঠিকঠাক বলছি, রবি কোনমতেই ক্যাসানোভা নয়। ক্যাসানোভার কনসেপটটাই আলাদা। ক্যাসানোভা ক্যারেকটার হলে রবির কেরিয়ার ক্ষতিগ্রস্ত হত। ক্রিকেটিং কেরিয়ারের ব্যাপারে রবি অতিমাত্রায় সচেতন। সেটা বিন্দুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হোক, এটা কালেভদ্রেও কল্পনা করেন না। সোনুকে ঘিরে রমরমা আলোচনা হয়। অনেকের কাছে এটা সিরিয়াস অ্যাফেয়ার হিসেবে বিবেচিত। আসল ছবিটি আমার কাছে খুবই পরিষ্কার। সোনিয়া ওয়ালিয়ার মডেল হিসেবে দারুণ হাঁকডাক, আজকাল ফিলমেও এসেছে। আকবর খানের 'আকর্ষণ' ছবিতে আপনারা শিগগিরই ওকে দেখতে পাবেন। বোম্বাইতে ভাগ্যান্বেষণে এসেছিলেন সোনু। একাকী থাকেন। অত্যন্ত স্মারট ও আউটওয়ারডলি মেয়ে; এবং যাকে বলে ড্যাম কেরিয়ারিস্ট, সোনু ঠিক তাই। 'প্রোলাইন'-এর ক্যাম্পেনের সূবাদে সোনু রবির সংস্পর্শে আসেন, আর সেখান থেকেই শুরু হল রগরগে আলোচনা। প্রোলাইনের অ্যাড এজেন্সির নাম আমিনার অ্যাডভারটাইজিং, ম্যানেজিং ডাইরেকটার সারতো এসটেভিস। মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক, পোড় খাওয়া ভাঙাচোরা চেহারা। সারতোর সংগে ওঁর চারচগেটের সুন্দরমহল অফিসে অনেকবার আলোচনা করেছি। গোয়ানিজ এই ভদ্রলোকের কাছে সোনু-রবির এই তথাকথিত অ্যাফেয়ার কতদূর সত্যি জানতে চেয়েছিলাম। সারতো জানালেন, পেয়ার মডেলিং-এর ক্ষেত্রে মডেলদের নিজস্ব কোনো প্রেফারেন্স আছে কিনা অনেক সময় জিজ্ঞেস করি। প্রোলাইনের এই ক্যাম্পেনটা সেলিব্রিটি ক্যাম্পেন, আর সেলিব্রিটি হচ্ছে রবি। ন্যাচারালি রবিকে ফিমেল মডেলের ব্যাপারে অনেক সময় জিজ্ঞেস করেছি। কিন্তু ও কখনো সোনুর ব্যাপারে প্রেফারেন্স দেখায়নি, সেটাই আশ্চর্য। ও বলে, ক্যাম্পেনের সাকসেসই প্রথম কথা, যাকে ভাল চয়েস মনে করেন, তাকেই নিন। বিশেষ দুর্বলতা থাকলে রবি নিশ্চয়ই সোনুর জন্য পীড়াপীড়ি করত, আমাদের অভিজ্ঞতা তো তাই বলছে। সোনুর সংগে আমার এ ব্যাপারে কোনদিন কথা হয়নি, কিন্তু শুনেছি সোনু একটু ডিজেকটেড। এমনিতেই ওর জীবনের প্রথম সিরিয়াস অ্যাফেয়ার ছমাস টিকেছিল, সেই অ্যাফেয়ারই কার্যত ওকে মডেলিং-এর লাইনে এনেছে। কিন্তু সোনুর কথাবার্তায় ওর ক্রিকেটদুর্বলতা প্রকট, প্রোলাইন অ্যাড-এর শুটিং-এর পর থেকে রবির সংগে কোনরকম কনটাকট নেই। অস্বীকার করছি না, কপিলদেব মাঝেমাঝেই কমনফ্রেন্ডের মাধ্যমে 'হাই' বলে পাঠায়। অনামুখের খবর, কপিলদেব 'হাই-এর মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেন, সুদূর অস্ট্রেলিয়া থেকেও সোনুর সংগে ট্রাঙ্ককলে দীর্ঘক্ষণ কথাবার্তা বলেন। একথা অনস্বীকার্য সোনু কপিল জোড়ে ক্যামপেন করেছেন। কিন্তু সোনু কপিল গোপন ভাবচালাচালির মোড়ক 'হাই'। সোনু-রবি নয়, সোনু-কপিল অ্যাফেয়ারেই অনেক গুঞ্জন। সুজন (তলোয়ার) রবির অনেক গোপন কথা জানেন, কিন্তু সুজনের দৃঢ় বিশ্বাস, সোনু-রবির এই তথাকথিত অ্যাফেয়ার হালকা ফ্লিং বই আর কিছু নয়। এটুকু ছেড়ে দিলে রবির আর কোনো স্টেডি অ্যাফেয়ারের খবর নেই। হ্যাঁ, যদি কেউ দিতে পারেন, তাঁর নেটওয়ারকে অবশ্যই আভূমি সেলাম জানাব।

ফিলমিজগতের বন্ধু সাংবাদিকরা আমাকে অনেকবার বলেছেন, অমৃতা শুটিং-এর আসরে প্রায়ই নাকি বলেন (তির্যক শারীরিক দোলা ও অংগভংগিসহ), 'আই অ্যাম আ টমবয়, ভগবান আমাকে কেন এমনভাবে গড়েছেন। আই অ্যাম ডিজগাসটেড, ছেলে হলে ভাল হত।' এটা কিসের ক্ষতচিহ্ন জানি না। তবে এটুকু বুঝি মেয়েরূপিণী টমবয় অমৃতা, শরীরের খাঁজেভাঁজে প্রেমের ফোসকাচিহ্ন। বেতাব-এ আনকোরা নায়ক সানি দেওলের সংগে মাখামাখি, অন্তরংগ জীবন, তারপর একদিন স্বপ্নসৌধ ভেঙে চুরমার। বিবাহিত সানির গোপন ছলনা, প্রতারিতা হলেন নবোদিতা নায়িকা। আবার আরেক সম্পর্ক। নায়ক আরেক ক্রিকেটার, দিল্লির কীর্তি আজাদ। কীর্তির বাবা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভগবত ঝা আজাদ, অমৃতার মা রুকসানার অতি ঘনিষ্ঠ মহলের মানুষ। কীর্তি-অমৃতার ঘনিষ্ঠতা ও খোলামেলা আচরণ হয়ে দাঁড়াল ড্রয়িংরুমের আলোচনা। ভগবত ঝা আজাদের কাছেও কথাটা পৌঁছুল, সর্বত্র এ নিয়ে মশগুল জল্পনা-কল্পনা। কলকাতার এক অত্যুৎসাহী ক্রীড়াসাংবাদিক তো ডায়েরি পাঠালেন উইথ কীর্তি-অমৃতা সম্ভাব্য শাদির ইংগিত, – কীর্তির কাছ থেকে নাকি পজিটিভ সিগন্যাল পেয়েছিলেন। এখানেও প্রেমের তাসের ঘর ভেঙে চুরমার। আলুথালু মন, বেপথু চলাফেরা, ঝাঁঝাল স্বরক্ষেপ, অমৃতা হয়ে পড়েন ছিন্নবিচ্ছিন্ন। শরীরে যৌবনের ভরাজোয়ার, প্রেম এক কুহক, মরূদ্যানের মরীচিকা। অমৃতা অকপটে স্বীকার করেছেন, 'ভীষণ ইমোশনাল আমি, অতিমাত্রায় জড়িয়ে পড়তে গিয়ে শেষমেষ ধোঁকা খেয়েছি। নিজেকে ভীষণ ইনসিকিওর মনে করতাম। কিন্তু দেখলাম, রবির মধ্যে কোনরকম ছলনার চাতুরি নেই, কোনরকম চাটুকারি কথাবার্তা নেই, নেই কোনো হ্যাং ওভার। প্রথম থেকেই ও ভীষণ ফ্র্যাংক আর ওপেন, ওর ভেতরে কোনরকম খাদ নেই। কয়েক সপ্তাহ ওর সংগে ঘোরাঘুরির পরই বুঝলাম, হি ইজ দা গাই ফর মি।'

না, তথাকথিত ক্যাসানোভা রবিও স্বীকার করেছেন, ডিঙির ব্যাপারে প্রথমদিকে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম। অনেক ভাবনাচিন্তা করেছি, ওর ঝাঁঝাল ভাবসাবটা নিয়ে একটু দ্বন্দ্বে পড়েছিলাম। কিন্তু ওর চোখে আমি দেখলাম পূর্ণ সততার প্রতিফলন। ডিঙি ইজ মাই গাইলেস ওয়ানডার। কোনরকম হ্যাং-আপ নেই, কমপ্লেকস্ নেই, নেই কোনো হ্যাজলস্। না এখন স্বীকার করছি, ডিঙি ইজ মাই ফারসট লাভ অ্যানড মাই লাসট।

এবার কে বলবেন ক্যাসানোভা-টমবয় বিষম ধাতুর মিলন! □

মৃণালকান্তি সাহা

[এরপর আগামী সংখ্যায়]

সুন্দর হাত



দুটি সুন্দর হাতের অধিকারিণী হওয়া কিন্তু বড় কম কথা নয়। ফুলের মতো কোমল দুটি হাতের পাতা এবং সুঠাম দুটি বাহুর সৌন্দর্য সহজেই মনকে মুগ্ধ করে। একটু লক্ষ করলেই দেখতে পাবেন, আমাদের চারপাশে এমন অনেকে রয়েছেন, যাঁরা মধ্যবয়স পার করে দিয়েও অনায়াসে সুন্দর, সুঠাম দুটি হাতের সৌন্দর্য বজায় রেখে চলেছেন। জানবেন, এর পিছনে রয়েছে দীর্ঘকাল ধরে নিয়মিত-ভাবে হাত দুটির পরিচর্যা এবং রক্ষণাবেক্ষণ। ইচ্ছে করলে আপনিও নিজের হাত দুটি সৌন্দর্যমন্ডিত করে তুলতে পারেন।

একবার ভেবে দেখুন, সারাদিনের কত কাজের চোট আমাদের বেচারা হাত দুটোকেই সামলাতে হচ্ছে। এর উপর বাড়ির গিন্নিদের রয়েছে রান্নাবান্না আর হরেকরকম ধোয়াধুয়ির ব্যাপার। বার বার জল ঘাঁটাঘাটি করে হাত দুটো এমনিতেই কেমন যেন খরখরে ফাটাফাটা হয়ে ওঠে। তারপর রান্না করতে গিয়ে তেলমশলা লেগে সেই হাত দুটোর চেহারা হয়ে ওঠে বড় করুণ। এই সমস্যাগুলোর হাত থেকে রেহাই পাবার সবচেয়ে ভাল উপায়, গ্লাভস পরে কাজ করতে শুরু করা। গ্লাভস পরে কাজ করতে প্রথম প্রথম একটু অসুবিধা হলেও আস্তে আস্তে অভ্যেস হয়ে যায়। গ্লাভস পরবার আগে সবসময় গ্লাভসের ভিতরে পাউডার ছড়িয়ে নেবেন। এতে গ্লাভসের ভিতরে হাত দুটি ঘেমে যাবার সম্ভাবনা থাকবে না। ফলে হাত বেশিক্ষণ ভেজা ভেজা অবস্থায় থাকার দরুণ হাতের চামড়ায় যে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে, সেটা একেবারেই থাকবে না। আর হাতের চামড়াকে পেলব রাখতে চাইলে বারবার সাবান দিয়ে হাত ধোবার অভ্যেস ছাড়তে হবে। সাবান ব্যবহার না করলেই নয় এমন ক্ষেত্রেই শুধু সাবান ব্যবহার করা উচিত। কেননা সাবান আমাদের হাতের পাতলা চামড়াকে শুষ্ক করে তোলে। ত্বকের ভিতরকার স্বাভাবিক তেলাভাবটুকুকে একেবারেই নষ্ট করে দেয়। ফলে আমাদের হাতের চামড়া কুঁচকে যায় এবং রুক্ষ খসখসে হয়ে ওঠে। আপনার হাতদুটির উপর যদি আপনার কিছুমাত্র নজর থাকে তাহলে রান্নাঘরে সিংকের একপাশে সবসময় একটা ছোট তোয়ালে, এক টুকরো লেবু আর একটি শিশিতে করে গ্লিসারিন আর গোলাপজল মিশিয়ে সবসময় মজুত রাখবেন। তরিতরকারি কেটে রান্নাবান্না সারবার পর হাতে যখন তেলমশলার দাগ ধরে যাবে তখন ওই লেবুর টুকরো হাতদুটোতে ভাল করে ঘষে নেবেন। দেখবেন দাগ উঠে যাবে। তারপর হাত জল দিয়ে ধুয়ে ভাল করে তোয়ালে দিয়ে মুছে নেবেন। এবার ওই শিশি থেকে একটু গ্লিসারিন ঢেলে নিয়ে দুটি হাতে ভাল করে মেখে নেবেন। এভাবে সারাদিন যখনই হাত ধোবেন, তখনই হাত দুটোকে খুব ভালভাবে শুকনো করে মুছে নিতে ভুলবেন না বিশেষ করে আঙুলের ফাঁকগুলো যেন একটুও ভেজা ভেজা না থাকে। কেননা এর থেকেই হাতে নানারকম ইনফেকশন হবার ভয় থাকে। কাজেই প্রথম থেকে এ বিষয়ে সাবধান হওয়াই ভাল।

প্রতিদিন রাত্রে শোবার সময় হাত দুটোতে ভাল করে ক্রিম ম্যাসাজ করবেন। এতে হাতের চামড়া নরম থাকবে। শীতকালে হাতের চামড়া খসখসে হয়ে গেলে একটা কাজ করে দেখতে পারেন। একটুখানি মাখন সামান্য চিনির সংগে ভাল করে মিশিয়ে নিয়ে হাতদুটিতে ভাল করে ঘষে ঘষে ম্যাসাজ করবেন। হাত দুটি কোমল হয়ে উঠবে।

হাতের পরই আসছে নখ-এর প্রসংগ। নখ-এর কাজ হল চামড়াকে রক্ষা করা। কেরাটিন নামক পদার্থ দিয়ে নখ তৈরি হয়। হাতের যত্ন করতে হলে এই নখের প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। নয়তো ভাঙা, ফাটা, ময়লা নখ আপনার হাতের সব সৌন্দর্যই মাটি করবে। এর উল্টোটাও ঘটতে পারে, যদি আপনি নিয়মিত নখের যত্ন করেন, সেক্ষেত্রে নখের সৌন্দর্য আপনার হাতকে আরও কমনীয় করে তুলবে।

নখকে আমাদের দেহের আয়নাও বলা চলে। কারণ নখের চেহারা দেখেই ডাক্তারেরা বলে দিতে পারেন যে, দেহে বিশেষ কোনো ধরনের রোগ বাসা বেঁধেছে কিনা। সাধারণত সুস্থ সবল লোকের নখের রঙ হয় গোলাপি এবং এতে স্বাভাবিক একটা চকচকে ভাব থাকে। কিন্তু শরীর অসুস্থ হয়ে পড়লে নখের রঙও অনেক সময় পালটে যায়। কখনও নখের উপর সাদা সাদা দাগ দেখা যায়। কখনওবা নখের ডগাটা লালচে কিন্তু ভিতরটা সাদা হয়ে যায়। আবার নখের উপর কালচে সবুজ ধরনের দাগও দেখা যেতে পারে। এছাড়া নখের আরও নানারকম রঙের পরিবর্তন দেখা যায়। আর এসবই শরীরের বিভিন্ন রকম অসুস্থতার প্রকাশ। নখের রঙের এইরকম কোনো পরিবর্তন দেখা গেলে কিংবা কারো নখ যদি হঠাৎ সহজে ভেঙে যেতে শুরু করে তাহলে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

কীভাবে নখের যত্ন নেবেন এবার সেকথা জানাই। প্রতিদিন স্নানের সময় নখগুলোকে ভাল করে নেলব্রাশের সাহায্যে ঘষে ঘষে পরিষ্কার করে নেবেন। নখের নিচে কখনও ময়লা জমতে দেবেন না। সাধারণভাবে নখকে ভাল রাখতে হলে তিনটি পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। এগুলি হল নখ কাটা, ফাইল করা এবং সাবান জলে পরিষ্কার করে ধোয়া। নখকে ভাল রাখবার জন্য এই তিনটি নিয়মই হল যথেষ্ট। যাঁরা নানারঙের নেলপালিশ লাগানো পছন্দ করেন, তাঁরা এরপরে কোনো নেলপালিশ লাগিয়ে নিতে পারেন। তবে কোনো আঙুলের নেলপালিশ উঠে গেল কিনা সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ রাখবেন। কেননা উঠে যাওয়া নেলপালিশ দেখতে ভারী বিশ্রী লাগে।

এবার, ম্যানিকিওর-এর প্রসংগ। যাঁরা নিয়মিতভাবে

আপনার বাচ্চাকে দিন সেরেল্যাকের অনন্য লাভ



শক্ত আহারের আদর্শ শুরু

আপনার বাচ্চা ৪-মাসে পড়লেই দুধের সঙ্গে ওর দরকার শক্ত আহারের। তখন থেকেই ওকে দিতে শুরু করুন সেরেল্যাকের অনন্য লাভ।

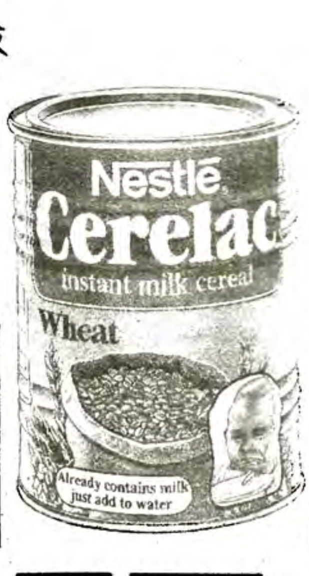
সম্পূর্ণ পুষ্টির লাভ ঃ সেরেল্যাকের প্রতি আহারে আছে আপনার বাচ্চার জন্য প্রয়োজনীয় সবরকম পুষ্টি উপাদান — প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেটস্, স্নেহপদার্থ, ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থ। আপনার বাচ্চার বিশেষ প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই এইসব উপাদান, সঠিক মাত্রায় সুষম ভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে।

চমৎকার স্বাদের লাভ ঃ সেরেল্যাক শুধু পুষ্টিকরই নয়, চমৎকার স্বাদেও ভরপুর। সেরেল্যাকের স্বাদ তাই বাচ্চাদের দারুন মুখরোচক।

সময় বাঁচার লাভ ঃ সেরেল্যাক এক তৈরী আহার। দুধ ও চিনি তাতে দেওয়াই থাকে, শুধু ফোটানো ঈষৎ উষ্ণ জল মিশিয়ে নিলেই হলো—চট্পট্ খাবার তৈরী।

আপনার বাচ্চার সুষম পুষ্টির জন্য সেরেল্যাক আহার স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে তৈরী করতে টিনের গায়ে লেখা নির্দেশাবলী দয়া ক'রে সঠিক্ ভাবে মেনে চলুন।

বিনামূল্যে সেরেল্যাক পুস্তিকার জন্য
এই ঠিকানায় লিখুন ঃ সেরেল্যাক
পোষ্টবক্স নং-৩
নিউদিল্লী-১১০০০৮



SAA/FSL/C/3799 (RI) BEN

Nestlé

সেরেল্যাকের যত্ন : পুষ্টিতে সম্পূর্ণ - স্বাদে অনন্য

নেলপালিশ লাগানো পছন্দ করেন, তাঁরা সপ্তাহে একবার করে অবশ্যই ম্যানিকিওর করবেন।

ম্যানিকিওর

১। প্রথমে নেলপালিশ রিমুভার দিয়ে আগেকার নেলপালিশ তুলে ফেলুন।

২। এবার নখগুলোকে ফাইল করতে শুরু করুন। আস্তে আস্তে ফাইল করে নখকে ডিম্বাকৃতি করে তুলুন। ফাইল করবেন সবসময় একদিক বরাবর ঘষে। পাশ থেকে শুরু করে উপরের দিক হয়ে নিচে নামবেন।

৩। একটা বাটিতে একটু উষ্ণজলে সাবান গুলে নিন। এরমধ্যে নখকে খানিকক্ষণ ভিজিয়ে রাখুন। এতে নখের চারদিকের চামড়া বা কিউটিকল নরম হয়ে উঠবে।

৪। এবার একটা তোয়ালে দিয়ে হাত দুটি খুব ভালভাবে শুকনো করে মুছে নিন। তারপর একটু ক্রিম কিংবা সামান্য উষ্ণ অলিভঅয়েল নখগুলির উপর ম্যাসাজ করুন এবার একটা অরেঞ্জস্টিকের ডগায় একটু তুলো জড়িয়ে নিয়ে সেই স্টিকটা দিয়ে কিউটিকলকে নখের পিছন দিকে ঠেলে সরিয়ে দিন। এর ফলে নখের গোড়ায় অবস্থিত অর্ধচন্দ্রাকৃতি সাদা দাগটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

৫। এখন খুব সাবধানে নখের চারপাশের মরা চামড়া একটা কিউটিকল সিজারের সাহায্যে কেটে ফেলুন।

৬। একটা পাত্রে একটু উষ্ণ অলিভঅয়েল নিয়ে তার মধ্যে অন্তত ১০ মিনিট নখ ডুবিয়ে রাখুন। ১০ মিনিট বাদে একটা টিস্যু পেপার দিয়ে অতিরিক্ত তেলটা মুছে নিন। এবার বাকি তেলটা দুটি হাতের কবজি অবধি ভাল করে ম্যাসাজ করে নিন। এরপর খানিকক্ষণ অপেক্ষা করুন।

৭। তেলটা হাতে বসে গেলে আবার হাত ধুয়ে ফেলুন। একটা নেলব্রাশের সাহায্যে ঘষে ঘষে নখগুলোকে উষ্ণজল ও সাবান দিয়ে পরিষ্কার করুন। লক্ষ রাখবেন যেন নখের ভিতরে কিংবা আশেপাশে একটুও



তেলাভাব না থাকে।

৮। এবার তোয়ালে দিয়ে হাতদুটি এবং নখগুলি খুব শুকনো করে মুছে নিন। তারপর নেলপালিশ লাগানোর পালা। যে কোনো পছন্দমত রঙের নেলপালিশ লাগিয়ে নখগুলি রঞ্জিত করুন। নেলপালিশের স্থায়িত্ব বাড়াতে চাইলে তিনবার প্রলেপ দেওয়া দরকার। আর প্রতিবার প্রলেপ দেওয়ার সময় আগের পোঁচটা ভাল করে শুকিয়ে নিয়ে তবে আবার লাগাবেন।

৯। সবশেষে একটু হ্যান্ডক্রিম হাতদুটিতে ম্যাসাজ করে নিন।

হাতের যত্ন করতে বসে কনুইকে কিন্তু মোটেই অবহেলা করা উচিত নয়। কারণ কালচে ছোপ ধরা কনুই দেখতে সত্যি ভারী বিশ্রী লাগে। সেজন্য হাতের সংগে কনুইকেও সমানভাবে যত্ন করতে হবে। কনুইতে কালো দাগ ধরে গেলে একটুকরো পাতিলেবু ভাল করে ঘষবেন। তারপর জল দিয়ে ধুয়ে, তোয়ালে দিয়ে মুছে শেষে একটু ক্রিম লাগিয়ে নেবেন। মাঝে মাঝে স্নানের আগে জলে বেসন গুলে পেস্টের মত করে নিয়ে তার সংগে লেবুর রস মিশিয়ে কনুইতে পুরু করে প্রলেপ দিতে পারেন। শুকিয়ে গেলে ধুয়ে ফেলবেন। তারপর শুকনো করে মুছে নিয়ে গ্লিসারিন আর গোলাপজল মিশিয়ে লাগিয়ে নেবেন। স্নানের সময় কনুইকে পরিষ্কার করে নিতে ভুলবেন না। নরম ব্রাশ কিংবা স্পঞ্জ দিয়ে কনুইতে সাবান লাগিয়ে নিয়ে ঘষবেন। আর রাত্রে শোবার সময় মুখের সংগে কনুইতেও একটু ক্রিম লাগিয়ে নেবেন।

সুন্দর বাহু আমাদের আকর্ষণ করে। বাহুকে সুন্দর রাখতে হলে নিয়মিত এর প্রতিও কিছুটা নজর দেওয়া বিশেষ দরকার। কারণ অযত্নে আর অবহেলায় সুন্দর জিনিসও অসুন্দর হয়ে পড়ে। স্নানের আগে বাহুতে এবং পুরো হাত দুটিতেই যে-কোনো তেল ম্যাসাজ করা খুবই ভাল। এছাড়া রাত্রে শোবার সময় ক্রিম কিংবা গ্লিসারিন আর গোলাপজল মিশিয়ে লাগাবেন। অনেক সময় রোদে পুড়ে হাতের খোলা অংশটি কালো হয়ে যায়। এক্ষেত্রে গোলাপজল আর পাতিলেবুর রস মিশিয়ে লাগালে উপকার পাবেন। এছাড়া অলিভঅয়েল আর পাতিলেবুর রস মিশিয়েও লাগানো যেতে পারে।

সবশেষে কয়েকটি ব্যায়ামের কথা বলছি। এগুলি নিয়মিত ভাবে করলে হাতের আঙুল, কবজি এবং বাহু সতেজ ও মসৃণ থাকবে।

১। দু-হাতে শক্ত করে মুঠো করুন। তারপর মুঠো খুলে আঙুলগুলো যতদূর পর্যন্ত পারেন ছড়িয়ে দিন। এবার এই ছড়ানো অবস্থায় কয়েক সেকেন্ড রেখে আবার হাত মুঠো করুন। এইভাবে ১০/১৫ বার করুন। যখনই সময় পাবেন এই ব্যায়ামটি করে নিতে পারেন। এতে আপনার হাতের আঙুলে রক্তসঞ্চালন বাড়বে।

২। হাতছানি দেবার ভংগিতে কবজি থেকে জোরে জোরে হাত ওঠান ও নামান। ১০/১৫ বার করবেন। হাতের কবজি রোগা হলে এই ব্যায়ামটি করলে উপকার পাবেন।

৩। সোজা হয়ে দাঁড়ান। প্রথমে ডান হাত তুলে মাটির সংগে সমান্তরালভাবে রাখুন। এবার হাতটি চক্রাকারে ঘোরাতে শুরু করুন। প্রথমে ক্লক-ওয়াইজ, তারপর অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ। প্রত্যেকদিকে ১০বার করে করবেন। পরে অভ্যেস হয়ে গেলে ২০বার করবেন। ডান হাত হয়ে গেলে বাঁ হাত ঘোরাবেন। এই ব্যায়ামটি করলে বাহুর পেশীগুলো সতেজ এবং সুদৃঢ় থাকবে। এছাড়া যাঁদের বাহু রোগাটে তাঁদের ক্ষেত্রেও এই ব্যায়াম যথেষ্ট উপকারী হবে। ☐

দেবযানী দাশগুপ্ত

ছবি : সুমিত সিনহা

বাচ্চাদের দুরঙা পোশাক

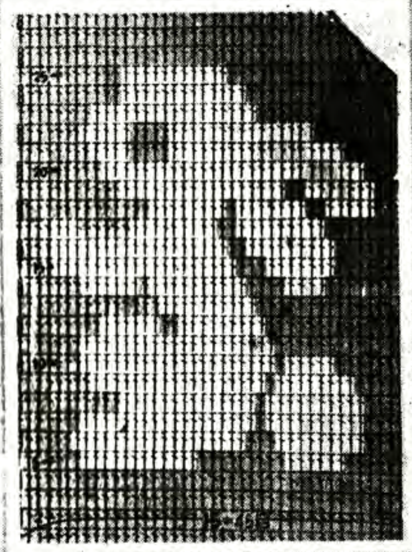
কলকাতায় শীত কদিনেরই বা। কিন্তু চারিদিকে তার জন্য কতই না আয়োজন। আর এই কটা দিন শীতের আমেজ মেখে ঝরঝরে থেকে বাচ্চারা ফুরফুরে প্রজাপতির মতো সেজেগুজে ঘুরে বেড়াবে তাই তো মনও চায়। চটপট দু একটা সোয়েটারও এসময়ে বোনা প্রয়োজন। হাতের কাছে ডিজাইন হাজির। সময় সুযোগ মতো শুরু করে দিন।

এখানে দুটি ডিজাইন দেখানো হয়েছে। আর তা কুরুশে বোনা। আসলে কুরুশে বোনা কিন্তু কাঁটার থেকে সোজা। বুনতে সময় লাগে কম। শুধু একটু অভ্যাসের প্রয়োজন। কাঁটায় যেমন সোজা বুনে তাতে অন্য রঙের কিছু কাজ করে দিলে ঝামেলা কম হয় আর দেখতেও ভাল লাগে। তেমনি এখানে শুধু ডবল ক্রোশে ও ট্রেবল দিয়ে দুটি সোয়েটার বুনে তাতে অন্য রঙের উল দিয়ে ডিজাইন করা হয়েছে কেমন করে তা গ্রাফের সাহায্যে দেখানো হয়েছে। গ্রাফের এক একটি লম্বা ঘরকে এক একটি ট্রেবল ও গ্রাফের এক একটি ছোট ঘরকে ডবল ক্রোশে ধরতে হবে। বাকি রইল কাটিং এর কথা। তাও ঠিক কাঁটায় বোনার মতই। যেমন করে কাঁটায় বোনায় বগল বা গলার ঘর বন্ধ করতে হয় এতেও তেমনি করে ডবল ক্রোশে বা ট্রেবল কমিয়ে দিতে হয়। অর্থাৎ বন্ধ করার লাইনে ওই কটি ঘরকে না বুনে ঘুরে চলে যেতে হয়। আর হাতের ঘরও দু পাশে বাড়ানোর সময় একটি করে ট্রেবল বা ডবল ক্রোশে বাড়বে। কুরুশে বোনার সময় শুধু একটা কথা খেয়াল রাখতে হবে

প্রত্যেক লাইন বোনার পর পরের লাইন বোনার সময় ডবল ক্রোশে বোনার বেলায় একটি চেন ও ট্রেবল বোনার বেলায় দুটি চেন বুনুন। তারপর ঘুরিয়ে বোনার ধারের ঘর ছেড়ে পরেরটিতে কুরুশ ঢুকিয়ে বুনে যেতে হবে। তা না হলে বোনায় টান পড়বে বা ঘর কমে যাবে। আর পরের লাইনে ওই চেনের মধ্যে কুরুশ ঢুকিয়ে ধারের ট্রেবল বা ডবল ক্রোশেটি বুনতে হবে। কোন সাইজে কত চেন নিয়ে শুরু করবেন সে ব্যাপারে স্বাবলম্বী হওয়া ভাল। তাই আপনি যেমন উল ও কুরুশ নির্বাচন করবেন তা দিয়ে প্রথমে কয়েকটি চেন বুনে নিয়ে স্কেল বা টেপ দিয়ে মেপে দেখুন ১ ইঞ্চিতে কটি চেন লাগবে। সেই হিসেবে আরম্ভ করুন।

এই সঙ্গে কাঁটায় বোনা ছোটদের কয়েকটি ডিজাইনের গ্রাফও দেওয়া হল। এ ব্যাপারে রঙের নির্বাচন আপনি নিজে করুন। আসলে খুব জটিল ডিজাইন বোনার চেয়ে একটি প্রধান রঙ আর একটি বা দুটি অন্য রঙ দিয়ে বোনার একটি বড় সুবিধা হল, এক জায়গায় বসে একবার ডিজাইনটি তুলে নিতে পারলে বাকিটুকু ঘুরতে ফিরতেও বুনে ফেলা যায়। তাছাড়া এ ধরনের ডিজাইনে বেঁচে যাওয়া ছোট খাট উলের টুকরোও কাজে লেগে যায়। ছোটদের কাছে এরকম পোশাক খুবই আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

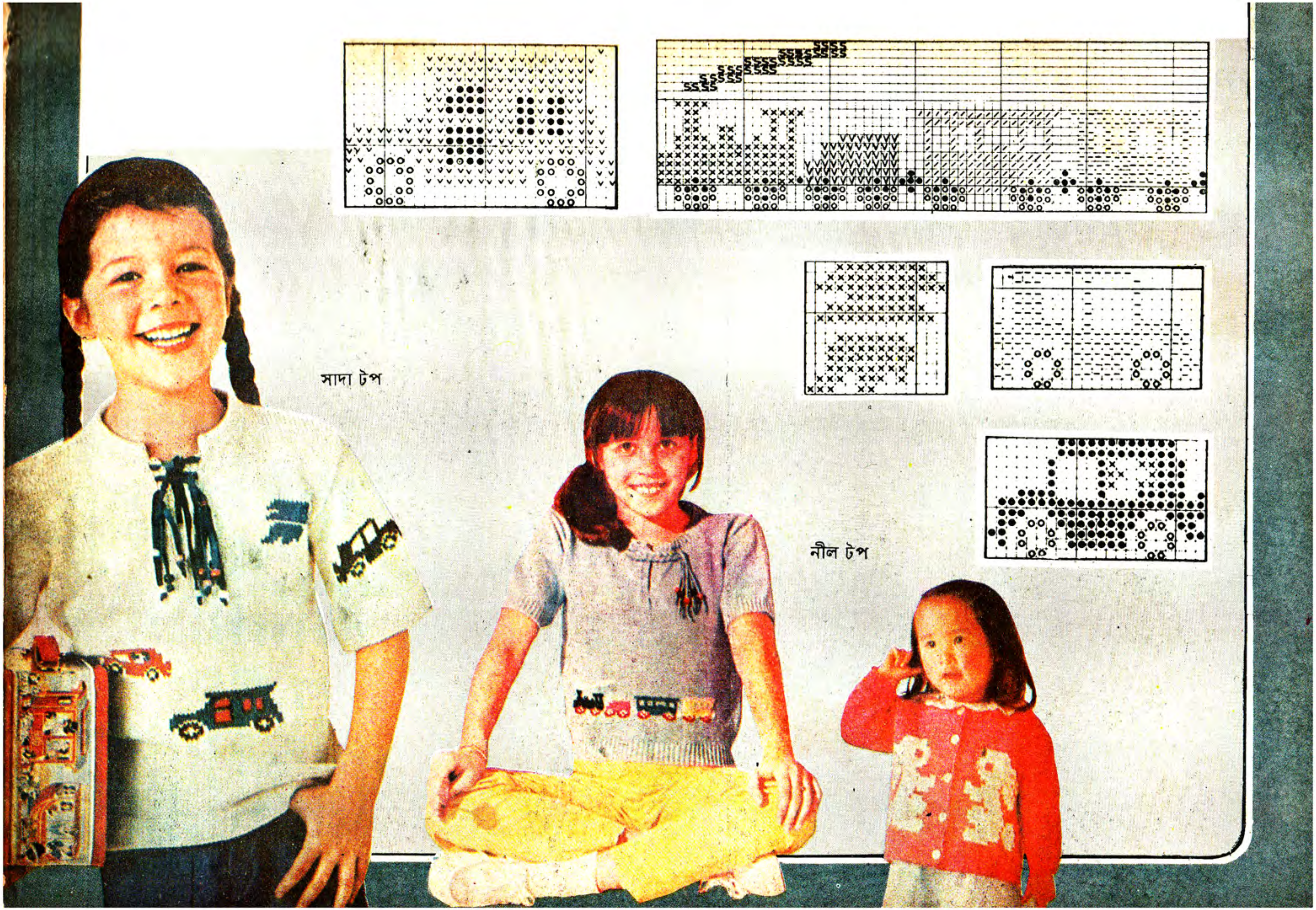
ছবির সাদা টপটির বৈশিষ্ট্য হল এর বোতামপটি। সামনের অর্থাৎ বুকের খন্ড বোনার সময় ঠিক মাঝখানের দুটি ঘর বন্ধ করে দিয়ে তারপর বাঁদিক ও ডান দিক দুটি খন্ডে ভাগ করে নিয়ে বুনে যেতে হবে।



বোনা শেষ হয়ে গেলে কুরুশ দিয়ে দুদিকেই দুসারি ডবল ক্রোশে বুনে পটি করে নিন ও বন্ধ করা ঘর দুটির ফাঁকে একটির ওপর একটি করে বসিয়ে সেলাই করে নিন (ছেড়েও রাখতে পারেন)। এবারে সরু পাতলা চামড়ার টুকরো বা কর্ড কিনে নিয়ে কিংবা তৈরি করে নিয়ে পাশাপাশি দুটি পটিতে দুমুখ ঢুকিয়ে জুতোর ফিতে পরানোর মতো করে পরিয়ে নিন। এবারে ওই কর্ড গুলোর দুমুখে দুটি করে বড় পুঁতি পরিয়ে গিঁট দিয়ে নিন যাতে খুলে পরে না যায়। কর্ডগুলো নানা রঙের হলেই ভাল হয়। এবারে দেখুন সাধারণ বোতাম বসানোর চেয়ে কত বৈচিত্র্যময় হয়ে ওঠে! এ টপটির বর্ডারও (হাতের, গলার, কোমরের) আলাদা সরু কাঁটায় বোনা হয়নি। একই কাঁটায় বুনে ভেতর থেকে মুড়ে সেলাই করে নেওয়া হয়েছে।

অন্য টপটিতেও সাধারণভাবে বোতামপটি বুনে তাতে বোতাম না বসিয়ে একটু অন্যরকম করা হয়েছে। ডানদিকের বোতাম পটি থেকে সরিয়ে একটু দূরে একটি ঘরের মধ্যে কুরুশ ঢুকিয়ে কয়েকটি উলের টুকরো টেনে বের করে নিয়ে তাতে বিনুনি করে নেওয়া হয়েছে। আর একদিকে গিঁট দিয়ে নিয়ে সবকটির তলায় পুঁতি পরিয়ে নেওয়া হয়েছে। তারপর গিঁট দেওয়া জায়গাটি বাঁদিকের বুকের খন্ডের সঙ্গে যোগ করে নেওয়া হয়েছে। ।

পুতুল খান্না


সাদা টপ
নীল টপ

সামর্থ্যের মধ্যে উপহার

বিবাহের উপহার নিয়ে সচিত্র একটি লেখা বেশ কিছু কাল আগের এক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু কয়েক দশকের মধ্যেই উপহার দেওয়ার রেওয়াজ এত বেড়ে গেছে যে, ব্যাপারটা এখন আর শুধু বিবাহের মধ্যেই আবদ্ধ নেই। প্রায় প্রতিটি পরিবারেই জন্মদিন, অন্নপ্রাশন, বিবাহ-বার্ষিকী – ইত্যাদি নানা অনুষ্ঠানের ঘনঘটা। এসব তো সহজে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। সামাজিক জীব আমরা সমাজও তো দরকার। দোকান-বাজার ঘুরে ঘুরে কেনাকাটায় যাঁরা পারদর্শী, তাঁরা তো জানেনই সামর্থ্যের মধ্যে উপহার দেবার মত এতরকম সামগ্রী বাজারে বেরিয়েছে, যে, হাতে গুনে শেষ করা যাবে না।

অবশ্য বাজারে মহিলাদের প্রয়োজনীয় জিনিস অনেক আছে। মুশকিল হয় পুরুষদের উপহার দেবার সময়। এই তো সেদিন আমার এক পুরুষ বন্ধুর জন্মদিনে অনায়াসে একটি দেশী পারফিউম উপহার দিলাম। ব্যাপারটা খুবই সাধারণ। বিশেষত দেশী পারফিউমে অনেকেই নাক কোঁচকান। কিন্তু পাড়ার স্টেশনারি দোকানে ঢুকে মাত্র ২২ টাকা ৫০ পঃ দামের এই স্প্রে পারফিউমটি চমৎকার একটি মোড়কে মুড়ে নিয়ে সোজা চলে গেলাম নির্ধারিত স্থানে। অবশ্য সেদিন এই দেশী সামগ্রীটিই হাসি ফোটাতে পেরেছিল বন্ধুর মুখে। ১৫ টাকা থেকে ৩৫ টাকার মধ্যে বিভিন্ন কোম্পানির পারফিউম সত্যি বেশ ভাল। আর আপনার সামর্থ্যের মধ্যে।

এতো গেল পারফিউম-এর কথা। নিউ মার্কেটে তো আছেই, তাছাড়া বড় বড় স্টেশনারি দোকান তো এখন কসমেটিকস্-এর সম্ভারে ঠাসা। মহিলাদের জন্য অনায়াসে নামী কোম্পানির লিপস্টিক অথবা কমপ্যাক্ট নিতে পারেন। ১২ টাকা থেকে ২৫ টাকার মধ্যে প্রয়োজনীয় উপহার। জন্মদিন, বিবাহ-বার্ষিকী যে-কোনো অনুষ্ঠানের জন্য।

কসমেটিকস্-এর দোকানের আর একটি প্রয়োজনীয় উপহারও আপনার সামর্থ্যের মধ্যে কুলোতে পারে। শিশুদের জন্মদিন ও অন্নপ্রাশনে আপনি 'জনসন'-এর একটি সেট উপহার দিতে পারেন। লোশন, ক্রিম, ম্যাসাজ অয়েল, সাবান ও বাডস্ মিলিয়ে একটি প্যাকেট। ইচ্ছে হলে এর মধ্যে কোনো একটি বাদও দেওয়া যেতে পারে।

অবশ্য ছোটদের জন্য 'লিও' টয়েজ-এর হরেক রকম ভিডিও গেমস্‌ও বাজারে বেরিয়েছে। তবে এর দাম মধ্যবিত্ত লোকের নাগালের বাইরে। তাই সামর্থ্যের মধ্যে উপহার-এর কলমে এ প্রসংগ বাদই দিলাম। উপহারের জায়গায় স্টিলের বাসনের কদর এখন কমে গেছে। কিন্তু পছন্দ করে কিনতে পারলে ১৫ টাকা থেকে ৪০ টাকার মধ্যে ভালই হবে। আজকাল স্টিলের মশলাদানি, অ্যাশট্রে, কসমেটিকস্ ট্রে, ফুলের সাজি, ফুলদানি প্রভৃতির মধ্যে বেশ নতুনত্ব এসেছে।

এবার আসি একটু পছন্দসই উপহার প্রসংগে। লিন্ডসে স্ট্রিটের 'মঞ্জুষা', চৌরংগীর 'রাজস্থালী' ও 'কাশ্মীর এম্পোরিয়াম' 'কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ', 'বেংগল হোম' এবং নিউ মার্কেটের বিভিন্ন দোকানে অনেক সুদৃশ্য ও পছন্দসই উপহার দেবার সামগ্রী পাওয়া যায়। সামর্থ্যের মধ্যে হলে, ঘুরে ঘুরে দেখতে পারেন। ইন-লে করা ওয়াল হ্যাংগিং (৫ টাকা থেকে ৪০ টাকা), কাপড়ের ওপর কারুকাজের অ্যালবাম ও ফোল্ডার (১৮ টাকা থেকে ৪২ টাকা), সাইড ব্যাগ (২৫ টাকা), ভাল কাজকরা ব্লাউজ পিস (১৫ টাকা থেকে ৩২ টাকা), ম্যাগাজিন রাখার হ্যাংগিং (১০ টাকা থেকে ৩০ টাকা), সুদৃশ্য কাঠের অথবা চীনেমাটির অ্যাশট্রে ও ফুলদানি, সোপকেস (১৫ টাকা থেকে ৪৮ টাকা) প্রভৃতি আপনার পছন্দের আওতায় পড়তে পারে।

চৌরংগীর রাজস্থান সরকারের এম্পোরিয়াম 'রাজস্থালী'-তে বেশ সুন্দর সুন্দর গহনা আছে। গলার হাঁসুলি, কানের টপ, হাতের ব্রেসলেট বেশ আধুনিকতার নিদর্শন। সবগুলি একসংগে না হলেও একটি করেও কিনতে পারেন।

কলেজ স্ট্রিট অঞ্চলে বড় বড় পেনের দোকান আছে। ছাত্র অথবা মনের মত বন্ধুকে অনায়াসে একটি পেনসেট দিতে পারেন। কিংবা একটি স্কেচ পেনের সেট। দাম ১৫ টাকা। এর সংগে ক্যামেল কোম্পানির প্যাস্টেল কালার বকস্ ও চমৎকার একটি ড্রইংবুকও ছোটদের মুখে হাসি ফোটাবে। দাম পড়বে ২৫ টাকার মধ্যে।

উপহার দেবার জিনিসের লিস্ট এখানেই শেষ নয়। বিধান সরনির গাংগুলী ব্রাদার্স ও উত্তরা মার্কেটের ভিতরে বহু উপহার সামগ্রীর দোকান আছে। এখানে চমৎকার চমৎকার টেবিলক্লথ, টিভির কভার, টি-সেট কভার উইথ ন্যাপকিন, সু ব্যাগ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম ১২ টাকা থেকে ৪২ টাকার মধ্যে।

এছাড়া আছে বহু ইমিটেশন গহনা, ব্যাগ ও ক্যাসেটের দোকান। আপনার উপহার দেবার মানুষটি যদি মহিলা হন, তো কথাই নেই। ইমিটেশন গহনা বা পছন্দসই ব্যাগ উপহার পেলে তাঁর চোখ চকচক করে উঠবেই। অবশ্য আজকাল রুপোর ওপর মিনে কাজের ও পাথর সেটিং কানের টপ-এর দাম বেশ অল্প। অন্তত ১৮ টাকা থেকে ৫০ টাকার মধ্যে তো বেশ পছন্দসই পাওয়া যাবে। আজকাল ধর্মতলা অঞ্চলে নানান রকম অ্যালবাম বিক্রি হয়। এগুলি যেমন মনোমত, তেমনই প্রয়োজনীয়।

শ্যামবাজার অঞ্চলে হকার্স-কর্নারগুলিতে পরপর অনেক মনের মত উপহারের দোকান আছে। সেখানে চটজলদি উপহার অল্প পয়সায় কেনা যায়। এছাড়া এই অঞ্চলের বড় দোকান 'ন্যাশনাল ভ্যারাইটি স্টোর্স' 'দরবেশ' 'মডার্ন মিউজিয়াম'-এ উপহার দেবার সম্ভার থরে থরে সাজানো।

সব শেষে বলব, যে-কোনো অনুষ্ঠানে পছন্দমত বই ও ফুলের পসরা নিয়ে উপস্থিত হওয়ার মত সহজ ও চিরাচরিত ট্রাডিশনের বিকল্প আর নেই।

ল্যাম্পশেড

সুন্দরকে আরও সুন্দর করার জন্য যাঁরা অধীর, তাঁদের জন্যই এই কলম। সুসজ্জিত ঘর, রান্নাঘর অথবা বাথরুমকে আরও সুন্দর করে তোলার জন্য স্বচ্ছন্দ আলোর যেমন দরকার, তেমনই দরকার সেই আলোর একটি মানানসই আধার বা ল্যাম্পশেড-এর। আলোকে অর্থাৎ একটি বাল্বকে একটি আধারে রেখে শোভা বাড়ানোর কৌশল আজকের নয়। বাপ-ঠাকুরদার আমলে এই স্টাইল রপ্ত করেছিলেন তাঁরা। তবে অনেক কায়দার রকমফের ঘটিয়ে এযুগের সামগ্রী তৈরি হচ্ছে।

বিভিন্ন ল্যাম্পশেড-এর খোঁজে সেদিন প্রথম গিয়েছিলাম মিন্টো পার্কের কাছাকাছি বিখ্যাত দোকান মহল-এ। এই দোকান আর একটি আছে রবীন্দ্র সরণির ওপর। দামি কমদামি যে-কোনো ল্যাম্পশেডই এখানে পাওয়া যাবে। ২৫ টাকা থেকে শুরু করে ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত দাম। প্রথমেই আসি পেডেস্টাল ল্যাম্প প্রসংগে। সাড়ে তিন থেকে চার ফিট উচ্চতার এই ল্যাম্পশেডটি ল্যাকারিং করা। দাম ৩০০০

টাকা। খুব বড় ড্রইংরুমের এককোণে দারুণ উপযুক্ত। আলোও ছড়াবে ভাল। ডাইনিং হল বা যে-কোনো হলঘরের জন্য আছে বড় বড় স্যান্ডেলিয়ার বা ঝাড়। তবে ছোট সাইজের ঝাড় প্রয়োজন হলেও নিরাশ হবেন না। বিভিন্ন মাপের নানান ডিজাইনে স্যান্ডেলিয়ার-এর দাম ১২০ টাকা থেকে ১৫০০ টাকা।

মহল-এর মালিক একটি চমৎকার মডার্ন ডিজাইনের ল্যাম্পশেড তুলে ধরলেন আমার সামনে। যেন বিশেষ কায়দায় সাজানো একগুচ্ছ নানান রঙের গাছের পাতা। দাম ৫০০ টাকা থেকে ৬৫০ টাকা।

টিনটেড গ্লাসের তৈরি নানান চেহারার শেডের দাম ১৮০ টাকা থেকে ৩৬০ টাকা। বিভিন্ন কাজের সময় ব্যবহার করার জন্য অ্যাডজাস্টেবল ল্যাম্পও আছে এখানে। সুবিধামত নামানো-ওঠানো যায়। দাম ৩৭৫ টাকা থেকে ৬৭৫ টাকা। রোজউডের তৈরি জিনিস সাধারণত মধ্যবিত্তের নাগালের মধ্যে থাকে। সেই আশা নিয়েই জিজ্ঞেস করেছিলাম এখানে। দাম বললেন, ৩৫০ টাকা থেকে ৬৫০ টাকা।

তবে সস্তার ল্যাম্পশেড উনি কয়েকটি দেখালেন ২৫ টাকা থেকে শুরু করে ১১০ টাকা ১২০ টাকা পর্যন্ত আছে। ১১০ টাকার পিলার ল্যাম্পগুলিও চমৎকার। পোর্সিলিন, কাটগ্লাস, বা বোন-চায়নার তৈরি এইসব নানান ডিজাইনের ল্যাম্পশেড সত্যি আপনার মন কাড়বে। শৌখিন মানুষেরা তো অবলীলায় বোন-চায়নার তৈরি শেড-এর দিকে ঝুঁকবেন। এগুলির সূক্ষ্ম অথচ মনোরম ডিজাইন সত্যি সবগুলিকে হার মানায়। দাম একটু বেশি, ২৫০০ টাকা।

অবশ্য শুধু মহল-এই নয়। রাধাবাজারে এল এন ট্রেডিং, শ্যামানন্দ জালান অ্যান্ড কোং, এবং শ্যামবাজারের ন্যাশনাল ভ্যারাইটি স্টোর্সেও পেলাম আরও কয়েকটি নতুন মডেল। হেলমেট হ্যাঙ্গিং, ফিগার ব্রোঞ্জ, ব্রাশ-বাস্কেট এবং জাপানি ডাবল। দাম ৫৫ টাকা থেকে ৬৭৫ টাকা।

ভিলাইন ওয়াশ এড

গৃহিণীদের কায়িক শ্রম বাঁচাতে বাজারে এসেছে ভিলাইন ওয়াশ এড। কাপড় কাচার মেশিন। সাবান জল দিয়ে, ময়লা কাপড় দিয়ে দিলেই এর মাধ্যমে সহজেই কাপড় পরিষ্কার হয়ে যাবে। সময় লাগবে পাঁচ থেকে ছ মিনিট। ছোট ও বড় দুটি মাপেই বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। ট্যাক্স সমেত এর দাম ১৮০০ টাকা। বড় কথা হল, গৃহিণীদের অনেক বেশি সুবিধা দেবার জন্য জিনিসটি পোর্টেবল আকারে বাজারে ছাড়া হয়েছে।

প্রকাশের ডুঁরিয়া চেক

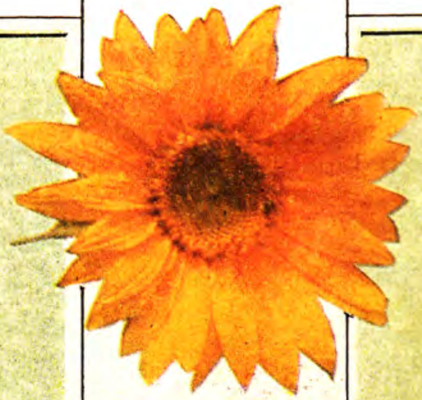
কটন প্রিন্টের জগতের প্রকাশ-এর নাম বেশ পরিচিতই। এই কটন প্রিন্ট এবার বাজারে ছেড়েছে ডুঁরিয়া চেকের ওপরে মনোরম সব প্রিন্ট। এতে পাটলি-পাল্লু, জামদানি স্টাইল চেক প্রভৃতি প্রিন্টই আছে। চট করে দেখলে পিওর কোটা বলে ভুল হতে পারে। কিন্তু আসলে ওই জাতীয়ই হালকা শাড়ি। দাম মাত্র ৬৫ টাকা। যে-কোনো প্রিন্ট শাড়ির দোকানেই কিনতে পারেন।

মজাদার খাবার রোলো

ছেলেমেয়েদের জন্য শুকনো খাবার কিনে রাখার অবশ্য এখন তেমন কোনো সমস্যা নেই। নানান কোম্পানি নানান খাবারের প্যাকেট এনে হাজির করেছে বাজারে। ছেলেমেয়েদের টিফিন দেবার আর কোন সমস্যাই নেই। আর তার সঙ্গে সস্তার আর একটি খাবার বাজারে এসেছে। একটি প্যাকেটে ছটি ক্রিম যুক্ত লম্বা ধরনের বিস্কুট। নাম রোলো। খেতে বেশ মুচমুচে হলেও ভেতরে বেশ পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্রিম থাকে। স্বাদও চমৎকার। এক একটি প্যাকেটের দাম ২ টাকা ৫০ পয়সা।□

চৈতালী ঘোষ

সাজানো বাগান



লন কীভাবে তৈরি করবেন

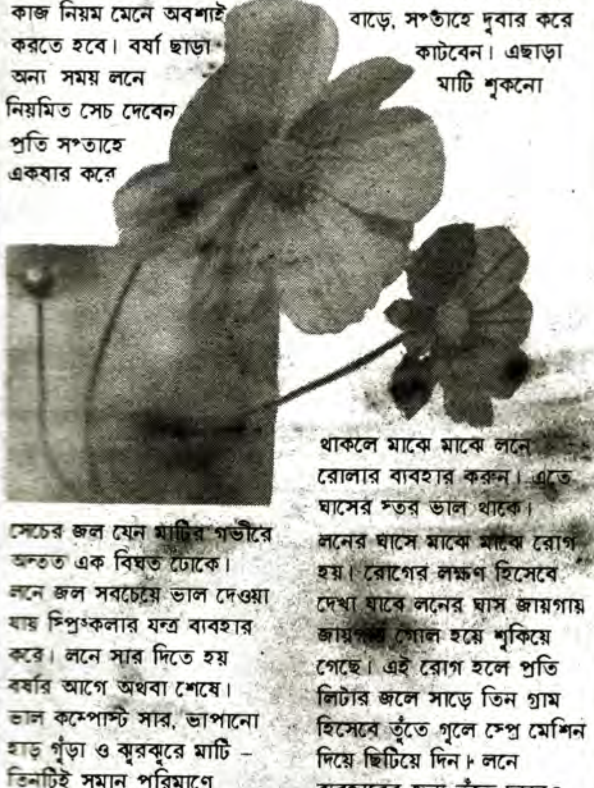
বাগান সাজাতে লনের একটা বিরাট ভূমিকা আছে। লন সুন্দর করে তৈরি করলে মনে হবে যেন বাগানে সবুজ ঘাসের গালিচা পাতা। আর, তার চারপাশে রঙবেরঙের ফুল। ভাবলেও ভাল লাগে। যেদিকে ফুলের বাগান, লন কিন্তু সেদিকেই করা ভাল। লন বড় হলে মাঝখানে লিলিপুলও করা যেতে পারে। সম্ভব হলে লিলিপুলে ফোয়ারা বসান। আরো ভাল লাগবে দেখতে। লনের এক কোণে পাথরের স্তূপ তৈরি করে তাতে টবের গাছ বসিয়ে ছোটখাটো রকগার্ডেনও তৈরি করা যায়। এছাড়া ইট দিয়ে ধাপে ধাপে উঁচু কেয়ারি করে টেরাস গার্ডেনিং-এর প্রচেষ্টাও খারাপ দেখতে লাগে না। তবে এসব তখনই সম্ভব হবে যদি আপনার বাগান করার জমি বেশ বড় হয় এবং পয়সা খরচ করতে রাজী থাকেন আপনি।

বাগানের ছায়া ঢাকা অংশে লন ভাল হবে না। লনের জন্য চাই খোলামেলা রোদ। বসন্তের শুরু থেকে বর্ষার শুরু পর্যন্ত লন তৈরির শ্রেষ্ঠ সময়। লন যেখানে তৈরি করবেন সেখানকার মাটি ৪৫-৬০ সেমি গভীর করে ভালভাবে প্রথমে কুপিয়ে নিন। এবার কয়েকদিন রোদে এই মাটিকে ফেলে রাখতে হবে। তারপর আগাছা এবং ইট ও পাথরের টুকরো পরিষ্কার করে মাটি ঝুরঝুরে করে নেবেন। বর্ষা আরম্ভের ঠিক আগে এই মাটির সঙ্গে প্রতি ১০০ বর্গ ফুটে ১৫০ কেজি হিসাবে গোবর সার ভাল করে মিশিয়ে মাটি সমান করে নিন। দরকার হলে একাজে রোলার ব্যবহার করুন। মাটি যেন কোথাও উঁচু নিচু না থাকে। প্রথম বর্ষার ধারা নামলে মাটির ওপর যেখানে যেখানে জল জমে থাকবে সেখানে গুঁড়ো মাটি দিয়ে সমান করে নিন। বৃষ্টি নামার দুচারদিনের মধ্যে কিছু আগাছাও জন্মাবে। সেগুলি শিকড়সুদ্ধ তুলে ফেলুন। দূর্বাঘাসের বীজ ছিটিয়ে বা গাঁটসুদ্ধ ঘাসের ডগা লাগিয়েও লন তৈরি করা যায়। বীজ ছড়ালে প্রতি একরে ৮ কেজির মত বীজ লাগবে। অর্থাৎ প্রতি ১০০ বর্গ ফুটে ২০০ গ্রাম। ঘাসের বীজ খুব ছোট হয় বলে বোনার আগে বালি বা ঝুরঝুরে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে নিতে হয়। নাহলে বীজ সমান ভাবে ছড়ানো যাবে না। বীজ বোনার পর হালকা করে সেচ দিন। ৫ সপ্তাহ পর বীজ থেকে ঘাসের চারা বের হবে। চারা বড় হলে লন মোয়ার বা ঘাস কাটার যন্ত্র দিয়ে ছেঁটে দিন। যন্ত্র না পেলে কাস্তে ব্যবহার করুন।



ঘাসের শিকড়সহ ডগা পুঁতে লন তৈরি করতে হলে প্রথমে মাটি ভিজিয়ে নিন। এবার ১৫ সেমি অন্তর সারি ও গাছের দূরত্ব রেখে দু তিনটি গাঁটযুক্ত ঘাসের ডগা পুঁতে দিন। এছাড়া ঘাসের চাবড়া বিছিয়ে বা ঘাসের চাবড়ার প্রলেপ দিয়েও লন তৈরি করা যায়। তবে অত ঘাসের চাবড়া পাওয়া মুস্কিল। বীজ থেকে বা ঘাসের ডগা পুঁতে লন তৈরি করতে মাস ছয়েক সময় লাগে।

লন তৈরির পর উপযুক্ত পরিচর্যা বা রক্ষণাবেক্ষণ না করলে, অল্প সময়ের মধ্যে লন খারাপ হয়ে যায়। সেচ ও সার দেওয়া, আগাছা তোলা, ঘাস ছাঁটা, মাটি সমান করা, বাড়তি জল বের করে দেওয়া প্রভৃতি কাজ নিয়ম মেনে অবশ্যই করতে হবে। বর্ষা ছাড়া অন্য সময় লনে নিয়মিত সেচ দেবেন। প্রতি সপ্তাহে একবার করে



সেচের জল যেন মাটির গভীরে অন্তত এক বিঘত ঢোকে। লনে জল সবচেয়ে ভাল দেওয়া যায় স্প্রিংকলার যন্ত্র ব্যবহার করে। লনে সার দিতে হয় বর্ষার আগে অথবা শেষে। ভাল কম্পোস্ট সার, ভাপানো হাড় গুঁড়া ও ঝুরঝুরে মাটি – তিনটিই সমান পরিমাণে মিশিয়ে লনের সার তৈরি করতে হয়। এটি লনের ওপর আধ ইঞ্চি পুরু করে ছড়িয়ে দিন। প্রথম বছর সার ছড়াতে রেক ব্যবহার করবেন না। পরের বছর থেকে এ কাজে রেক ব্যবহার করা যাবে। এই সার ছাড়াও অঘ্রান, পৌষ মাঘ ও ফাল্গুন মাসে একবার করে বাজার থেকে লনে ব্যবহারের জন্য বিশেষ মিশ্র সার কিনে প্রয়োগ করুন। দরকার হলে এই সার জলে গুলে তরল সার হিসেবে দিন।

সারা বছরই লনের আগাছা তোলা ও ঘাস কাটার কাজ করতে হয়। জংলী ঘাস ও অন্য আগাছা দেখলেই শিকড়সুদ্ধ তুলে ফেলুন। ঘাসের ডগায় শীতের শিশির জমলে তাও বাঁশের বাখারি দিয়ে মুছে দিতে হবে। এছাড়া কেঁচোর তোলা মাটির ঢিপিও তুলে ফেলে দিতে হবে। গ্রীষ্ম ও বর্ষার দিনে লনের ঘাস ছাঁটবেন মাটির ওপরে তিন সেমি রেখে। শীত ও বসন্তে মাটির যতটা সম্ভব ঘেষে ঘাস কাটতে হবে। সাধারণত সপ্তাহে একবার ঘাস কাটলে চলবে। যদি ঘাস তাড়াতাড়ি বাড়ে, সপ্তাহে দুবার করে কাটবেন। এছাড়া মাটি শুকনো থাকলে মাঝে মাঝে লনে রোলার ব্যবহার করুন। এতে ঘাসের স্তর ভাল থাকে।

লনের ঘাসে মাঝে মাঝে রোগ হয়। রোগের লক্ষণ হিসেবে দেখা যাবে লনের ঘাস জায়গায় জায়গায় গোল হয়ে শুকিয়ে গেছে। এই রোগ হলে প্রতি লিটার জলে সাড়ে তিন গ্রাম হিসেবে তুঁতে গুলে স্প্রে মেশিন দিয়ে ছিটিয়ে দিন। লনে ব্যবহারের জন্য তুঁতে ছাড়াও বাজারে বিভিন্ন ওষুধ পাওয়া যায়। দরকার হলে এগুলিও ব্যবহার করতে পারেন।

একবার লন তৈরি করে ঠিকমত যত্ন করলে পাঁচ-ছয় বছর ভাল থাকে। (ক্রমশ)

সুতীর্থ রায়

(আগামী সংখ্যায় হেজ বা গাছের বেড়া তৈরির পদ্ধতি)

ফটো : সৌগত রায় বর্মন/ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার সৌজন্যে

স্বনির্ভর মহিলা কার্যক্রম

আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষ গ্রামে বাস করেন। শহরকেন্দ্রিক সমাজে নারী আন্দোলন তথা উন্নয়ন নিয়ে যতই মাতামাতি হোক না কেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তার ঢেউ গ্রামে ছড়িয়ে পড়তে না পারছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এর সার্বিক সুফল আশা করা বৃথা। সুখের কথা, আজ অনেকেই এটা বুঝতে পারছেন। বিভিন্ন সমাজসেবী সংস্থা – যাঁরা গ্রামের মহিলাদের উন্নয়নের কাজে জড়িত, তাঁরা এ ব্যাপারে এগিয়ে আসছেন।

সম্প্রতি 'আন্ডারস্ট্যান্ডিং' ও 'সি. এ. ডি. এস'-এর যৌথ উদ্যোগে নদীয়া জেলার মাঝেরগ্রাম অঞ্চলে বাস্তবমুখীন উন্নয়নের প্রসারে মহিলাদের স্বনির্ভর কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রায় ত্রিশজন মহিলা স্বতঃস্ফূর্তভাবে চারদিনব্যাপী এই শিবিরে অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের স্বহস্তে নির্মিত বিভিন্ন কুটিরশিল্পের প্রদর্শনী ছাড়াও আলোচনা, নাট্যানুষ্ঠান, অংকন ও গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ইত্যাদি ছিল এই শিবিরের আকর্ষণ।

প্রারম্ভিক অনুষ্ঠানে গ্রামের সর্বস্তরের মহিলা, পুরুষ ও শিশুদের সমাবেশে প্রাঞ্জল বক্তব্য রাখেন 'এস. ই.ডি পি'-র মুখ্য অধিকর্তা অধ্যাপক তাপস দাস। তিনি বলেন, 'গ্রামে মহিলা স্বনির্ভরতার এমন বাস্তব রূপায়ণ বড় একটা দেখা যায় না।' শ্রীদাস এই উদ্যোগের প্রশংসা করে আশা করেন, 'এ ধরনের প্রয়াস অন্যান্য গ্রামের ক্ষেত্রেও উন্নয়ন-ভাবনার সূচনা করবে।' শিশু সাহিত্যিক প্রীতিভূষণ চাকী মাঝেরগ্রামের পরিবেশ, নারীজাগরণ ও তাঁদের স্বনির্ভর কর্মের দিকগুলো দেখে আনন্দে কয়েকটি ছড়া তৈরি করে বলেন, 'নারী বোঝা নয়, শক্তি; নারী নর্মসহচরী নয়, মর্মসহচরী, কর্মসহচরী।' অনুষ্ঠানে অন্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন সাংবাদিক গৌরীপদ গঙ্গোপাধ্যায়, সমর বসু ও মাঝেরগ্রাম হাইস্কুলের সম্পাদক পংকজ চ্যাটার্জি।

পরিশেষে 'সি. এ. ডি. এস'-এর মহিলা শাখার সভানেত্রী অনিতা সাহা বলেন, 'নারীকে আপন ভাগ্য জয় করবার অধিকার কেউ না দিলেও, আমরা তা অর্জন করবই।' তিনি 'Oxfam (India) Trust'-কে এই প্রয়াসে সহায়তা করবার জন্য ধন্যবাদ জানান। □

মাঝেরগ্রামের স্বনির্ভর মহিলা শিবিরে মহিলা উন্নয়ন বিষয়ের আলোচনায় রত যোগদানকারী মহিলাগণ





বধূদাহ : নানা দৃষ্টিকোণ

উনবিংশ শতাব্দী নয়, এই বিংশ শতাব্দীর শেষপর্বেও বধূদাহ এক জটিল সমস্যা। বিষয়টি নিয়ে সম্প্রতি একটি আলোচনাচক্রের আয়োজন করেছিলেন ইন্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অব ফরেনসিক সায়েন্সেস, তাঁদের রজতজয়ন্তীবর্ষ উপলক্ষে। এই আলোচনায় যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন তাঁদের বক্তব্য এখানে পরিবেশিত হল।

বর্তমান সময়ের এক জটিল শ্বাসরোধকারী সমস্যা বধূদাহ। চাঞ্চল্যসৃষ্টিকারী এই বিষয়টি নিয়ে সম্প্রতি এক আলোচনাচক্রের আয়োজন করেছিলেন ইন্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অব ফোরেনসিক সায়েন্সেস তাঁদের রজতজয়ন্তী বর্ষপূর্তি উপলক্ষে। আলোচনায় বধূদাহ সমস্যার ওপর আলোকপাত করা হয় নানা দৃষ্টিকোণ থেকে।

বিচারপতির চোখে

তাপমান যন্ত্রের সাহায্যে চিকিৎসক যেমন শরীরের তাপ নির্ণয় করেন, তেমনভাবে নারী জাতির স্বাধীনতা, শিক্ষা ও তাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে বোঝা যায় একটি দেশের অগ্রগতি। স্বামী বিবেকানন্দর বাণী উদ্ধৃত করে কথাগুলি বলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীমতী পদ্মা খাস্তগীর। শ্রীমতী খাস্তগীর বলেন, মেয়েদের যখন সমান সুযোগ পাওয়ার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে, তখন তাদের পুড়িয়ে মারা হচ্ছে পণের জন্য। এটা খুবই দুঃখজনক ঘটনা।

পণপ্রথা বিশেষ করে হিন্দু সমাজে অনেক দিন ধরেই রয়েছে। এক সময় বাবা-মা গৌরীদান করতেন পুণ্য অর্জনের আশায়। এখন দক্ষিণা না দিলে হিন্দুদের পূজা থাকে অসম্পূর্ণ। পাত্রকে দেওয়া হয় বরদক্ষিণা। কিন্তু মেয়েকে ভালবাসার নিদর্শন হিসেবে যে যৌতুক দেওয়া হত, কালক্রমে তা প্রবল আকার ধারণ করেছে। এখন ফ্রিজ, ফ্ল্যাট পর্যন্ত চাওয়া হয় পণ হিসেবে। আর পণ দিতে অপারগ হলে মেয়েদের পুড়ে মরতে হয় অন্তঃসত্ত্বা অবস্থাতেও।

শ্রীমতী খাস্তগীর প্রশ্ন করেন, রান্না করতে গিয়ে কেন শুধু বধূরাই পুড়ে মরে? কেন শুধু বধূরাই নাইলনের শাড়ি পরে রান্না করে? শাশুড়ি বা ননদরা কি রান্না করে না? অথবা তারা কি নাইলনের শাড়ি পরে না?

মুশকিল হল বিচারপতিরা শুধু সংবাদপত্রের রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে কাউকে শাস্তি দিতে পারেন না। এখানেই



পদ্মা খাস্তগীর

প্রয়োজন আদালতী বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের। বধূদাহ, আত্মহত্যা, হত্যা বা দুর্ঘটনা সেটা বোঝার জন্য ঘটনাভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

আইনজীবীর চোখে

মেয়েরা দাসপ্রথার দিনে ছিল ক্রীতদাসী। সামন্ততান্ত্রিক যুগে তাদের অবস্থার উন্নতি হয়নি। ধনতান্ত্রিক সমাজে মেয়েরা হল পরিবারের সেবায় নিয়োজিতা বিনা পারিশ্রমিকের দাসী। একথা বলেন পশ্চিমবঙ্গের অ্যাডভোকেট-জেনারেল শ্রীসাধন গুপ্ত। শ্রীগুপ্ত বলেন, আমাদের দেশে মেয়েরা সাধারণত অন্য-নির্ভর। মেয়েদের নিরাপত্তা কিনতে হয় যৌতুক দিয়ে। তা সত্ত্বেও হয় বধূদহন। শোষণভিত্তিক সমাজে যতদিন মেয়েরা যথেষ্ট স্বাধীন না হচ্ছে, সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন না ঘটছে, ততদিন এই সমস্যা সম্পূর্ণভাবে দূর করা যাবে না। তবে প্রতিরোধের চেষ্টা করতে হবে।

সাধন গুপ্ত



পুলিশের চোখে

বধূদাহকে বর্বরোচিত আখ্যা দিয়ে কলকাতা পুলিশের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার শ্রীধ্রুব গুপ্ত বলেন, এর মূলে রয়েছে পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝি, বনিবনা ও ভালবাসার অভাব, আহত অহংবোধ ও জটিল জীবন সমস্যা।

যেমন টালিগঞ্জের পঁচিশ বছর বয়সী সুমনা দত্তকে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় ১৯৬৮ সালের মার্চ মাসে। কাছেই ছিল কেরোসিনের স্টোভ। সুমনা মারা যায় হাসপাতালে পাঠানোর দুদিন পরে। তার বিয়ে হয়েছিল মাত্র দু বছর আগে এক ইঞ্জিনিয়ারের সংগে। সুমনার শাশুড়ি বলে, বাচ্চার জন্য দুধ গরম করতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটে। কিন্তু চুলের ছাপ, দরজার বার্নিশের ফোরেনসিক রিপোর্ট থেকে জানা যায়, সুমনাকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল জ্বলন্ত স্টোভের পাশে চেপে বসিয়ে রেখে। সুমনার স্বামী ও শাশুড়িকে গ্রেফতার করা হয়।

বেনেপুকুরের আঠার বছর বয়সী উর্মিলা জয়সওয়ালকে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় ১৯৬৫ সালের আগস্ট মাসে। তার স্বামী একজন ব্যবসায়ী। ময়না তদন্তে দেখা যায়, প্রথমে মুখে কাপড় গুঁজে শ্বাসরোধ করে পরে তাকে পোড়ানো হয়। এ ব্যাপারে গ্রেফতার করা হয় উর্মিলার স্বামী ও অন্য দুজনকে।

আগুনে পুড়ে মারা যায় নিউ আলিপুরের গৃহবধূ রেখা সাধুখাঁ। সেটা ১৯৮৩ সালের নভেম্বর মাস। কয়েকজন স্থানীয় ছেলে নিজেরা ঝুঁকি নিয়ে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালে তাকে ঘোষণা করা হয় মৃত বলে। রেখার স্বামী ও অন্যরা বলে, তারা এ'ব্যাপারে কিছু জানে না। মামলা দায়ের করা হয় তাদের বিরুদ্ধে।

তেইশ বছরের গৃহবধূ নিউ আলিপুরের গৌরী ঘোষকে আগুনে পোড়ায় তার স্বামী ও অন্য দুজন আত্মীয়। গৌরী মারা যায় হাসপাতালে। এই মামলায় শাস্তি হয় তিনজনেরই।

এইসব ঘটনা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় স্বামীই সাধারণত প্রধান অপরাধী ও অন্যরা সহযোগী। দ্বিতীয়ত নববিবাহিতাদের ক্ষেত্রে সাধারণত এটা ঘটে না। তৃতীয়ত বধূহত্যা হয় দাম্পত্য সম্পর্ক শিথিল হলে ও ভুল বোঝাবুঝির অবকাশে। চতুর্থত মায়েদের অযথা হস্তক্ষেপ অনেক সময় ভুল বোঝাবুঝিকে বাড়িয়ে তোলে।

আমাদের গৃহবধূরা এখনও সযত্নে গোপন রাখেন তাঁদের ওপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচারের কথা। ১৯৭৯ সালে বসন্ত রাও বনাম মহারাষ্ট্র মামলায় স্ত্রী মৃত্যুকালীন জবানবন্দীতে বলে তার স্বামীর শাস্তি কমিয়ে দেওয়া হোক। আসামী পক্ষ এক বিশেষ আবেদনে বলে, স্ত্রী নিজেই স্বামীর দোষ ক্ষালন করেছে। আসামী পক্ষের এই আবেদন নাকচ করে বিচারপতি আয়ার বলেন, আমাদের সংস্কৃতির এটি এক মর্মস্পর্শী উদাহরণ। ভারতীয় নারীর অশ্রু ও উদারতার এক মনোগ্রাহী অনুভূতি।

বসন্ত রাও মামলার ফলাফল দেখে আইনে কতকগুলি নতুন ধারা সংযোজিত হয়। যেমন বিয়ের সাত বছরের মধ্যে সন্দেহজনকভাবে বা আপাতদৃষ্টিতে সন্দেহজনক নয়, এমনভাবে কোনো



ধ্রুব গুপ্ত

গৃহবধূর মৃত্যু হলে, ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১৭৪ ধারা অনুসারে আত্মীয়রাও ময়না তদন্তের আবেদন করতে পারেন। বিয়ের সাত বছরের মধ্যে কোনো বধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু হলে ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১৭৬ ধারা অনুসারে ম্যাজিস্ট্রেটকে দিয়ে অনুসন্ধান করানো বাধ্যতামূলক।

পণের জন্য শারীরিক ও মানসিক অত্যাচারের ফলে কোনো বধূ আত্মহত্যা করলে, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮ ধারা অনুযায়ী সেটা বিবেচিত হবে জামিনের অযোগ্য ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে। বিয়ের সাত বছরের মধ্যে পণের জন্য কোনো বধূ মারা গেলে, কমপক্ষে সাত বছরের কারাবাস হবে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৪ বি ধারা অনুযায়ী। আবার ১৩০-এ ধারা অনুসারে বিয়ের সাত বছরের মধ্যে বধূ মারা গেলে তার দায়মুক্ত

ফটো : সৌগত রায় বর্মন ও অংশুমান দাস শর্মা

হওয়ার দায়িত্ব বিবাদী পক্ষের ওপর বর্তাবে। আর ১১৩ বি ধারায় বলা হয়েছে, দায়রা আদালত বধূর আত্মহত্যামূলক জবানবন্দীকে গুরুত্ব দেবে, কারণ আগুনে পোড়ার ঘটনায় অনেক সময় মৃত্যুকালীন জবানবন্দী দেওয়া সম্ভব হয় না। এছাড়া আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়াও এখন শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে পুলিশ ও অন্যান্য সরকারি সংস্থাগুলির দায়রা আদালত, চিকিৎসক ও সমাজকল্যাণ সংস্থাগুলির। শুধুমাত্র আইন এ ব্যাপারে যথেষ্ট নয়, 'বধূরা দাহর জন্য নয়' এই সচেতনতা আনতে হবে।

সংস্কৃতজ্ঞের চোখে

হয়তো পিতৃতান্ত্রিক সমাজ বলেই মেয়ের তুলনায় ছেলের চাহিদা বেশি, বলেন সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রী বিষ্ণুপদ শাস্ত্রী। তিনি জানান, মহাভারতে, অভিজ্ঞানশকুন্তলমে, হর্ষচরিতে দেখা যায়, বাবার কাছে আদরণীয়া ছিল মেয়েরাও। পুরুষদের মত শাস্ত্রশিক্ষা করতেন মেয়েরাও। কন্যাশুল্ককে মনে করা হত চরম দূষণীয়। পরবর্তীকালে হিন্দু সমাজে নারীনিগ্রহ কম হয়নি। যেমন সতীদাহ।

আজ শিক্ষা বিস্তারের ফলে ঘটেছে অর্থনৈতিক উন্নতি। রাজনৈতিক স্বাধীনতা দিয়েছে শক্তি। কিন্তু শুধু নৈতিক ও যান্ত্রিক মনোভাব যথেষ্ট নয়, আত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন। যেখানে মেয়েদের পূজা হয় না, সেখানে ঈশ্বর বাস করেন না।

সমাজতাত্ত্বিকের চোখে

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মেয়েদের ওপর শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক অধিকারগতভাবে যে অত্যাচার করা হয়েছে তারই ফলশ্রুতি বধূদাহ, বলেন শ্রীমতী বেলা দত্তগুপ্তা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ অধ্যাপিকা শ্রীমতী দত্তগুপ্তা বলেন, আদিম সমাজে পুরুষ ও নারীর মধ্যে লিঙ্গভেদ ছাড়া আর কোনো প্রভেদ ছিল না। কিন্তু সমাজের অগ্রসরতার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা হয়ে ওঠে ভোগের সামগ্রী।

গ্রিক সমাজে মেয়েদের প্রতি মনোভাব ছিল কখনও প্রখর, আবার কখনও মৃদু। মধ্যযুগে স্ত্রী যাতে অন্য কারো সঙ্গে সহবাস করতে না পারে, সেজন্য বাইরে যাওয়ার সময় স্বামীরা স্ত্রীদের পরিয়ে দিত সতীত্ব রক্ষার চেসটিটি বেল্ট। ইউরোপে গোপনে এবং আফ্রিকায় প্রকাশ্যভাবে মেয়েদের অযথা পীড়ন করা হত যোনিচ্ছেদ প্রক্রিয়ায়। পঞ্চদশ শতকে মেয়েদের পুড়িয়ে মারা হত ডাইনি সন্দেহে। পিউর‍্যাটিনিজম উদ্ভবের সময় ছেলের মুখে বাপের আদল না থাকলে তাকে বলা হত অবৈধ।

আমাদের দেশেও সতীদাহ হত। মেরে ফেলা হত মেয়েশিশুদের। কুলীন ব্রাহ্মণরা বহুবিবাহ করত। উনিশ শতকে বহু বই পাওয়া যায় বধূদাহ শিরোনামে।

সমাজতাত্ত্বিক দিক দিয়ে বধূদাহর পিছনে কয়েকটি কারণের কথা বলা যায়। স্বাধীনোত্তর যুগে ভারতবর্ষে এসেছে একটা প্রচণ্ড পরিবর্তন। সেটা হল ভোগ্যপণ্যের প্রতি আকর্ষণ এবং অর্থলিপ্সা। বিয়ের মাধ্যমে এই অর্থলিপ্সা আর ভোগ্যপণ্য সংগ্রহের বাসনা মেটানো যায় সহজেই। এর বলি হচ্ছে আমাদের দেশের মেয়েরা।

পণের জন্য প্রায় ৪০০টি মৃত্যুর ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে ১৯৮২ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৮৩ সালের জুন মাস পর্যন্ত। এর মধ্যে উত্তরপ্রদেশে – ১৫১, দিল্লি – ৪০, পাঞ্জাব – ৪৭, হরিয়ানা – ৪২। কিন্তু এটাও সম্পূর্ণ ছবি নয়। এখন সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ আরো বেশি সচেতন হলে, আরো সংঘবদ্ধ হলে বধূহত্যার হাত থেকে হয়ত পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে।

মনস্তাত্ত্বিকের চোখে

বধূদাহ সমস্ত নৈতিকতাকে বাতিল করে দেওয়ার এক সমস্যা, বলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ব বিভাগের প্রধান শ্রী জি বি সাহা। বধূর আত্মহত্যার কারণ বিশ্লেষণ করে তিনি বলেন, অদম্য আবেগ যুক্তিকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় আত্মহননের পথে। আত্মহত্যার পিছনে সচেতন বা অচেতনভাবে থাকে রাগ, উদ্বেগ, মনস্তাপ, অপরাধী মনোভাব, নৈরাশ্য অথবা অসহায়তাবোধ।

প্রশ্ন হতে পারে বিকল্প উপায় থাকা সত্ত্বেও বধূরা কেন আগুনে পুড়ে মরার পথ বেছে নেয়। বধূ নিজেকে দহন করে তার নিদারুণ যন্ত্রণাকে লোকের দৃষ্টিগোচর করতে চায়। সে তার মৃত্যুকে করে তুলতে চায় ঘটনাবহুল।

পশ্চিমী দেশগুলিতে স্বামী-স্ত্রীর সংসারে আত্মীয়দের হস্তক্ষেপের সুযোগ বড়ই অল্প। কিন্তু ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় বধূকে মানিয়ে চলতে হয় শ্বশুরবাড়ির লোকদের সঙ্গে। ফলে সংঘাতের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। অনেক সমঝদার বাবা-মা বধূকে ঈর্ষা করেন তাঁদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করছে বলে। এই সংঘাতের ফলেও ঘটতে পারে বধূদহন।

অনেক সময় মায়ের এই ঈর্ষার কারণ অনুসন্ধান করে দেখা যায়, জন্মের পর থেকে ছেলে বাবার তুলনায় মাকে পছন্দ করে বেশি। সে নিতে চায় বাবার স্থান। সে অভিনয় করে মায়ের শিশু প্রেমিকের ভূমিকায়। পরে প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে বিয়ে করলে মা ও ছেলের সম্পর্ক হয়ে ওঠে জটিল। মা উদ্বিগ্ন হয়ে ভাবে বধূ ছেলেকে কেড়ে নিচ্ছে।



জি বি সাহা

সংবাদপত্রে প্রায়ই দেখা যায় পণের জন্য বধূমৃত্যুর কথা। কিন্তু পণ একটি বিশেষ কারণ হিসেবে এর মূল নিহিত রয়েছে সামাজিক ও মানসিক কাঠামোর মধ্যে। শাশুড়ি ও বধূর ক্রমাগত সংঘাত, পারস্পরিক অবিশ্বাস ও শত্রুতার ফলেও ঘটতে পারে বধূদহন।

আগুনে পুড়ে আত্মহত্যা করার আগে বধূর ব্যবহারে পরিবর্তন ঘটে হঠাৎই। বধূটি মুখরা, উদ্বিগ্ন অথবা নীরব হয়ে যায় অস্বাভাবিকভাবে। পরিবারের লোকদের উচিত এটা লক্ষ্য করে তার মানসিক স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা এবং প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে যোগাযোগ করা। জনসংযোগ মাধ্যমগুলিও শিক্ষাদানের কাজে এগিয়ে আসতে পারে।

আদালতী বিজ্ঞানীর চোখে

আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের বিভাগীয় প্রধান ও অধ্যাপক শ্রী জে বি মুখার্জি বলেন, সন্দেহাতীতভাবে দোষ প্রমাণিত না হলে কোনো বিচারক অপরাধীকে শাস্তি দিতে পারেন না। তিনি বলেন, সেজন্য প্রয়োজন সংঘবদ্ধভাবে তদন্ত চালানো। কিছু ঘটনা স্বাভাবিক মৃত্যু বলে উপস্থাপিত করা হয়। কিন্তু পরে জানা যায়, সেগুলি শুধু অস্বাভাবিক বা আত্মহত্যা নয়, সেগুলি হত্যার ঘটনা।

একটি ঘটনার সন্দেহজনক উপস্থাপনা থেকে শুরু হয় তদন্ত। ঘটনার দৃশ্যপটের নিজেরই রয়েছে এক বিরাট মূল্য। মেয়েটির শরীরে কীভাবে আগুন ধরেছিল, তখন পারিপার্শ্বিক অবস্থা কেমন ছিল সেটা বোঝা যেতে পারে ঘটনাস্থল পরীক্ষা করে। নববিবাহিতা কোনো মেয়ের কাপড়ে আগুন ধরতে পারে রান্নার সময়। নতুন শ্বশুরবাড়িতে আসার লজ্জায় প্রথমে চিৎকার করতে ব কাপড় ছাড়তে না পারলে, সে পুড়ে যেতে পারে। মেয়েটি মৃত্যুকালীন জবানবন্দী দিতে অপারগ হলে, ঘটনাস্থল পর্যবেক্ষণ ও ময়না তদন্তের ফলে জানা যেতে পারে প্রকৃত ঘটনা। আত্মীয়রা রেহাই পেতে পারেন অযথা হয়রানি থেকে।

আগুনের মাত্রা ও ব্যাপকতা, পোড়ার ধরন, কোন দাহ্য পদার্থ দিয়ে আগুন ধরানো হয়েছে, মৃতা সে সময় দাঁড়িয়েছিল না বসেছিল — এসবই জানা যেতে পারে ময়না তদন্তে। ঘটনাটি হত্যার পর্যায়ভুক্ত কিনা সেটা বোঝা যায় শ্বাসনালীতে কার্বন মনোক্সাইডের সঞ্চয় পরীক্ষা করে। তবে আদালতী বিজ্ঞানীদের কাছে নমুনাগুলি পরীক্ষার জন্য শীঘ্র পাঠানো উচিত। অন্যথায় সব প্রমাণ নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

হরিয়ানার ফোরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির ডিরেক্টর শ্রী ও পি চুঘের বক্তব্যেও এ কথার সমর্থন মেলে। শ্রী চুঘ বলেন, কোনো মামলার সাফল্য নির্ভর করে ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া বাহিক সূত্রের ওপর। অনুসন্ধানকারী অফিসার হয়তো পান কয়েক বিন্দু রক্ত, পোড়া কাপড় অথবা কেরোসিনের টিন, এখন এই রক্তের বিন্দু দেখে পরীক্ষাগারে বলা হবে



জে বি মুখার্জি

এটা মানুষের রক্ত ও সেই রক্তের শ্রেণী। কিন্ত তাতে অনুসন্ধানের বিশেষ সাহায্য হয় না। কারণ বিচারপতিরা চান প্রকৃত ঘটনার তথ্যভিত্তিক প্রতিচ্ছবি। আদালতী বিজ্ঞানীরা বাহিক সূত্র থেকে ঘটনার পুনর্গঠন করতে পারেন। কিন্তু তাঁদের ঘটনাস্থলে গিয়ে বাহিক সূত্র অনুসন্ধানের জন্য সচরাচর ডাকা হয় না।

একটি ঘটনায় এক তরুণী গৃহবধূ সকালে আগুনে পুড়ে মারা যায়। স্থানীয় লোকেরা বধূটির দোতলার ঘরের দরজা ভেঙে ঢোকে। তখন শুধু বৃদ্ধা শাশুড়ি বাসন মাজছিল বাড়ির নিচের তলায়। শ্বশুরবাড়ির লোকরা বলে, বধূটি মানসিকভাবে ভুগছিল। দোতলার ঘরে একা আত্মহত্যা করেছে। আদালতী বিজ্ঞানী গিয়ে দেখেন সেই ঘরের তিনটি

এস এ মাসুদ



দরজা। প্রথমটি উঠোনে, দ্বিতীয়টি বারান্দায়, তৃতীয়টি সিঁড়ির কাছে। দরজায় ধোঁয়ার ছাপ পরীক্ষা করে আদালতী বিজ্ঞানী বুঝতে পারেন সিঁড়ির দরজা খোলা ছিল। পরে মেয়েটির হাতের বালা, বিছানা, দেওয়াল পরীক্ষা করে জানা যায়, আগে হত্যা করে পরে মেয়েটিকে পোড়ানো হয়।

সুতরাং এই ধরনের বাহিক সূত্র অনুসন্ধানের জন্য পুলিশের সংগে আদালতী বিজ্ঞানীদের একযোগে কাজ করার প্রয়োজন। বাহিক নমুনাগুলি যত শীঘ্র সম্ভব পরীক্ষাগারে পাঠানো প্রয়োজন। কারণ কয়েক মাস পরে পাঠানো হলে নমুনাগুলি বিশেষ কোনো কাজে লাগে না।

প্রতিরোধের উপায়

কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি শ্রী এস এ মাসুদ বলেন, বধূহত্যা মামলার সাক্ষ্য পাওয়া যায় মৌখিকভাবে অবস্থাগত প্রমাণের সাহায্যে এবং প্রত্যক্ষদর্শীর জবানীতে। এর মধ্যে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় অবস্থাগত প্রমাণের ওপর। অপরাধীর পরিচয় জানা থাকলেও পরিবারের লোকরা সাধারণত পরিবারের একজনকে বধূহত্যার দায়ে জড়াতে চায় না। এ ব্যাপারে বিচারপতিদেরও সচেতন থাকতে হয়।

বধূহত্যার মূলে রয়েছে লোভ ও প্রাপ্তিযোগের আশা। ১৯৮৪ সালের পণপ্রথা সংশোধনী আইনের বিশেষ লক্ষণীয় দিক হল এর ফলে আত্মীয়রা ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিও আইনের দ্বারস্থ হতে পারেন। দ্বিতীয়ত এই আইনে রয়েছে উপহারের তালিকা। সরকার সাহায্য করতে পারেন অন্যায্য দাবি করলে।

পশ্চিমী দেশগুলিতে মানসিক অত্যাচারের কারণে বধূ বিচ্ছেদ করতে পারেন। কিন্তু আমাদের সামাজিক ও মানসিক কাঠামোয় অনেক সময় সেটা সম্ভব হয় না। ফলে বধূদাহ ঘটে। এই বধূদাহ বন্ধের জন্য গড়ে তুলতে হবে সামাজিক সচেতনতা। চাপ সৃষ্টি করতে হবে স্থানীয় লোকদের। সমাজসেবী সংস্থাগুলিকে এগিয়ে আসতে হবে। □

কৃষ্ণা গায়েন

ছবি : অভিজিৎ গুপ্ত

ইনসমনিয়া বা নিদ্রাহীনতা

কাকে ঘুম বলে? অদ্ভুত প্রশ্ন তো। কিচ্ছু অদ্ভুত নয়, উত্তরটা শুনুন অনুগ্রহ করে। ঘুম হল সেই অবস্থা যাতে আপনি আপনার জীবনের এক-তৃতীয়াংশ সময় কাটিয়েছেন। পাড়ার সেই বৃদ্ধ, যিনি দাবি করতেন, তাঁর জীবনের একটি মুহূর্তকেও বৃথা নষ্ট হতে দেননি তিনি – গতকাল গত হলেন। সেই বৃদ্ধ, যিনি বৃদ্ধ বয়সেও দিবানিদ্রায় রত কোনো কিশোর-কিশোরীকে দেখলেই, ছড়ি নিয়ে তেড়ে গিয়ে তার ঘুম ভাঙাতেন, পাড়ার তাপসী বউদিকে যিনি তামসী বউমা বলে ডাকতেন স্রেফ এই কারণে যে বউদির ঘুম ভাঙতে নেহাত একটু বেলা হয়ে যেত। তিনিও, যতই অদ্ভুত শোনাক না কেন কথাটা, কিন্তু সত্যি, তাঁর চুরাশি বছরের জীবনের মূল্যবান (বা অমূল্যবানও হতে পারে) আটাশটা বছর ঘুমিয়েই কাটিয়েছেন।

ঘুম নিয়ে একটা খুচরো জোক দিতে ইচ্ছে করছে। ঘুম নিয়ে কেন, ইনসমনিয়া নিয়েই। যদিও জোকটি চোরাই, অর্থাৎ নিজের নয়। বিদেশী এক বই থেকে টোকা (এভাবে অ-নিজস্ব তামাশাকে চোরাই তামাশা বলতে কে যেন শিখিয়েছেন! তারাপদ রায় না! তারাপদ রায় যুগ যুগ জীয়ে)। এই চোরাই জোকটিকে আমি একটু চেরাই করে নিয়েছি; মানে, এই পরদেশীকে কিঞ্চিৎ স্বাদেশিকতায় চুবিয়েছি আর কি। তপোনাথবাবু, শ্যামনাথবাবুর মধ্যে পুরনো চেনাজানা। বেশ কয়েকদিন বাদে রাস্তায় দেখা হয়েছে দুজনার। কুশলাদির পর তপোনাথবাবু শ্যামনাথবাবুকে বলছেন, 'আমি কয়েকদিন একনাগাড়ে ঘুমোইনি জানো!' শ্যামনাথবাবু হাঁ হাঁ করে ওঠেন, 'সেকি! ইনসমনিয়ায় ধরল নাকি তোমায় তপোনাথ।' তখন তপোনাথবাবুর সহাস্য উত্তর, 'না না, তেমন কিছু নয় শ্যাম। অত উদ্বিগ্ন হওয়ার মতন কি আর ঘটেছে। আসলে কথাটা তুমি ঠিক ধরতে পারোনি। আমি বলছিলাম, কয়েক দিন কেটেছে আমার না ঘুমিয়ে। কয়েক রাত কেটেছে তো বলিনি।'

প্রায়শই শোনা যায় শ্রী বা শ্রীমতী অমুক মাত্র দু ঘণ্টা ঘুমিয়েই বছরের পর বছর দেশ শাসন করে গেছেন। তমুক কোম্পানির বড় সাহেব দিনেরাতে সাকুল্যে তিন ঘণ্টা ঘুমিয়ে সেদিনের সেই এতটুকুন কোম্পানিকে আজ কত্তো বড় করে দিয়েছেন। ভাই, আমাদের কাজ নেই ওইসব তাবড় তাবড় মহা নারী-পুরুষদের কাহিনী শুনে। আমরা সাধারণ। আমাদের ঘুম চাই। ঘুম আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য প্রতি পদে প্রয়োজন। প্রয়োজন আমাদের দৈহিক এবং মানসিক সুস্থতার জন্য। আমি তো বলি পরিবাবুর মতন সৌভাগ্য কটা লোকের হয়! তিনি সেই রেয়ার কতিপয় পাসর্নদের মধ্যে একজন যাঁরা – can slip into sleep with great ease and rapidity.

কতক্ষণ ঘুমনো জরুরি সে বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে (ভাগ্য ভাল, ঘুমনোটা যে জরুরি সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে কোনো দ্বৈধ নেই)। কেউ বলেন আট ঘণ্টা, কেউ বলেন সাত ঘণ্টা, কেউ বলেন সাড়ে ছ ঘণ্টা, কেউ বলেন ছ ঘণ্টা। ট্রিভোলি কোর্টের এক লাস্যময়ী সুন্দরী বলেছিলেন, 'ধুস! ওদের কথা ছাড়ো তো। ওরা কিস্যু জানে না। বিউটি রাখতে হলে কম করেও ঘুমোতে হবে বারো ঘণ্টা।'

সুন্দরীর কথা ছেড়ে দিই, আমার কাজ কি অমন সুন্দরীতে। প্রাজ্ঞজনের ভাষ্যে আসি। একটি প্রামাণ্য তথ্যপঞ্জী দিই। এতে বলা হয়েছে প্রাপ্তবয়স্ক নারী পুরুষের স্বাভাবিক নিদ্রাকাল ৭-৮ ঘণ্টা। বয়স্ক নারী-পুরুষের স্বাভাবিক নিদ্রাকাল ৬ ঘণ্টা। ২-৩ বছরের শিশুর স্বাভাবিক নিদ্রাকাল ১২-১৩ ঘণ্টা। আর সদ্য নবজাতকের স্বাভাবিক নিদ্রা স্বভাবতই প্রায় সমগ্র দিবসরজনীব্যাপী।

'হংস' ধ্যান



ঘুমনোর সময় কি ঘটে দেহপটে? পারশিয়াল সাসপেনশন অফ কনসাসনেস পারশিয়াল সাসপেনশন অফ ফিজিকাল অ্যান্ড মেন্টাল অ্যাকটিভিটি – বডি ইজ এনাবেলড টু রিপেয়ার ইটসেল্ফ – পাল্স রেট স্লোজ ডাউন – ব্লাড প্রেশার ফলস ব্রিদিং ইজ স্লোয়ার অ্যান্ড ডিপার – টেম্পারেচার ড্রপস – বেসাল মেটাবলিজম ইজ রিডিউসড – সেরিব্রাম ইজ ইনঅ্যাকটিভ একসেপ্ট ফর ড্রিমস।

[চেতনার আংশিক লোপ দৈহিক এবং মানসিক ক্রিয়াশীলতার আংশিক হ্রাস – দেহের বিবিধ ক্ষয় পূরণের অবকাশ – নাড়ীর গতি শ্লথ – রক্তচাপের নিম্নগতি – শ্বাস শান্ত, গভীর – দেহতাপের হ্রাস – বিপাক ক্রিয়ার মন্থরতা স্বপ্নকাল ব্যতিরেকে গুরু-মস্তিষ্কের নিষ্ক্রিয়তা।]

ঘুম নিয়ে এত কথা যখন উঠল, ঘুমের গভীরতা নিয়েও কিছু কথা বলা দরকার। আমাদের কাছে, ঘুমের গভীরতার ব্যাপারটি বলা বাহুল্য, আপেক্ষিক। গভীর ঘুম ঘুমিয়েও কেউ যদি বলেন, তাঁর ভাল ঘুম হয়নি, তাহলে কিছু বলার নেই। উল্টোটাও হতে পারে অবশ্যই। জয়ন্তবাবুর বাড়িতে সস্ত্রীক রাত্রিবাস করলেন অংশুমানবাবু। পরদিন ভোরে জয়ন্তবাবুর স্ত্রী জয়ন্তী দেবী অংশুমানবাবুর স্ত্রী অংশুমতী দেবীকে বলছেন, 'কি ভাই রাত্রে ভাল ঘুম হল?' অংশুমতী দেবীর এবং তাঁর কর্তার আদৌ ঘুম হয়নি, যার কারণ তিনটি। প্রথম কারণ নতুন জায়গা, দ্বিতীয় কারণ খাটে ছারপোকা, তৃতীয় কারণ বাড়ির পাশে রেললাইন থাকায় সারা রাত্রি ক্‌-ঝিক ঝিক। তবুও ভদ্রতা করে অংশুমতী বললেন, 'না না, কোনো প্রবলেম হয়নি।'

আমাদের কাছে ঘুমের

সূর্য নমস্কার

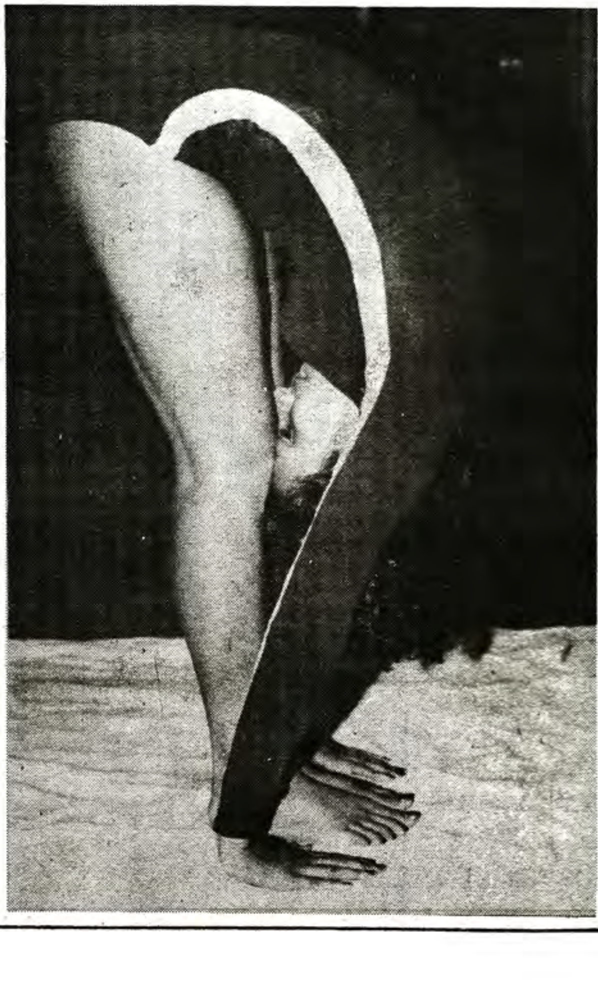


এক



দুই

তিন



গভীরতা একটি আপেক্ষিক বিষয় হলেও বিজ্ঞানীদের কাছে তা নয়। তাঁরা ইলেকট্রো-এনকেফ্যালোগ্রামের বিবরণী, রক্তচাপ, হৃদস্পন্দন, চোখের মণির সঞ্চালন প্রভৃতি তথ্যের সাহায্যে ঘুমের গভীরতার পরিমাপ করে থাকেন। ঘুমের গভীরতা সম্পর্কে সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তটি হল ঘুমের প্রথম স্তর থেকে আরম্ভ করে অতি গাঢ় ঘুমের স্তরে পৌছতে তিন থেকে পাঁচটি অন্তর্বর্তী স্তর পার হতে হয়। এর মধ্যে স্বপ্ন দেখার স্তরগুলি আসে ঘুমের অগভীর পর্যায়ে।

প্রথম ঘুম, পাতলা ঘুম। ঘুমের সেই প্রথম ধাপে জাগ্রত অবস্থায় থাকা চিন্তার ঠাসবুনন অনেকটাই শ্লথ হয়েছে, মনে হয়ত এসেছে সুখ স্বপ্নের অনুভূতি। ঘুমের এই প্রথম অবস্থা থেকে আমরা বেশ তাড়াতাড়ি গভীর ঘুমের স্তরে এসে পড়ি। ওই গভীর ঘুম আমাদের চালিত করে গভীরতম ঘুমের স্তরে। সেই গভীরতম ঘুমের স্থায়িত্ব আধ ঘণ্টার মত। তারপর ধীরে ধীরে ঘুম হালকা হতে আরম্ভ করে এবং সবচেয়ে হালকা ঘুমের স্তরে ঘুম নেমে আসে। ঘুমের শুরু থেকে এই স্তরটিতে পৌছবার মোটামুটি সময়কাল ৭০ মিনিট। ঘুমের এই হালকা স্তরে প্রথম দফা স্বপ্নের সম্ভাব্য সূত্রপাত। সেই স্বপ্নকালের প্রত্যাশিত সময় ১০ মিনিট। স্বপ্নকালের প্রথম অভিজ্ঞতার পর ঘুম পুনরায় গভীরতার দিকে যাবে যদিও সেই গভীরতম ঘুমের সমতুল্য হবে না। ঘুমের তৃতীয় ঘণ্টা চলাকালীন ঘুম একটু পাতলা হয়ে আসবে এবং দ্বিতীয় দফা স্বপ্নকাল আরম্ভ হবে। স্বপ্নের এই দ্বিতীয় পর্যায় অধিকতর প্রোট্র্যাক্টেড অর্থাৎ অধিকতর দীর্ঘ। স্বপ্নের তৃতীয় দফার প্রবেশ হবে ঘুমের পঞ্চম বা ষষ্ঠ ঘণ্টায় এবং সেই তৃতীয় দফার স্বপ্নকাল ২৫ মিনিটের মত। সপ্তম ঘণ্টার ঘুম, হালকা ঘুম এবং স্বপ্নের সংমিশ্রণ।

ঘুমন্ত অবস্থায় চোখের



চার

তারার সঞ্চালনের সঙ্গে বিজ্ঞানীরা স্বপ্ন দর্শনের একটি কার্য-কারণ সূত্র আবিষ্কার করেছেন। ঘুমন্ত অবস্থায় চোখের তারা বা চোখের মণির নড়াচড়া বেশ আস্তে আস্তে হয়। সেই সময় চোখের মণি যেটুকু নড়ে চড়ে তা ওপর থেকে নিচে বা নিচ থেকে ওপরে। কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ চক্ষু তারকার এই মৃদু সঞ্চালন খুব দ্রুত সঞ্চালনের রূপ নেয়। সেই অবস্থায় ওপর-নিচ ছাড়াও চক্ষু-তারকা ডান থেকে বাঁ পাশ এবং বাঁ থেকে ডান পাশেও নড়াচড়া করে। চোখের এই দ্রুত সঞ্চালনের পারিভাষিক নাম 'র‍্যাপিড আই মুভমেন্টস্' বা R. E. Ms.। এই R. E. Ms. পিরিয়ডের বা REM পিরিয়ডের সঙ্গে স্বপ্নের সুনিশ্চিত যোগাযোগ আছে। এই REM নিদ্রা প্রতি রাত্রে বিচ্ছিন্নভাবে তিন থেকে চার বার আসে। এবং এই বিচ্ছিন্ন REM নিদ্রাগুলির মোট সময় ৮০ থেকে ১২০ মিনিট। বলা হয় একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ বা একজন প্রাপ্তবয়স্কা রমণীর মোট নিদ্রাকালের ২০ শতাংশই REM নিদ্রা বা স্বপ্নিল নিদ্রা।

ঘুমের কথা উঠলে যেমন স্বপ্নের কথা উঠবেই তেমনি স্বপ্নের কথা উঠলে সিগমুন্ড ফ্রয়েডের কথা উঠবেই। সিগমুন্ড ফ্রয়েড (১৮৫৬-১৯৩৯) একজন অস্ট্রিয়ান সাইকিয়াট্রিস্ট এবং সাইকো-অ্যানালিসিস চর্চার উদ্গাতা। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে একটি হল 'ইনটারপ্রিটেশন অফ্ ড্রিমস্' (১৯০০)। ফ্রয়েডের মতানুসারে স্বপ্ন হল অতৃপ্ত বাসনার পূরণ (উইশ. ফুলফিলমেন্ট)। অপূর্ণ বাসনা বিভিন্ন উপায়ে স্বপ্নের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। স্বপ্নের ব্যক্তরূপ ছাড়াও একটি অব্যক্তরূপ বা লেটেন্ট কনটেন্টও আছে। ফ্রয়েডের 'ইনটারপ্রিটেশন অফ ড্রিমস' থেকে একটি বহুপঠিত উদাহরণ দিচ্ছি।

এক বিবাহিতা তরুণী স্বপ্নে দেখলেন তাঁর এক বোনের ছেলের মৃত্যু হয়েছে। এটি স্বপ্নের ব্যক্তরূপ বা ম্যানিফেস্ট কনটেন্ট। এর অব্যক্ত রূপের সন্ধানে ফ্রয়েডের বিশ্লেষণ দেখুন। মোটের ওপর এটি ঠিক যে এই তরুণী ভদ্রমহিলা তাঁর বোনের ওই ছেলেকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন এবং সেই ছেলের মৃত্যু কখনই তরুণীটির কাম্য হতে পারে না। কিন্তু ফ্রয়েড এই স্বপ্নকে বিশ্লেষণ করার তাগিদে গভীর অনুসন্ধানে জানতে পারেন তরুণীটি এক যুবকের প্রতি প্রণয়াসক্তা ছিলেন। কিন্তু তাঁদের মিলনের পথে যথেষ্ট বাধা ছিল। এমনকি পারস্পরিক দেখাসাক্ষাৎ পর্যন্ত সাময়িকভাবে স্থগিত ছিল। তরুণীটি ওই যুবককে কয়েকবার মাত্র দূর থেকে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন। এর মধ্যে তরুণীটির বোনের আর এক পুত্রের মৃত্যু হয়েছিল এবং তখন ওই যুবকটি শোকজ্ঞাপন করতে এসেছিলেন। তরুণীটি তাঁর মনের নির্জ্ঞান স্তরে (অবশ্যই সজ্ঞানে নয়) আশা করছিলেন এই ছেলেটির মৃত্যু হলে ওই যুবকটি আবার সমবেদনা জানাতে আসবেন এবং এই বিবাহিত তরুণীটি তাঁর প্রণয়াস্পদকে আর একবার চোখের দেখা দেখবার সুযোগ পাবেন।



পাঁচ



ছয়



সাত

আমার এই আলোচনায় একটা জিনিস পরিষ্কার হয়েছে ঘুম মানেই আগাপাশতলা সাউন্ড স্লিপ নয়। ভাল ঘুম মানেই স্বপ্নের অনুপস্থিতি নয়। স্বপ্নের উপস্থিতি মানেই ঘুমের বারোটা বাজা নয়, ঘুমের ডিসটারব্যান্স নয়, নয় ইনসমনিয়া।

তবে ইনসমনিয়া শব্দটি কি পাগলের প্রলাপ! তা তো কখনই নয়। তা যদি হবে তাহলে বাজারে কেন এত রিল্যাকট্যান্ট ওষুধ, ট্রাঙ্কুলাইজার, স্লিপিং পিলের ছড়াছড়ি!

॥ ২ ॥

ইনসমনিয়ার ব্যাপারে প্রথম কথা ব্যায়ামাচার্য বিষ্ণুচরণের। কথায় কথায় বিষ্ণুচরণ কেন? কেননা তিনিই আমার স্যার, তিনিই আমার গডফাদার। আমার যা কিছু শিক্ষা, সে তো তাঁরই করুণা। তাঁর অপার জ্ঞানরাশির ক্ষুদ্রকণিকা মাত্র। গডফাদারের কাছে গড চাইল্ডের শুধু এইটুকু আশীর্বাদ চাওয়ার আছে, তাঁর অমূল্য শিক্ষাকে সে যেন এই 'স্বাস্থ্য প্রতি পদে'র পাতায় লোকহিতায় যথাযথ উপস্থাপিত করতে পারে। বিষ্ণুচরণ বলতেন, 'ডেড অফ ইনসমনিয়া, ব্রিংস ইনসমনিয়া'। ঘুম হবে না, ঘুম হবে না বলে যত বেশি মাত্রায় উদ্বিগ্ন হয়ে শুতে যাবেন, ঘুমনো ততই কষ্টকর হবে। ঘুম না হওয়ার দুশ্চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলুন। শান্ত মনে, পরিচ্ছন্ন বিছানায় শুতে যান। জীবনে কি পেলেন না তার চেয়ে জীবন আপনাকে যা দিয়েছে তার কথা ভাবুন। মাঝ রাত্রে ঘুম ভেঙে গেছে? উঠে পড়ুন। কত কাজ বাকি রয়েছে। কত কাজ করা হয়নি। সেগুলি নিয়ে বসুন। চারিদিক নিস্তব্ধ, এখন গভীর রাত এই তো মনকে কনসেনট্রেট করবার প্রকৃত সময়। কাজ নিয়ে বসুন। ৩০ থেকে ৪৫ মিনিটের মধ্যে আবার ঘুম আসবে। বাতি নিভিয়ে দিন, শুয়ে পড়ুন। উঠুন একটু বেলা করে।

শুতে যাওয়ার আগে সুখ গোমুখাসন করুন। হ্যাঁ, খাওয়ার পরও এই আসন করতে পারেন।



আট

হাঁটু মুড়ে বসা। হাঁটুর ওপর হাঁটু রেখে, শিরদাঁড়া সোজা রেখে বসুন। হাত রাখুন ছবির মত। চোখ বন্ধও রাখতে পারেন। ৩ মিনিট বসার পর, পা বদলিয়ে আবার ৩ মিনিট। শেষে ১ মিনিট শবাসন। 'হংস' ধ্যান করুন। ছবির মত সিদ্ধাসনে বসুন। ডান পায়ের পাতা, বাঁ উরুর ভিতর দিকের (অর্থাৎ ইনার-থাই যাকে বলে) সবচেয়ে ওপরের অংশে লাগিয়ে রাখুন। বাঁ পায়ের পাতা থাকবে ডান পায়ের ওপর। ডান গোড়ালি পেটের সঙ্গে লেগে থাকবে। পিঠ সোজা, চোখ বন্ধ। এভাবে বসে স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস হতে দিন। মনকে শ্বাসগতির ওপর কেন্দ্রীভূত করুন। কল্পনা করুন প্রতিটি শ্বাস যখন ভিতরে ঢুকছে তখন নাসারন্ধ্রে একটি 'হং' ভাইব্রেশন তুলে যাচ্ছে আবার যখন দেহ থেকে শ্বাস বেরিয়ে আসছে তখন 'স' এই ভাইব্রেশন তুলে বেড়িয়ে আসছে। মনকে এই বিচিত্র 'হংস' ভাইব্রেশনের দোলায় আন্দোলিত হতে দিন দশ মিনিট। রাত্রের খাওয়া লঘুপাক করুন এবং তাড়াতাড়ি শুতে যাওয়ার অভ্যাস গঠন করুন। আর সকাল-সন্ধ্যা যৌগিক সূর্য নমস্কার করুন। এই সূর্য নমস্কার একটি আসন মাত্র নয়, আটটি ভঙ্গিমার সমষ্টি। প্রথম থেকে অষ্টম ভঙ্গিমায় পর্যায়ক্রমে গিয়ে আবার অষ্টম ভঙ্গিমা থেকে ফিরে আসতে হবে প্রথম ভঙ্গিমায়। প্রতি ভঙ্গিমায় মাত্র ৩ সেকেন্ড করে থাকতে হবে। মোট ১০ বার করবেন এক এক বেলায়। শেষে ৩ মিনিট শবাসন। সূর্য নমস্কার করার বিবিধ রীতি আছে। এই রীতি বিষ্ণুচরণ ঘোষ প্রবর্তিত। একেই অনুসরণ করুন এক – নমস্কারের ভঙ্গিমা, দুই – কোমর পিছনে বেঁকান, হাত মাথার ওপর, হাঁটু সোজা, তিন – কোমর সামনে বেঁকান, হাঁটু সোজা, সম্ভব হলে কপাল হাঁটুতে লাগান, চার – হাঁটু ভাঁজ করুন, কপাল হাঁটুতে, গোড়ালি তোলা, হাত সোজা, পাঁচ – ডান পা পিছনে ছড়িয়ে দিন, কপাল এখনও হাঁটুতে, ছয় – ওই অবস্থা থেকে শুধু ঘাড় ওঠান, সাত – বাঁ পাও ডান পায়ের মত ছড়িয়ে দিন, আট – হাতের ভর দিয়ে বুক নামান, কিন্তু বুক পুরোপুরি মাটিতে ঠেকবে না। এবার আট থেকে সাত, ছয়, পাঁচ এমনি ভাবে 'এক'-এ ফেরত আসুন। এই হল এক চক্র। এভাবে ১০ চক্র করুন। শ্বাস স্বাভাবিক। □

সুখ গোমুখাসন



মুকুল দত্ত

আসন/এক্সারসাইজ দেখিয়েছেন : পম্পা দত্ত, সোনালি পোড়েল

ছবি : পাহাড়ী রায়চৌধুরী

পরবর্তী বিষয়
টনসিলাইটিস
(টনসিল প্রদাহ)

নিজেকে জানুন

(মনঃপ্রশ্নচর্চা)

আপনি কি আদর্শ শাশুড়ি ?

ডঃ অসীম বর্ধন

শাশুড়ি হিসেবে জামাইকে নিয়ে যেটুকু আদরযত্ন বা ব্যঙ্গকৌতুক করা দরকার, সেটুকু করতে আপনার মন চায় না কেন ? ধোঁয়া থাকলে যেমন আগুন থাকবেই, তেমনি আপনার এ অসোয়াস্তিরও একটা কারণ আছে।

নিজের মেয়েকে আপনি যে ভালবাসেন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। জামাইটিকেও যে ঠিক মনের মতো ওইভাবে গড়ে নিতে পেরেছেন, একথা কি আপনি জোর করে বলতে পারেন ? নিচের প্রশ্নগুলোর জবাব খোলা মনে দিন, দেখবেন, আপনার মনের অনেক গোপন রহস্য আপনার কাছে ধরা পড়ে গেছে। পছন্দমত 'ক' কিংবা 'খ'-টিতে টিক্ লাগান এবং পরে দেখুন আপনি কত নম্বর পেয়েছেন।

১। (ক) আপনি কি আপনার জামাইকে আপনার পরিবারেরই একজন নতুন সদস্য বলে মনে করেন ?

(খ) আপনি কি তাকে এমন একজন লোক ভাবেন, যে আপনার মেয়েকে আপনার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে ?

২। (ক) যখন-খুশি মেয়ের বাড়ি গিয়ে তার সংগে দেখা করার জন্য কি আপনি তৈরি থাকেন ?

(খ) না, নিমন্ত্রণের জন্য অপেক্ষা করেন ?

৩। (ক) মেয়ে-জামাইয়ের ঝগড়ার মধ্যে নাক ঢোকানো কি আপনি পছন্দ করেন না ?

(খ) তাদের ঝগড়াঝাঁটি মেটাবার জন্য তাদের মধ্যে গিয়ে হাজির হন ?

৪। (ক) আপনি কি মনে করেন, আপনার জামাই আপনার মেয়ের পক্ষে উপযুক্ত স্বামী ?

(খ) অন্য কোনো লোকের সংগে বিয়ে হলে আপনার মেয়ে বেশি সুখী হত ?

৫। (ক) মেয়ে-জামাইয়ের ঝগড়ায় আপনি কি মেয়েকে স্বামী ছেড়ে আপনার কাছে থাকতে উৎসাহিত করেন ?

(খ) স্বামীর পাশেই স্ত্রীর উপযুক্ত স্থান – এই বলে মেয়েকে কি প্রেরণা দেন ?

৬। (ক) জামাইয়ের রোজগার খুবই কম। বিয়ের আগে আপনার মেয়ে যেমন সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকত, সেরকম সুখে আপনার জামাই আপনার মেয়েকে রাখতে পারে না। এর জন্য আপনার মেয়ে-জামাইকে কোনরকম অর্থ বা অন্যরকম সাহায্য করে থাকেন কি ?

(খ) মেয়েকে সুখে রাখতে পারে না বলে, আপনি জামাইকে প্রায়ই বিদ্রূপ করেন কি ?

৭। (ক) ঘরজামাই হয়ে থাকার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার জন্য কি আপনি আপনার জামাইকে প্রশংসা করেন ?

(খ) আপনি কি তাকে অত্যন্ত মূর্খ এবং স্বার্থপর মনে করেন ?

৮। (ক) আপনি কি প্রায়ই আপনার মেয়েকে সংসারের প্রধান বলে থাকেন ?

(খ) জামাইকেই সংসারের প্রধান বলে মেনে নিতে কি আপনার মেয়েকে পরামর্শ দিয়ে থাকেন ?

৯। (ক) আপনি কি মেয়েকে সঞ্চয়ী এবং মিতব্যয়ী হতে উপদেশ দেন ?

(খ) স্বামীর কাছ থেকে যতদূর সম্ভব বেশি টাকাকড়ি আদায় করে নিয়ে যথেচ্ছভাবে খরচ করতে মেয়েকে কি প্ররোচিত করেন ?

১০। (ক) কোনো জায়গায় বেড়াতে যাবার সময়ে, আপনার জামাই যদি আপনাকে সংগে নিয়ে যেতে চায়, তাহলে কি আপনি আনন্দ পান ?

(খ) বিনা নিমন্ত্রণে মেয়ে-জামাইয়ের সংগে বেড়াতে যাবার অধিকার যে আপনার আছে – এই কথাই কি আপনার মনে জেগে ওঠে ?

আন্তরিকভাবে সততার সংগে সব প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন তো ? কটা 'ক' এবং 'খ' কটা জবাব দিয়েছেন, লিখে রাখুন। আগামী সংখ্যায় আপনার জবাবের ব্যাখ্যাসূত্র এবং পরামর্শ পাবেন।

আপনি কি আদর্শ স্ত্রী ?

(গত সংখ্যায় প্রকাশিত মনঃপ্রশ্নচর্চার ব্যাখ্যাসূত্র)

যদি আপনি গত সংখ্যার মনঃপ্রশ্নচর্চায় সাতটির বেশি প্রশ্নে 'হ্যাঁ' জবাব দিয়ে থাকেন, তাহলে আপনার পরীক্ষা করে দেখা উচিত আপনার মাথার চারিপাশে সেই পবিত্রতার স্বর্গীয় জ্যোতিটা ফুটে উঠেছে কিনা এবং দেখা দরকার সেই জ্যোতিটাকে আপনি যতটা উজ্জ্বল বলে মনে করেন, ততটা উজ্জ্বল হয়েছে কিনা!

ছ'টা কি সাতটাতে 'হ্যাঁ' জবাব হলে :

আপনি খুব চমৎকার স্ত্রী হয়ে গড়ে উঠেছেন। আপনি কি একটা বিষয়ে মনে রাখতে পারবেন যে, বিবাহ-জীবনে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হল – সব কথাবার্তা বেশ গুছিয়ে সাজিয়ে বলা আর নতুন কিছুর দিকে মন খুলে রাখা ? গৃহজীবনের আনন্দ অনেক বেশি উপভোগ্য হয়ে ওঠে, যখন আপনাদের নিজেদের সুখসুবিধামত খাওয়ার সময়টা সরিয়ে নড়িয়ে নিতে পারেন, খরচের দুর্ভাবনা না করে, এটা সেটা যখন খুশি খেতে পারেন, এবং

আসবাবপত্র এধার-ওধার করে নেবার বৈচিত্র্য মেনে নিতে রাজি হন।

তিনটি থেকে পাঁচটিতে 'হ্যাঁ' জবাব হলে :

আপনি নিজেকে বুঝিয়ে বলুন, 'সাবধান হয়ে চলতে হবে। বিয়ের মর্যাদা রাখতে হবে।' দায়িত্বপালনে দ্বিধা করবেন না। কথা দিয়ে কথা রাখবেন। আপনার বেশ খোলা মনই রয়েছে, তবু বলতে হবে, আপনার বিবাহিত জীবন সহজভাবে সোজা পথে চলতে পারছে না।

তিনটিরও কম 'হ্যাঁ' জবাব হলে :

আপনার বিবাহিত জীবনে আপনার মনপ্রাণ দিয়ে সবটুকু দিচ্ছেন না। সত্যিকারের ভালবাসা, আদরযত্ন, সহানুভূতি আর মমতাবোধের প্রাণস্পর্শ যদি আপনার জীবনসাথীকে দিতে চেষ্টা করেন, তাহলে তাঁর সব অপূর্ণতা দূর হয়ে আপনার জীবনকেও পূর্ণ আনন্দে ভরিয়ে তুলবে।

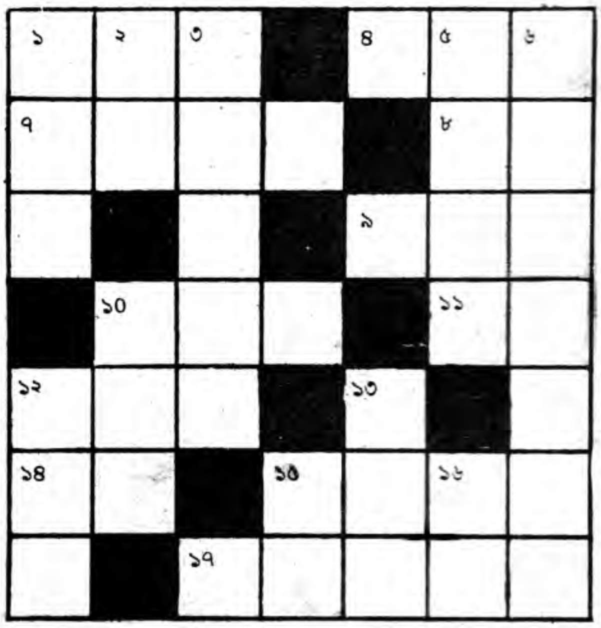
অবসরের খেলা (২০)

সূত্র

পাশাপাশি : (১) ধৃতরাষ্ট্রের বংশধরেরা. (৪) ডাল লেকের নৌকা. (৭) দীর্ঘদিন ব্যবহারযোগ্য, (৮) এক ধরনের চর্মরোগ. (৯) পাখি শিকারের বন্দুকের গুলি. (১০) দেশ. (১১) রাস্তায় যে ধার দিয়ে চলার নিয়ম. (১২) কি করব না করব. (১৪) দীপ্তি. (১৫)স্নান. (১৭) কোনো কিছুর চর্চা।

উপর-নিচ (১) ভারতবর্ষের প্রাচীন অর্থশাস্ত্র প্রণেতা. (২) ইউরোপের জনপ্রিয় সংগীত. (৩) মৃচ্ছকটিক নাটকের প্রধান নারীচরিত্র. (৫) উচ্চাংগ সংগীতের এক বিশেষ তাল (৬) বাংলার এক বিখ্যাত সমাজ সংস্কারক. (১০) অন্ধকার. (১২) ভিন্ন ভাষার লোকেদের কথা বলার সময় যাদের খুবই প্রয়োজন. (১৩) ইন্দ্রিয়পরায়ণ. (১৫) বাংলা ভাষার একটি উপসর্গ. (১৬) রেগে গেলে আমরা অপরকে যা দিই।

দূর্বা বসু



অবসরের খেলা (১৯) উত্তর

য	দু	ব	ং	শ		অ
ব	ল	য়		শি	লী	ন্ধ্র
নি		স্যা	মী	ক		
কা	ল		ন	র	মে	ধ
	ম্বো		কে		ঘ	ন
ব	দ	খ	ত		ম	দ
শ	র		ন	রে	ন্দ্র	



বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের চাই কমপ্লান
একমাত্র কমপ্লান-এই আছে এদের প্রতিদিনের একান্ত প্রয়োজনীয় ২৩-টি খাদ্যগুণ
সাধারণতঃ ছেলেমেয়েরা ১৫ বা ১৬ বছর বয়সের মধ্যে প্রায় সর্বদিক থেকেই পুরোপুরি ভাবে বেড়ে ওঠে।
তাই এদের এই সময়ে দরকার এমন পুষ্টি যা সরাসরি সুস্থ-সবল শরীর গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। এই কারণেই আপনার ছেলেমেয়েদের আজ থেকেই কমপ্লান খাওয়ানো শুরু করুন। কমপ্লান-এ আছে প্রোটিনের সেরা মিল্ক প্রোটিন(২০%)। এছাড়া আছে আরো ২২-টি খাদ্যগুণ; । যেমন, কার্বোহাইড্রেট, স্নেহ-পদার্থ, ভিটামিন, খনিজ পদার্থ, প্রভৃতি যা ওদের বাড়ন্ত বয়সের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। এইসব অশেষ গুণের জন্যই আপনার ছেলেমেয়েদেরও নিয়মিত কমপ্লান দিন দিনে দু'বার করে।
কমপ্লান পাবেন চকোলেট, স্ট্রবেরী, এলাচ-জাফরান ও আইসক্রীমের চমৎকার স্বাদে গন্ধে আর প্লেনও—যা বাচ্চাদের দারুণ ভাল লাগবেই লাগবে।
Glaxo
Complan
COMPLETE PLANNED FOOD
STRAWBERRY FLAVOUR
23
সুপরিকল্পিত মাত্রায় ২৩-টি প্রয়োজনীয় খাদ্যগুণ
প্রোটিন রিবোফ্লাভিন
ফ্যাট নিকোটিনামাইড
কার্বোহাইড্রেট ক্যালসিয়াম
ক্যালসিয়াম প্যান্টোথিনেট
ফসফরাস কলিন
সোডিয়াম পাইরিডক্সিন (বি৬)
ক্লোরাইড (সি এল রূপে) ভিটামিন বি১২
পটাসিয়াম ফলিক অ্যাসিড
আয়রণ ভিটামিন সি
আয়োডিন ভিটামিন ডি
ভিটামিন এ ভিটামিন ই
ভিটামিন বি১ ভিটামিন কে,
দুধ মেশানোর প্রয়োজন নেই।
কমপ্লান–সুপরিকল্পিত সম্পূর্ণ আহার

B84.GLC.120.B

Postal Regn. No. WB/CC — 423   Rs. 4.50

